বঙ্গ মনীষীদের রঙ্গ রসিকতা

অংশুমান চক্রবর্তী

রূপা প্রকাশনী
৩৭/৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
১৯৯৬

রূপা প্রকাশনীর পক্ষে ৩৭/৫, বেনিয়াটোলা লেন থেকে চিরঞ্জীব সিংহরায় কর্তৃক প্রকাশিত, 'রূপসা' কর্তৃক বর্ণসংস্থাপিত ও 'আদ্যাশক্তি প্রিন্টার্স' থেকে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

বঙ্গদেশের মনীষীরা রসিক ছিলেন খুব
খুঁজতে তাঁদের রসিকতা দিলাম আমি ডুব।

ডুবটি দিতেই চিত্ত আমার উঠলো রসে মেতে
তৃপ্ত হলাম রসের ফুলে এই মালাটি গেঁথে।

রস সাগরে ডুব দিয়েছি মন মজেছে রসে
বঙ্গদেশের বইপ্রেমীরা থাকেন রসেবসে।

রঙ্গ রসিকতায় ভরা গ্রন্থ লিখে ভাই
রসিক পড়ুয়াদের হাতে দিলাম তুলে তাই।

ভূমিকা

'বঙ্গ মনীষীদের রঙ্গ রসিকতা' আমার সপ্তম গ্রন্থ। এর আগের বইগুলি কিছু ছড়ার কিছু কবিতার। এটাই আমার প্রথম গদ্যের বই। বঙ্গ মনীষীদের জীবনকাহিনি ঘেঁটে মজার মজার কিছু ঘটনা তুলে এনে আমি নিজের মত করে এই বইয়ের গল্পগুলো লিখেছি। হ্যাঁ, এর জন্য একটু পড়াশোনা করতে হয়েছে। এই সব মজার ঘটনার মধ্য দিয়ে শুধু রঙ্গরস নয়, বঙ্গ মনীষীদের ব্যক্তিগত চালচলন, রুচি, অভ্যাস ও অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যেগুলো আমাদের আসল মানুষটিকে চিনতে সাহায্য করে। ছোটবেলায় বাবার মুখে মহাপুরুষদের জীবনের নানানরকম ঘটনার কথা শুনতাম। ওগুলো শুনতে আমার খুব ভাল লাগত। তাই পরে ইচ্ছা জাগে এই বিষয় নিয়ে লেখালিখি করার। সেই মত কিছু গল্প লিখি। যার ফলস্বরূপ এই বই। এই বইয়ের কিছু লেখা 'ছোটর দাবি' এবং 'এ যুগের রুদ্রাক্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। গল্পগুলি আমি খুব সহজ সরল ভাষায় লেখার চেষ্টা করেছি। যাতে সব বয়সের সব ধরনের রসিক পাঠক-পাঠিকা এই বই পড়ে আনন্দ পেতে পারেন। আমি চাই রামগড়ুরের ছানারাও এই বই পড়ুক। তাহলে তারা হয়তো গোমড়া মুখে থাকা ভুলে

গিয়ে হোঃ হোঃ করে প্রাণ খুলে হাসতে শুরু করে দেবে। আর যদি সত্যিই তা হয়, তবে আমার লেখা সার্থক।

এই বই লেখার ব্যাপারে আমাকে সব থেকে বেশি উৎসাহ দিয়েছেন 'আনন্দ প্রকাশন'-এর কর্ণধার আনন্দ মন্ডল। তাঁর কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে রসেবসে থাকা রসিক পাঠক-পাঠিকাদের বলি — আমার এই বই যদি সত্যিই আপনাদের ভাল লাগে তাহলে খুশি হয়ে আপনারা আমার জন্য এক হাঁড়ি রসমালাই পাঠিয়ে দেবেন। আর যদি ভাল না লাগে তখন কোথাও আমাকে দেখতে পেলে — না! না টমেটো নয়, নলেনগুড়ের রসগোল্লা ছুঁড়ে মারবেন। কী, কেমন লাগল আমার রঙ্গ রসিকতা? এবার পাতা ওল্টান, রসের সাগরে ভাসতে ভাসতে 'বঙ্গ মনীষীদের রঙ্গ রসিকতা' পড়ুন।

অংশুমান চক্রবর্তী

সূচিপত্র

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রঙ্গ রসিকতা

জন্ম সাল১৮২০

মৃত্যুসাল১৮৯১

বাঁধানো বই বনাম দামী শাল

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সখ ছিল বইপত্র ভালো করে বাঁধিয়ে রাখা। যাতে বই নষ্ট না হয়ে যায়, তাই এত যত্নে রাখতেন।

একবার এক ধনীব্যক্তি এসেছেন বিদ্যাসাগরের কাছে। তাঁর ইচ্ছা, বিদ্যাসাগরের বইগুলি একবার দেখবেন। এই ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্র বিদ্যাসাগর তাঁর বইগুলি দেখার অনুমতি দিলেন। প্রত্যেকটি বই বাঁধানো। প্রচুর খরচ করেই বাঁধানো। ধনীব্যক্তিটি বইগুলি নেড়েচেড়ে পাতা উল্টে দেখতে দেখতে হাসি মুখে বিদ্যাসাগরকে বললেন, 'পন্ডিতমশাই, এত টাকা খরচ করে বইগুলি বাঁধানের কী দরকার?'

বিদ্যাসাগর ঐ ব্যক্তির কথায় হেসে বললেন, 'কেন, দোষ কী?'

ব্যক্তিটি বললেন, ' ভেবে দেখুন, ঐ টাকায় অনেকের উপকার হতে পারত। আপনি কী বলেন?'

বিদ্যাসাগর সব শুনে নিজের খদ্দরের চাদরটা গায়ে ভাল করে মুড়ি দিয়ে গম্ভীর হয়ে ধনীব্যক্তিটিকে বললেন, 'মশাই, আপনার গায়ের শালটা কিন্তু বেশ সুন্দর! কোথা থেকে কিনেছেন? দাম কত?'

ব্যক্তিটি বিদ্যাসাগরের প্রশ্নের উত্তরে সগর্বে বললেন, 'শহর থেকে পাঁচশো টাকা দিয়ে শালটি কিনেছি' — ব'লে উৎফুল্ল হয়ে শালের গুণকীর্তন শুরু করলেন।

বিদ্যাসাগর ব্যক্তিটিকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'সবই তো বুঝলাম। পাঁচসিকে কম্বলেও তো শীত কাটে। এই দেখুন না, আমিই তো খদ্দরের মোটা চাদর গায়ে দিই। এই চাদরের দাম খুব কম। কী দরকার পাঁচশো টাকা দামের শাল গায়ে দেবার? এই টাকাতেও তো অনেকের উপকার হতে পারত। নয় কি?'

বিদ্যাসাগরের রসিকতাসুলভ তীর্যক মন্তব্যটি বুঝতে পারলেন ধনীব্যক্তিটি। লজ্জায় তাঁর মুখ রাঙা হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাঁধানো বইগুলি যথাস্থানে রেখে মাথা নিচু করে দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

কবির সুহৃদ

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সুহৃদ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত একসময় খুবই আর্থিক অনটনে পড়েছিলেন। তখন তিনি বিদেশে। বিদেশে অর্থকষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন কবি, এই খবর কানে এল বিদ্যাসাগরের। তিনি শুধু বিদ্যাসাগর নন, দয়ারসাগারও। মাইকেলের দুর্দশার কথা শুনে তাঁর মন কেঁদে উঠল। কবি বন্ধুর দুর্দিনে বিদ্যাসাগর মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে দিতেন। এই খবর পেয়ে একদিন এক ভদ্রলোক বিদ্যাসাগরের কাছে এসে বললেন, 'পণ্ডিতমশাই, আপনি নাকি মধুসূদনকে টাকা পাঠাচ্ছেন?' বিদ্যাসাগর বললেন, ' হ্যাঁ পাঠাচ্ছি।' ওই ব্যক্তি বললেন, 'ওকে টাকা পাঠান কেন?' বিদ্যাসাগর বললেন, 'ওর টাকার দরকার বলেই পাঠাই।' ব্যক্তিটি এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আপনি কি জানেন, মধুসূদন ওই টাকা দিয়ে কী করবে?' বিদ্যাসাগর বললেন, ' হ্যাঁ জানি তো, ও মদ খাবে।' ব্যক্তিটি বলে উঠলেন, ও মদ খাবে জেনেও আপনি ওকে টাকা দিচ্ছেন?' বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন, ' হ্যাঁ জেনেও দিচ্ছি।' ব্যক্তিটি কিঞ্চিৎ রেগে বললেন, 'আপনি তাহলে মদ খাওয়ার জন্য টাকা দেন?' বিদ্যাসাগর মাথা নেড়ে বললেন, ' হ্যাঁ, দিই, তবে জায়গা বিশেষে।' ব্যক্তিটি এবার উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'আমি যদি মদ খাই আমাকেও টাকা দেবেন?' বিদ্যাসাগর বললেন, 'নিশ্চই দেব, নিশ্চই দেব।' ব্যক্তিটি দ্বিগুণ উৎসাহে বললেন, 'কই টাকা দিন তাহলে —' বিদ্যাসাগর হেসে বললেন, ' তোমাকে মদ খাওয়ার জন্য টাকা তো দেব, তার আগে তুমি একটা 'মেঘনাদবধ কাব্য' লেখ দেখি।'

জবর জবাব পেয়ে ভদ্রলোকটি আর বিদ্যাসাগরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস পেলেন না।

গরু ও গুরু

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়ের এক পণ্ডিত একবার কতগুলি নিম্নমানের নীতিকথা জাতীয় কবিতা রচনা করে বিদ্যাসাগরকে দেখান। কবিতাগুলি পড়ে বিদ্যাসাগর বিরক্ত হন। কেমন লাগল কবিতাগুলি? সেই পণ্ডিতের প্রশ্ন শুনে কবিতাগুলির শেষে রসিকতা করে বিদ্যাসাগর লিখে দিলেন—

'জেনে রেখো এ জগতে সকলেই গরু
যে যারে ঠেকাতে পারে সেই তার গুরু।'

এই দু' লাইন পড়ে সেই পণ্ডিত বুঝে গেলেন কবিতাগুলি সম্পর্কে-বিদ্যাসাগরের মনোভাব।

ভোজন সভা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন অত্যন্ত ভোজন রসিক। খেতে এবং খাওয়াতে তিনি বড় ভালবাসতেন। তিনি কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে নিয়ে 'ভোজন সভা' নামে একটি সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন। সংস্থার সভ্য ছিল তা প্রায় জনাদশেক। কী কাজ ছিল এই সংস্থার? ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে হঠাৎ দল বেঁধে গিয়ে এইসংস্থার সভ্যরা খেতে চাইতেন। এঁদের এই সংস্থার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল ঘনিষ্ঠ মহলে। তাই প্রত্যেকেই সদা প্রস্তুত থাকতেন — এই বুঝি এল ভোজনসভার সভ্যরা!

একবার ঘটল এক কান্ড। কী কান্ড? ভোজনসভার সভ্যরা দল বেঁধে এক বন্ধুর বাড়িতে বেশ ঘটা করে খাওয়া দাওয়া করলেন। খাওয়া-দাওয়ার পরের দিন সংস্থার এক সভ্যের অসুখ হল। পেটের অসুখ। বেশ কয়েকদিন তাঁর দেখা নেই। কিছুদিন পর সুস্থ হয়ে সভ্যটি এলেন ভোজনসভার বন্ধুদের কাছে। বন্ধুরা তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করতে লাগলেন। তাঁর উদ্দেশ্যে সবাই বললেন, এ বড়ো পেট-রোগা! ভোজনসভার সভ্য হওয়ার উপযুক্ত নয়। একে সংস্থা থেকে বাদ দেওয়া উচিত।

এতক্ষণ চুপ ছিলেন বিদ্যাসাগরমশাই। এবার তিনি মুখ খুললেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'না হে না, তোমরা ঠিক বলছ না, ওই তো আমাদের মধ্যে একমাত্র সভ্য যে আদর্শের জন্য জীবন পর্যন্ত দিতে উদ্যত। ওকে ভোজনসভা থেকে কোনো মতেই বাদ দেওয়া যায় না।'

বিদ্যাসাগরের রসিকতা শুনে সবাই হো-হো করে হেসে উঠলেন।

শুঁড় তোলা চটি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিয়মিত বিভিন্ন সাহিত্য সভায় যেতেন। এক সাহিত্য সভায় তাঁর দেখা হল সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বঙ্কিমের পরণে সৌখিন পোশাক। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সেই চির পরিচিত বেশ। গায়ে খদ্দরের চাদর এবং পায়ে এক জোড়া শুঁড় তোলা চটি। বিদ্যাসাগরের চটির দিকে চোখ যেতেই সেদিকে অঙ্গুলি তুলে বঙ্কিমচন্দ্র রসিকতা করে বললেন, 'পন্ডিতমশাই, আপনার চটির শুঁড় তো দেখছি ক্রমশই ওপরের দিকে উঠছে। দেখবেন, শেষে মাথায় গিয়ে না ঠেকে।'

'রসিক' বিদ্যাসাগর দমলেন না। হাসতে হাসতে বয়ঃকনিষ্ঠ বঙ্কিমকে বললেন, 'কী আর করা যায় বলো! চট্টরা যতই পুরনো হয় ততই দেখি বঙ্কিম হয়ে ওঠে!'

বিদ্যালয় পরিদর্শক

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন দেশের প্রথম বিদ্যালয় পরিদর্শক। এই কাজে তাঁকে বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে যেতে হত। একবার এক বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে গিয়ে শ্রেণীকক্ষে ঢুকে তো তাঁর চক্ষু চড়কগাছ! কী কারণ? একটা লম্বা বেত রাখা শিক্ষকমহাশয়ের টেবিলে! ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শাসনের নামে ছাত্রদের প্রহার করাকে ভীষণ অপছন্দ করতেন। তাই শ্রেণীকক্ষের টেবিলে বেতটি দেখে তিনি মনে মনে বড়ই বিরক্ত হলেন। এরপর তিনি শিক্ষককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই বেতটি দিয়ে কী কাজ হয়?'

শিক্ষক মহাশয় কাঁচুমাচু মুখ করে বললেন, 'শুধুমাত্র ছাত্রদের ম্যাপ দ্যাখানোর জন্যই বেতটি এনেছি।'

বিদ্যাসাগর শিক্ষকের কথা শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি, রথ দেখা কলা বেচা — দুই কাজই হবে। বেতটা দিয়ে ম্যাপ দেখানোও যাবে, আবার ছাত্রদের প্রহার করাও যাবে। ঠিক বলেছি তো?'

বিদ্যাসাগরের কথা শুনে শিক্ষকটি লজ্জা পেয়ে যান। কারণ সত্য প্রকাশ পেয়ে গেছে। সেদিন থেকে শিক্ষকটি বেত পরিত্যাগ করেন।

আচার

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ-বাল্যবিবাহ সহ নানা রকম সামাজিক কুসংস্কার রোধ করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন। তাই চারিদিকে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এইসব সামাজিক কাজে তিনি সদা ব্যস্ত থাকতেন। এমনই এক সময় বিদ্যাসাগরের বারাসাতবাসী এক অন্তরঙ্গ বন্ধু কালীকৃষ্ণ তাঁর স্ত্রীর তৈরি নানারকম আচার বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিছুদিন পর এই দুই বন্ধুর সাক্ষাৎ হতে বিদ্যাসাগর বললেন, 'বন্ধু, তোমার স্ত্রীর তৈরি আচার খেয়ে যেন অমৃতের স্বাদ পেলাম।'

বিদ্যাসাগরের কথা শুনে বন্ধুটি হাসলেন। হাসির কারণ কী? বিদ্যাসাগর জানতে চাইলে বন্ধুটি উত্তরে বললেন, 'পণ্ডিত, তাহলে তুমিও মানছ বাংলার সব প্রাচীন আচার মন্দ নয়।'

বন্ধুর কথা শুনে বিদ্যাসাগরও না হেসে পারলেন না এবং বললেন, 'আচার মন্দ লাগলে তো ফেলে দিতাম।'

স্নানপর্ব

রায় বাহাদুর কালিপ্রসন্ন ঘোষ ছিলেন 'বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক। তিনি একবার এসেছেন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে। গৃহস্বামী বিদ্যাসাগর অতিথির আপ্যায়নের ত্রুটি রাখলেন না। বিভিন্ন পদের খাবার রান্না হল কালিপ্রসন্নর জন্য। কালিপ্রসন্ন স্নান করবেন। এই সময় বিদ্যাসগর একটু রসিকতা করার সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। বাড়ির কাজের লোকটিকে ডেকে বললেন, 'ওহে শোনো, আজ বাড়িতে যে বাবুটি এসেছেন, তিনি লোক ভাল, তবে মাথায় ছিট আছে। একটু বেশি জল তাঁর মাথায় ঢাললেই তিনি তোমায় জল ঢালতে বারণ করে দিতে পারেন। কিন্তু সাবধান! তুমি তাঁর কথায় কান দেবে না। বরং আরো বেশি বেশি জল ঢালতে থাকবে। বুঝলে?'

এতো গেল একদিক। এবার বিদ্যাসাগর কালিপ্রসন্নকে আলাদা ডেকে বললেন, 'মশাই, আমার চাকরটা এমনিতে বেশ ভাল, কিন্তু তার একটাই বাতিক — কাউকে স্নান করাতে হলে তার মাথায় খুব বেশি জল ঢালে। যদি বারণ করা হয় তাহলে সে আরো বেশি বেশি জল ঢালতে থাকে। আপনি দয়া করে একটু সহ্য করে নেবেন।'

এবার শুরু স্নানপর্ব। কালিপ্রসন্ন স্নান করতে এলেন। চাকরটি খুব জল ঢালছে দেখে তিনি বিরক্ত হয়ে চাকরটিকে বললেন, 'এত জল ঢালছ কেন?'

কালিপ্রসন্ন তাকে বেশি জল ঢালতে নিষেধ করলেন, কিন্তু চাকরটি ভাবল, সত্যিই বুঝি বাবুর মাথায় ছিট আছে! এই ভাবা মাত্র সে কালিপ্রসন্নর মাথায় আরো জল ঢালতে লাগল। এদিকে চাকরের জল ঢালা দেখে কালিপ্রসন্ন ভাবলেন, বিদ্যাসাগরমশাই ঠিকই বলেছেন, চাকরের তাহলে জল ঢালা বাতিক আছে!

চাকরের জল ঢালা নিয়ে কালিপ্রসন্নর নাস্তানাবুদ অবস্থা দেখে বিদ্যাসাগর হেসে কুটিকুটি।

ব্রাহ্মণ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে সবধরনের মানুষ দেখা করতে আসতেন। ব্রাহ্মণরা যেমন আসতেন, তেমন অব্রাহ্মণরাও আসতেন। একদিন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এক ব্রাহ্মণ দেখা করতে এলেন। সেই ব্রাহ্মণ ছিলেন গোঁড়া। তিনি অন্যান্যদের প্রণাম পাওয়ার রীতিতে অভ্যস্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগর নিজে যদিও ব্রাহ্মণ সন্তান, তবু তিনি ছিলেন এই প্রথার বিরোধী। সেই ব্রাহ্মণ আশা করেছিলেন, বিদ্যাসাগরের অনুগামীরা

তাঁকে প্রণাম করবেন। কিন্তু তা হল না। বিদ্যাসাগরের একজন অনুগামীও ব্রাহ্মণটিকে প্রণাম করলেন না। অসন্তুষ্ট সেই ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরকে বললেন, 'এই সব অর্বাচীনরা কি জানে না যে, ব্রাহ্মণরা বেদজ্ঞ, বর্ণশ্রেষ্ঠ। একসময় তাঁরা দেশের কল্যাণ সাধন করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রণম্য?'

গম্ভীর মুখে সব শুনে বিদ্যাসাগর বললেন, 'মশাই, এক সময় শ্রী বিষ্ণু বরাহঅবতার রূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই বলে কি ডোমপাড়ার সব শূকরদের দেখলেই মাথানত করে প্রণাম করতে হবে?'

বিদ্যাসাগরের এহেন কথা শুনে লজ্জিত সেই ব্রাহ্মণ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। তৎক্ষনাৎ মাথার টিকি নাড়তে নাড়তে দৌড় লাগালেন।

সরস্বতী পুজো

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। তাঁদের কাব্যশাস্ত্রর অধ্যাপক ছিলেন জয়গোপাল তর্কালংকার। তিনি সরস্বতী পুজো উপলক্ষে ছাত্রদের একটি শ্লোক লিখতে বললেন। ছাত্রদের তিনি এই রকম শ্লোক মাঝেমাঝেই লিখতে বলতেন। ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র জয়গোপালের কথায় শ্লোক লিখলেন:—

'লুচী কচুরী মতিচুর শোভিতং
জিলিপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম্।
যস্যাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্লুমঃ
সরস্বতী সা জয় তান্নিরন্তরম্।'

বিদ্যাসাগরের লেখা এই শ্লোক পড়ে জয়গোপাল ও অন্য ছাত্ররা হেসে উঠলেন।

ফিরিঙ্গি শিক্ষয়িত্রী

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন বিটন কলেজের সেক্রেটারি। অনেক উচ্চপদস্থ সাহেবও তখন কমিটির সদস্য। এক ফিরিঙ্গি ভদ্রমহিলা তখন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। কোনো বিশেষ কারণে ঐ ভদ্রমহিলা কলেজের এক পণ্ডিতের ওপর বিরূপ ছিলেন। ভদ্রমহিলা কমিটিকে অনুরোধ করেন যে, পণ্ডিতকে পদচ্যুত করা হোক। কী অপরাধ পণ্ডিতের? তদন্তের ভার পড়ল বিদ্যাসাগরের উপর। বিদ্যাসাগর তদন্ত করে দেখলেন ঐ পণ্ডিতের কোনো দোষ নেই। কমিটির বৈঠকে বিদ্যাসাগর বললেন, 'পণ্ডিত নিরপরাধ।'

কিন্তু কমিটির অধিকাংশ সদস্য য়ুরোপীয়। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ভদ্রমহিলাও ফিরিঙ্গি।

তাই যুরোপীয় সদস্যরা ভাবলেন, পণ্ডিতকে নির্দোষ বলে ছেড়ে দিলে ফিরিঙ্গি শিক্ষায়িত্রীর অপমান হবে। তাই তাঁরা পণ্ডিতকে সাসপেন্ড করবেন স্থির করলেন এবং এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের মত জানতে চাইলেন। বিদ্যাসাগর হেসে বললেন, 'আপনারা যদি ভাবেন কিছু বলিদান না করলে দেবী (অর্থাৎ ফিরিঙ্গি শিক্ষয়িত্রী) সন্তুষ্ট হবেন না তবে তাই করুন।'

সাহেবরা বিদ্যাসাগরের রসিকতা বুঝলেন। পণ্ডিতকে আর সাসপেন্ড করার সাহস পেলেন না।

নিরামিষাশী

বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস তাঁর ছোটছেলে ঈশানচন্দ্র ও বড় নাতি নারায়ণ (বিদ্যাসাগরের পুত্র)কে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর স্নেহের বহর এতটাই ছিল যে, কেউ এই দু'জনকে শাসন করতে সাহস পেত না। বিদ্যাসাগর একদিন তাঁর পিতাকে বললেন, 'বাবা, আপনি তো নিরামিষাশী। কিন্তু এই যে দুইবেলা ঈশান ও নারায়ণের মাথা খাচ্ছেন, শাসন করছেন না, তাতেও কি আপনি নিরামিষাশী থাকছেন?'

পুত্রর কথা শুনে পিতা না হেসে পারলেন না। সেদিন থেকে ঠাকুরদাস আদরের মাত্রা কিঞ্চিৎ কম করলেন। বিদ্যাসাগর নিজেও অবশ্য ঈশান ও নারায়ণকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কিন্তু কখনোই তা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়নি।

নতুন উপাধি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রাজদরবারে নতুন উপাধি পেয়েছেন। এই উপাধি পাওয়ার খবর গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। যাঁরা তাঁকে পছন্দ করতেন তাঁরা খুশি হলেন, যাঁরা তাঁকে অপছন্দ করতেন তাঁদের মুখভার হল। বিদ্যাসাগরের কোনো কিছুতেই যায় আসে না। তিনি সদাই উদাসীন। তাঁর উপাধি পাওয়ার খবর শুনে এক বৃদ্ধ খুশি হয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে বসিয়ে আপ্যায়ন করলেন। বৃদ্ধ ব্যক্তিটি জিগ্যেস করলেন বিদ্যাসাগরকে, 'আপনার নতুন উপাধিটা কী?'

বিদ্যাসাগর বললেন, 'সি.আই.আই।'

বৃদ্ধ বললেন, 'তাতে কী হল?'

বিদ্যাসাগর হেসে রসিকতা করে বললেন, 'তাতে ছাই হল।'

বৃদ্ধ গম্ভীর মুখে তখন বললেন, 'সাধু, সাধু! রাজার মুখে সবই শোভা পায়, সবই শোভা পায়।'

মৃত্যুর পর স্বর্গবাস

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নানা ধরনের ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা করতেন। তাঁর এক পরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ প্রথমা পত্নীর বিয়োগের পরেই আবার বিবাহ করলেন। ব্যক্তিটির দ্বিতীয় বিবাহের পর একদিন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা। বিদ্যাসাগর তাঁকে হাসতে হাসতে বললেন, 'বন্ধু তোমার তো দেখছি মরার পরেই স্বর্গবাস।'

বিদ্যাসাগরের কথার অর্থ বুঝলেন না ব্যক্তিটি। তিনি জিগ্যেস করলেন, 'কেন? স্বর্গবাস কেন?'

এবার বিদ্যাসাগর রসিকতা করে বললেন, 'আমরা তো মৃত্যুর পর কিছুদিন নরকযন্ত্রণা ভোগ করে তারপরে স্বর্গে যেতে পারি। কিন্তু তুমি তো দেখছি মর্ত্যেই নরক যন্ত্রণা ভোগ করে মৃত্যুর পর সোজা স্বর্গে যাবে। নয় কি?'

ব্যক্তিটি এবার বিদ্যাসাগরের কথার অর্থ বুঝে হেসে ফেললেন।

একগুঁয়ে এঁড়ে বাছুর

বিদ্যাসাগর ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন খুব একগুঁয়ে। তিনি যা ভালো মনে করতেন তা তিনি প্রাণপণে করতে চেষ্টা করতেন। কখনো কখনো তিনি ঠিক উল্টো কাজ করতেন বলে জানা যায়। যেমন, তাঁকে স্নান করতে নিষেধ করা হলে তিনি জোর করে স্নান করতেন। আবার স্নান করতে বলা হলে সেদিন স্নান করতেন না। তাঁর একগুঁয়েমী স্বভাবের কথা সেই সময় কারো অজানা ছিল না। কেউ কথায় কথায় তাঁর এই একগুঁয়েমীর প্রসঙ্গ তুললেই তিনি রঙ্গ রসিকতা করে বলতেন, ' কেন একগুঁয়ে হবো না? আমার ঠাকুরদা রামজয় আমার জন্ম সময়ে আমাকেএঁড়েবাছুর বলেছিলেন। আর জ্যোতিষের গণনায় আমার জন্ম 'বৃষ' লগ্নে। তো আমার একগুঁয়েমী থাকবে না তো কার থাকবে? কী বলো হে তোমরা?'

ময়ান

বিদ্যালয় পরিদর্শক বিদ্যাসাগর একবার গ্রামের এক বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে গেছেন। সেখানে এক সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বিদ্যাসাগরকে তাঁর গৃহে দুপুরের আহার করবার নিমন্ত্রণ জানালেন। গৃহস্থের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না বিদ্যাসাগর। তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন ও খেতে বসে রান্নার প্রতিটি পদের প্রশংসা করতে লাগলেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এতে আনন্দ পেলেন। এই সময় উপস্থিত ওই গ্রামেরই এক

বিত্তশালী ব্যক্তি। তিনিও পরে বিদ্যাসাগরকে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। নানা সুস্বাদু পদের খাদ্যসামগ্রী দিয়ে আপ্যায়ণ করা হল বিদ্যাসাগরকে। মুখ বুজে বিদ্যাসাগর খেয়ে গেলেন, কিন্তু প্রশংসা করলেন না কোনো খাবারের। বিত্তশালী ব্যক্তিটি বিদ্যাসাগরকে জিগ্যেস করলেন, 'বিদ্যাসাগরমশাই, রান্না কেমন হয়েছে বললেন না তো?'

বিদ্যাসাগর মুখ ধুতে ধুতে কুলকুচি করতে করতে বললেন, 'রান্না ভালোই হয়েছে, তবে ময়ান কম হয়েছে।'

অবাক বিত্তশালী গৃহস্থ জিগ্যেস করলেন, 'কিসের ময়ান?'

মুখ মুছে হাসতে হাসতে বিদ্যাসাগর বললেন, 'মনের ময়ান।'

বিত্তশালী ভদ্রলোক তাঁর ত্রুটি বুঝতে পারলেন।

পৈতেগাছা ও রাঁধুনি

ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন রামতনু লাহিড়ী। তিনি ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল-এর সভ্য। এক সময় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। রামতনু একবার পিতার নিষেধ অমান্য করে ব্রাহ্ম হয়ে কাশীতে গিয়ে পৈতে ফেলে আসেন। এমনকি পিতার সঙ্গে তর্ক করে আলাদা গৃহে বাস করতে শুরু করেন। এমনই এক সময় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা হতে রামতনু বললেন, 'ওহে বিদ্যাসাগর, তুমি আমাকে একটা রাঁধুনি যোগাড় করে দিতে পারো? রাঁধুনি যেন বামুন হয় — বুঝলে?'

বিদ্যাসাগর বললেন, 'কেন হে, তোমার আবার বামুনের দরকার কেন? বাবুর্চি খানসামা হলেও তো চলে।'

রামতনু বললেন, 'হ্যাঁ, আমার ওতে কোনো আপত্তি নেই বটে, কিন্তু বাড়ির ভেতর বামুন ছাড়া যে চলবে না।'

বিদ্যাসাগর হাসতে হাসতে এবার বললেন, 'বাপের কথায় পৈতেগাছাটা রাখতে পারলে না। এখন পরিবারের কথায় বেরিয়েছ বামুন খুঁজতে?'

রামতনু বিদ্যাসাগরের খোঁচাটা বুঝতে পারলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর পিতা-মাতা ঠাকুরদাস ও ভগবতী দেবীকে দারুণ শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর কাছে পিতা-মাতা ছিল সবার আগে, অন্যকিছু তারপরে। তাই কেউ পিতা-মাতার আদেশ অমান্য করলে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন।

খাদ্য রসিক

বিদ্যাসাগর খেতে ও খাওয়াতে খুবই ভালবাসতেন। কখনো কখনো তিনি অতিথিদের নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতেন। খাদ্যসামগ্রী পরিবেশনের সময় তিনি ছড়া কেটে বলতেন:

'হুঁ হুঁ দেয়ং হাঁ হাঁ দেয়ং দেয়ঞ্চ করকম্পনে

শিরসি চালনে দেয়ং ন দেয়ং ব্যাঘ্রঝম্পনে।'

অতিথিরা স্বভাবতই বিদ্যাসাগরের এই রসিকাতায় মজা পেতেন।

বিবাহ বাসর

নিজের বিবাহ বাসরকে রঙ্গ-রসিকতায় ভরিয়ে তুলেছিলেন বিদ্যাসাগর। কী রকম? বন্ধুদের কাছে বিদ্যাসাগর বলেন, 'বিয়ের পর বাসরে প্রবেশ করা মাত্র কনে পক্ষের রমণীরা আমাকে বলে — বর, তোমার কনে তুমি নিজেই খুঁজে নাও। মুশকিলে পড়লাম। শেষমেষ ঐ মেয়ে-দঙ্গলের ভেতর থেকে সুন্দরী একজনকে জড়িয়ে ধরে বললাম — তুমিই আমার কনে! তোমাকে নিয়েই আমি সংসার করব! মেয়েটি পড়ল আরো মুশকিলে। সে ছেড়ে বেরোতে চায়, আমি ছাড়ি না। শেষে কয়েকজন বয়স্কা মহিলা এসে হাসতে হাসতে বলল, ওহে বর, ও তোমার কনে নয়, ওকে ছাড়ো। আমরা তোমার কনে নিয়ে আসছি। শেষমেষ এল আসল কনে, আসতে এই মেয়েটি ছাড়া পেল।'

বিদ্যাসাগরের বিবাহ বাসরের এই গল্পটি শুনে তাঁর বন্ধুরা খুব মজা পেতেন।

উদরাময়

এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে বিদ্যাসাগর বললেন, 'কী হে বন্ধু, তোমরা আজকাল প্রচার করে বেড়াচ্ছ আমার নাকি গৃহিনী রোগ হয়েছে?'

অবাক বন্ধুটি বললেন, 'ঠিক বুঝলাম না তোমার কথা।'

বিদ্যাসাগর তখন হাসতে হাসতে বললেন, ' তবে তোমায় বুঝিয়ে বলি। আজ একটি লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি বলেন — আপনার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে শুনলাম, আপনার নাকি গৃহিনী রোগ হয়েছে?'

বন্ধুটি এখনো ঠিক বুঝতে পারেনি দেখে বিদ্যাসাগর বললেন, 'আমিও প্রথমে বুঝিনি কথাটা। পরে ভেবে দেখলাম — ঠিক কথা, ক'দিন আমি উদরাময়ে ভুগছি। এই

উদরাময়ের আর এক নামই তো গ্রহণী। লোকটি তা জানতেন, কিন্তু ভুল উচ্চারণ করে গ্রহণীকে গৃহিনী বলছেন। আসলে আমি সংস্কৃত জানা লোক বলেই লোকটি আমার কাছে উদরাময়ের পরিবর্তে গ্রহণী বলতে গিয়ে ভুল করে গৃহিনী বলে ফেলেছেন।'

বন্ধুটি হেসে ফেললেন বিদ্যাসাগরের কথা শুনে।

দুরবস্থা

বিদ্যাসাগর একদিন নিজের বৈঠকখানায় ব'সে অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতায় মেতে আছেন। তার মাঝে উঠছে সমাজ সংস্কারমূলক বিভিন্ন প্রসঙ্গ। এমন সময় এক বৃদ্ধ ব্যক্তি ঘরে ঢুকলেন। তাঁর পরণে ময়লা পোশাক। তিনি করজোড়ে বিদ্যাসাগরকে বললেন, 'বড় দুরাবস্থায় পড়েছি আমি। আমাকে দয়া করে কিছু অর্থ সাহায্য করুন।'

বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর। বৃদ্ধকে দেখে স্বভাবতই তাঁর দয়া হল। তিনি কিছুক্ষণ বৃদ্ধের করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'আপনার অবস্থা যে কেমন সেটা বুঝতে পারছি আপনার আকার দেখেই।'

আসলে দুরাবস্থা নয়, কথাটি হবে দুরবস্থা। বৃদ্ধটি ভুল উচ্চারণ করার জন্য বিদ্যাসাগর তাঁর সঙ্গে একটু রসিকতা করলেন এবং শেষে হাসিমুখে অর্থ সাহায্য করলেন।

অর্থ হাতে পেয়ে বৃদ্ধটি বিদ্যাসাগরকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

সাগরের নোনা জল

পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন পুরোপুরি আধুনিক চিন্তা মনস্ক ব্যক্তি। কোনো রকম গোঁড়ামো তাঁর ছিল না। তাই দেবতা নয়, তিনি বড় করে দেখতেন মানুষকেই। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান। তাঁর পদবী বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু কোনভাবেই তাঁর পূজার্চনায় মন ছিল না।

এহেন ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। তাই একদিন রামকৃষ্ণদেব নিজেই এলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। রামকৃষ্ণদেবকে দেখে আনন্দিত অতিথিপরায়ণ বিদ্যাসাগর যথাসম্ভব যত্ন করে আপ্যায়ন করলেন। কোনো ত্রুটি রাখলেন না। বিদ্যাসাগরকে রামকৃষ্ণদেব হাসতে হাসতে বললেন, 'ওহে, তুমি তো আর খানাডোবা নও, তুমি হলে বিদ্যারসাগর। তাই তোমাতে ডুব দিতে এলুম।'

রামকৃষ্ণদেবের কথা শুনে মুচকি হেসে রসিকতা করে বিদ্যাসাগর বললেন, 'রামকৃষ্ণদেব, আপনি ডুব দিতেই যখন এসেছেন তখন সাগরের নোনা জলও একটু খেয়ে যান।'

গোপালায় নমোহস্তু মে

তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার তাঁদের সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্র পড়াতেন। একদিন তিনি শ্রেণীকক্ষে পাঠ নিতে এসে ছাত্রদের বললেন, ' তোমরা সবাই 'গোপালায় নমোহস্তু মে'—এই বাক্যটি দিয়ে একটি চার লাইনের শ্লোক রচনা করো।'

পণ্ডিত জয়গোপালের এই কথা শুনে ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'আপনি গোপালকে নিয়ে শ্লোক রচনা করতে বললেন, এক গোপাল তো দেখছি আমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে (অর্থাৎ জয়গোপাল), আর এক গোপাল বহুদিন আগে বৃন্দাবনে লীলা করেছিলেন। এই দুই গোপালের মধ্যে কোন গোপালকে নিয়ে শ্লোক রচনা করবো?'

ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রের রহস্যজাত রসিকতায় হেসে ফেলে পণ্ডিত জয়গোপাল বললেন, 'বেশ বেশ বৎস, বৃন্দাবনের গোপালকে নিয়েই শ্লোক রচনা করো।'

মাইকেল মধুসূদন দত্তর রঙ্গ রসিকতা

জন্ম সাল ১৮২৪

মৃত্যু সাল১৮৭৩

মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠক

সেই সদ্য প্রকাশিত হয়েছে 'মেঘনাদবধ কাব্য'। একদিন মেঘনাদবধ কাব্য'-র স্রষ্টা মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোনো এক বিশেষ কাজের জন্য গিয়েছিলেন বাজারে। সেখানে দেখলেন এক অদ্ভুৎ দৃশ্য! কী দৃশ্য? কবি দেখলেন এক সাধারণ দোকানদার তাঁর সামনে বসে মন দিয়ে 'মেঘনাদবধ, কাব্য পাঠ করছেন!

কৌতূহলাবিষ্ট হয়ে রহস্যপ্রিয় কবি সেই দোকানে ঢুকে দোকনাদারকে জিগ্যেস করলেন, 'মশাই, কী বই পড়ছেন?'

দোকানদার বই থেকে মুখ তুলে বললেন, 'আজ্ঞে এ একখানি নতুন কাব্য।'

রসিক মধুসূদন বললেন, 'কাব্য পড়ছেন? বাংলা সাহিত্যে তো তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কবিতাই নেই, তা আবার কাব্য! হুঁঃ!'

দোকানদার মাইকেলকে বুঝিয়ে বললেন, 'সে কী মশাই, এই একখানি মাত্র কাব্যই তো যে কোনো জাতির ভাষাকে গৌরবান্বিত করতে পারে।'

হেসে মধুসূদন বললেন, 'তাই নাকি মশাই, তা এটা কী রকম কাব্য একটু পড়ুন তো দেখি, শুনি।'

মধুসূদনের কথা শুনে দোকানদার সাহেববেশী মাইকেলের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, 'আমার মনে হয় আপনি এই বইয়ের ভাষা ঠিক বুঝতে পারবেন না। শুনে কী কোনো লাভ হবে?'

মাইকেল বললেন, 'কেন মশাই, এর ভাষা বুঝি খুব কঠিন? তা হোক না, একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?'

নাছোড় মাইকেলের কথা অগ্রাহ্য না করতে পেরে অগত্যা সেই কাব্যপ্রিয় দোকানদার ' মেঘনাদবধ কাব্য' জোরে জোরে পাঠ করে শোনাতে লাগলেন। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও চিনতে পারলেন না সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা স্বয়ং কবিকে। কবিও সারাক্ষণ রসিকতা করে গেলেন, কিন্তু নিজের পরিচয় দিলেন না।

হরিদ্বারের গঙ্গাজল

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত পেশায় উকিল ছিলেন। একদিন দুপুরবেলায় কাজের ফাঁকে তিনি বার-লাইব্রেরিতে বসে একটু বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় তাঁর এক পরিচিত উকিল বন্ধু হাসতে হাসতে এসে তাঁকে বললেন, ' কবিমশাই, মেঘনাদবধের নরক বর্ণনাটা নিশ্চয়ই আপনি মিল্টন-এর থেকে নিয়েছেন, তাই তো?'

খোঁচা খেয়ে উঠে বসলেন মধুকবি। একটু হেসে মহাকবি দান্তের নরকবর্ণনা থেকে কিছু অংশ আবৃত্তি করে শোনালেন এবং পরে মিল্টন থেকে নরকবর্ণনা শুনিয়ে শেষে বন্ধুটিকে বললেন, 'এই দেখুন মশাই, মিল্টন যেখানে থেকে ভাবগ্রহণ করেছেন, আমিও সেখান থেকেই ভাবগ্রহণ করেছি, অর্থাৎ দান্তে থেকে।'

তারপর মধু হেসে বললেন, 'বন্ধুবর, গঙ্গাজল যদি খেতেই হয় তবে সাধ্য হলে হরিদ্বারের নির্মল জল খাওয়াই উচিত, কলকাতার গঙ্গার ঘোলা জল কেন খাবো?'

মাইকেলের কাছে জবর জবাব পেয়ে উকিল বন্ধুটি চুপ করে গেলেন।

কোকিল

মহাকবি মাইকেল ছিলেন সুপুরুষ ও সৌখিন। তাঁর গায়ের রঙ যদিও ছিল কালো। প্রথম দিকে মধুকবির কণ্ঠস্বরটিও ছিল মধুর। কিন্তু মাদ্রাজের এক হিমশীতল জলে স্নান করে মধুকবির মধুময় কণ্ঠস্বর চিরদিনের মত বিকৃত ও ভগ্ন হয়ে যায়।

একে গায়ের রঙ কালো, তার উপর ভাঙা গলা। কোনো কোনো নিন্দুক-হিংসুটে লোক এরপর থেকে মাইকেলের ভাঙা কণ্ঠস্বর ও গায়ের রঙ নিয়ে ব্যঙ্গ করতেন। তাই শুনে মাইকেল হেসে বলতেন:

'তবু আমি গলা ভাঙা কোকিল।
সাদা হাঁসের মতো করি না তো
প্যাঁক্ প্যাঁক্ প্যাঁক্।'

মাইকেলের এই কথা শুনে হিংসুটে-নিন্দুকরা আর কথা বলতে পারতেন না।

খাঁটি বাঙাল

মহাকবি মাইকেল একবার বেড়াতে গিয়েছিলেন ঢাকা শহরে। সেখানকার কিছু নব্যযুবক তাঁকে একদিন আমন্ত্রণ জানান এক সাহিত্য সভায়। সেই সভায় সেই নব্যযুবকের দল মাইকেলের উদ্দেশ্যে বলেন, 'হে কবিবর, আপনার বিদ্যাবুদ্ধি মমতা প্রভৃতির দ্বারা আমরা যেমন মহাগৌরবান্বিত হই, তেমনি আপনি ইংরেজ হইয়া গিয়াছেন শুনিয়া আমরা ভারি দুঃখিত হই। কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ করা মাত্র আমাদের সে ভ্রম দূর হইল।'

নব্যযুবকদের কথা শুনে কবি হেসে বলেন, 'আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর যে কোনো ভ্রমই হউক, আমি সাহেব হইয়াছি এ ভ্রমটি হওয়া ভারি অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে একখানি আরশি রাখিয়া দিয়াছি। এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা যখন বলবৎ হয় তখন অমনি আরশিতে মুখ দেখি। আমি শুধুমাত্র বাঙালি নহি। আমি খাঁটি বাঙাল। আমার বাটি যশোহর।'

মাইকেলের রসিকতা শুনে নব্যযুবকদের সভায় হাসির রোল উঠল।

বকুল ফুল

মধুসূদনের বাড়িতে নিয়মিত আড্ডার আসর বসত। একদিন কবি তাঁর বাড়িতে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বাংলাদেশের কবিদের কথা আলোচনা করছিলেন। মধুকবির অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল কবি কাশীরাম দাসের ওপর। আলোচনা প্রসেঙ্গ কাশীরাম দাসের কথা উঠলে মধুসূদন বলেন, 'কাশীরাম দাসের সমান কবি আমাদের দেশে আর নাই। দেখ, ওঁর রচিত মহাভারত তে-তলাতেও পড়া হচ্ছে, দো-তলাতেও পড়া হচ্ছে। আবার দোকানে এবং গাছ তলাতেও সাধারণ লোকে সুর করে পড়ছে।'

এরপর কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের প্রসঙ্গ উঠতে মধুসূদন বলেন, 'উনি বকুল ফুলের কবি।'

মধুর সন্ধ্যা-আহ্নিক

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম প্রথম যখন প্রহসন ও নাটক লেখা শুরু করেন, তখন তিনি অফিসের কাজ অর্থাৎ পুলিশ-আদালতের কাজ বেলা প্রায় চারটের মধ্যে পাট চুকিয়ে চলে যেতেন পাইকপাড়ার রাজবাড়িতে। কী হত সেখানে? রাজাদের সঙ্গে তিনি সেখানে রঙ্গরসিকতা, সরস কথোপকথনে, কাব্য, নাটক বিষয়ক আলোচনা ও নাট্য রচনা করে সময় কাটাতেন। তাঁর উপস্থিতি রাজারা বেশ উপভোগ করতেন।

একদিন সন্ধ্যায় মহাকবি লিখতে লিখতে হঠাৎ কলম থামিয়ে রাজার উদ্দেশ্যে হেসে হেসে বললেন, 'রাজামশাই, আমার সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় হল যে, সন্ধ্যা-আহ্নিকের ব্যবস্থা করুন।'

মধুকবির কথা শুনে অবাক রাজা ভাবলেন, এ কী বলে! খ্রীষ্টানের আবার সন্ধ্যা-আহ্নিক কী?

তখন মধুসূদন হাসতে হাসতে রাজা ঈশ্বরচন্দ্রকে বললেন, 'গেলাশরূপ কোশায় দুই আউন্স পেগরূপ গঙ্গাজল, আচমন কার্য সমাপন করে আহ্নিককৃত্য অনুষ্ঠান করতে হবে।'

রসিকতা শুনে রাজা হাসতে হাসতে কবির অপরূপ সন্ধ্যা-আহ্নিকের ব্যবস্থা করলেন।

সোনার হুঁকো

পাইকপাড়া রাজবাড়িতে কোনো এক সময় একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মহতী সভার আয়োজন করা হয়। অতিথিদের জন্য এই সময় বহু সোনা ও রূপার হুঁকো বার করা হয়। মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের জন্যও এলো একটা সুন্দর সোনার হুঁকো। সভা তখন বেশ জমে উঠছে। চেনা-অচেনা বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গের আনাগোনা সেই সভায়। মাইকেল সোনার হুঁকোতে সুখটান দিয়ে সভার পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যে রসিকতা করে বললেন, 'ঠাকুরমশাইরা, এ দাসের (অর্থাৎ মাইকেলের) হুঁকোটি মারবেন না। কারণ আমার জাত গেলে আর জাত পাবো না।'

মাইকেলের কথা শুনে সভায় হাসির রোল উঠল।

শহরের বামুনপাড়া

দীর্ঘদিন ইউরোপে থাকার পর মধুসূদন ১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে কলকাতায় ফিরে আসেন। কলকাতায় এসে কবি গবর্ণমেন্ট হাউসের পশ্চিম দিকে ব্যয়বহুল স্পেনসেস্ হোটেলে বাসস্থান ঠিক করেন। এই হোটেলে তিনি ছিলেন প্রায় আড়াই বছরের মত। কলকাতায় আসার কিছুদিন পর মধুসূদনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হল তাঁর এক পুরাতন সুহৃদের সঙ্গে। বহুদিন পর দু'জনের দেখা। নানা কথাবার্তার পর বন্ধুটি কবিকে জিগ্যেস করলেন, ' কোথায় বাসা নিয়েছ?'

রসিক মধুসূদন রসিকতা করে বললেন, 'বামুনপাড়ায়।'

এই কথা শুনে অবাক বন্ধু প্রশ্ন করলেন, 'বামুনপাড়ায়! সে আবার কী হে বন্ধু?'

ভানভনিতা দূর করে মধুসূদন এবার বললেন, 'গ্রামে যে পাড়া সকল পাড়ার মাথা, সেই পাড়াকে বলে বামুনপাড়া। এদিকে কলকাতার মধ্যে সাহেব পাড়াই হল শহরের মাথা। তাই শহরের বামুনপাড়া হল সাহেবপাড়া। সেই পাড়াতেই আমি বাসা নিয়েছি।' কবির কথা শুনে বন্ধু হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন।

কুরুক্ষেত্র রণে

ব্যারিস্টার মাইকেল মধুসূদন একদিন হাইকোর্টে যাবার জন্য ঘোড়ার গাড়িতে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যান এবং বেশ আঘাত পান। বেশ কিছুদিন কবিকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়। সিউড়ির জমিদার দাক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় একদিন কবি-ব্যারিস্টার মধুসূদনকে দেখতে গিয়ে জিগ্যেস করেন, 'কী হয়েছে?'

শয্যাশায়ী মধুসূদন হেসে উত্তর দিলেন, 'ভগ্নউরু! কুরুক্ষেত্র রণে।'

কবির রসিকতায় জমিদার হেসে উঠলেন ও কবির দ্রুত আরোগ্য কামনা করলেন।

শেক্‌সপীয়র ও নিউটন

তখন মধুসূদন হিন্দু কলেজের ছাত্র। মেধাবী ছাত্র হলেও গণিত চর্চা তাঁর ভালো লাগতো না। তাঁর পছন্দ ছিল সাহিত্যচর্চা। একদিন ভূদেবসহ অন্য সহপাঠীদের সঙ্গে শেক্‌সপীয়র ও নিউটনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ — তাই নিয়ে জোর তর্ক হয়। কবি মধুসূদন শেক্‌সপীয়রের পক্ষ নিয়ে বললেন, 'শেক্‌সপীয়র চেষ্টা করেলই নিউটন হতে পারতেন, কিন্তু নিউটন শত চেষ্টা করলেও শেক্‌সপীয়র হতে পারতনে না।'

কথা আছে তর্কে বহুদূর! সে দিন তর্কের মীমাংসা হল না। বেশ কিছুদিন পরে, গণিতের ক্লাসে অধ্যাপক রীজ সাহেব এক জটিল গণিতের প্রশ্নের সমাধান করতে দিলেন। তা এতই জটিল কোনো ছাত্রই সমাধান করতে পারলো না। শেষমেষ উঠে দাঁড়ালেন মধুসূদন। হাতে চক নিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে জটিল প্রশ্নের সমাধান করে দিলেন। সবাই অবাক! মধুসূদনের মনে পড়ল সেই দিনের তর্কের কথা। তিনি তখন নিউটনপন্থী প্রতিপক্ষ সহপাঠীর দিকে হাসতে হাসতে গর্বভরে বললেন, 'এ্যান্ড সো শেক্‌সপীয়র কুড বি নিউটন ইফ হি ট্রায়েড।'

অর্থাৎ—শেক্‌সপীয়র চেষ্টা করলেই নিউটন হাতে পারতেন।

আমাদের লাইন

একদিন 'নীলদর্পণ' নাটকের রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র মধুসূদনের বাড়িতে এসেছেন নাট্য-আলোচনা করতে। আলোচনা জমে উঠেছে।

সেই সময় কুচবিহারের মহারাজার সঙ্গীতগুরু মাইকেলের বাড়িতে এলেন। তিনি মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে অভিনয় করছেন। মধুসূদন সেই সঙ্গীতগুরুর সঙ্গে দীনবন্ধুর আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'ইনি আমাদের লাইনে আছেন।'

দীনবন্ধু ভাবলেন মাইকেল যেহেতু উকিল, তাই এই সঙ্গীতগুরুর পেশাও হয়তো একই। সেইজন্য দীনবন্ধু বললেন, 'ইনিও বুঝি ল-ইয়ার? দীনবন্ধুর কথা শুনে মাইকেল হেসে উঠে বললেন, 'না হে না, ইনি নাট্যশিল্পবিদ, আমাদের লাইনই তো, নয় কি?'

দীনবন্ধু বুঝতে পারলেন ও হেসে উঠলেন।

বৈষ্ণব পাঠক

কবি মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনা করেন সুহৃদ ভূদেব-এর বিশেষ অনুরোধে। বৈষ্ণবপাঠকগণ মহাজন পদাবলীর মতো মধুসূদন রচিত প্রাণমনোহারিনী কবিতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। এক পরম বৈষ্ণব এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি সুদূর নবদ্বীপ থেকে

কলকাতায় এসেছিলেন শুধুমাত্র কবি মধুসূদনকে দেখার জন্য। তিনি মধুসূদনের পরিচয় জানতেন না। কলকাতা শহরে এসে সেই বৈষ্ণব অনেক খুঁজে শেষপর্যন্ত মধুসূদনের বাড়িতে এসে পৌঁছলেন। দেখলেন, ঘরের চেয়ারে বসে একজন সাহেববেশী কৃষ্ণকায় ব্যক্তি কী সব লিখছেন! বাড়িটাও সাহেবদের বাড়ির মতো। ঠিক বাড়িতেই এসেছি তো! নাকি ভুল বাড়িতে! — ভাবতে ভাবতে বৈষ্ণব! ব্যক্তিটি যেই না বাইরে বেরোতে যাবেন, অমনি সাহেববেশী মধুসূদন তাঁকে কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'মশাই, আপনি কাকে খুঁজছেন?'

বৈষ্ণব জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা এ বাড়িতে কি মধুসূদন দত্ত বলে কেউ থাকেন?'

মধুসূদন জিগ্যেস করলেন, ' কেন? আপনার তাঁকে কী প্রয়োজন?'

বৈষ্ণব বললেন, 'আমি তাঁর লেখা 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। সেই পরম বৈষ্ণব মহাপূণ্যবান কবি মধুসূদনকে শুধুমাত্র একবার দেখব বলে নবদ্বীপ থেকে ছুটে এসেছি। যদি একবার ডেকে দেন তাঁকে দেখে দু'চোখ সার্থক করি।'

বৈষ্ণবের কথা শুনে হেসে মধুসূদন বিনয়ের সঙ্গে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমিই মধুসূদন দত্ত।'

মধুসূদনের কথা শুনে একেবারে স্তম্ভিত বৈষ্ণব! কিছুক্ষণ অবাক হয়ে স্থির থেকে কবির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর আবেগভরে কবিকে জড়িয়ে ধরলেন এবং আশীর্বাদ করলেন।

এই পরম প্রাপ্তি মধুসূদন কোনোদিন ভুলতে পারেন নি।

শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের রঙ্গ রসিকতা

জন্ম সাল-১৮৩৩

মৃত্যু সাল-১৮৮৬

হাঁড়ি

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব খুব আনন্দ পেতেন নব্যযুবকদের দেখলে।

তিনি বলতেন, "অহো! বড় ভালো লাগে ওদের দেখলে। আমি তো ওদের মধ্যে কামিনী-কাঞ্চনের মোহ দেখতে পাই না, দেখতে পাই না বিষয় বুদ্ধির লোভ। আর সেই কারণেই তো ওরা পবিত্র, শুদ্ধ। প্রকৃত অর্থে ওরা হল নিত্য সিদ্ধ। তাই তো শিশুকাল থেকেই ওদের ঈশ্বরের প্রতি এত আকর্ষণ! আমি যে ওদের মধ্যে সাক্ষাৎ নারায়ণকে দেখতে পাই গো। আর সেইজন্যই তো এই ছোকরাগুলোকে আমি এত ভালোবাসি।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আরও রসিকতা করে নব্যযুবকদের বলতেন, "এই ছোকরাগুলো যেন এক একটা নতুন হাঁড়ি গো! যার মধ্যে দুগ্ধ রাখা যায় নিশ্চিন্তে। আসলে ওদেরতো কাঁচা বয়স। ওদের যা দেবে, যা বলবে, তাই ওরা সহজসরলভাবে নেবে, ভালো মনে করেই নেবে। এমনকি উপদেশ, জ্ঞান সবকিছুই বড় সহজ সরল মনেই ওরা মেনে নেয়। তাই তো আমি ওদের বড় ভালোবাসি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এ হেন রসিকতা শুনে শ্রোতারা না হেসে থাকতে পারতেন না।

তৎকালীন নব্যযুবকরাও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় স্বামী বিবেকানন্দের নাম।

শব্দ

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্তরা তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, 'ঠাকুর, সমাধি কী করে হয়?'

ভক্তদের কৌতূহল দেখে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্যাখ্যা করে বললেন, 'আমরা দেখতে পাই প্রথম প্রথম সব কর্মেই খুব হই চই। যত ঈশ্বরের প্রতি এগুবে, ততই কমতে থাকবে কর্ম। শেষে কর্ম ত্যাগ এবং সমাধি।'

এরপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তদের রসিকতা করে একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, 'যেমন ধরো ব্রাহ্মন-ভোজন। কী হয় সেখানে? প্রথমে খুব হইচই! কিন্তু যখনই অতিথিরা খাবার পাতার সামনে গিয়ে বসলো, তখনই হই চই কমে গেল। তখন শুধু একটাই শব্দ—লুচি আনো হে, লুচি আনো!

লুচি-তরকারি খাওয়া শুরু হয়ে গেলে শব্দ কমে যায় বারো আনা। আর যখন দই আসে? তখন শুধু দই খাবার সুপ্ সুপ্ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই! আর ভোজন সমাপ্ত হলে?—নিদ্রা! তখন সব চুপ, একেবারেই চুপ!'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই রসিকতা ভক্তরা বেশ উপভোগ করতেন।

ছাগল পোষা

সেই সবে মাত্র নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেছেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। সেই ডালপালা মেলতে শুরু করেছে ব্রাহ্ম সমাজ। কেশবচন্দ্রের ওই সঙ্ঘে ছিল অনেক পুরুষ সদস্য। সংখ্যায় কম হলেও পাশাপাশি কিছু মহিলা সদস্যাও ছিল ওই সঙ্ঘে। এদের নিয়েই কাজকর্ম এগোচ্ছিল ব্রাহ্ম সমাজের।

একদিন কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নিমন্ত্রণ করলেন ব্রাহ্মসমাজের এক সভায়। নিমন্ত্রণ পেয়ে খুশি হয়ে কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে রামকৃষ্ণদেব এলেন ব্রাহ্মসমাজের সেই সভায়। রামকৃষ্ণদেবকে সভায় আসতে দেখে আনন্দিত কেশবচন্দ্র বললেন, 'আসুন ঠাকুর, আসুন!'

শ্রীরামকৃষ্ণ সভায় এসেই লক্ষ্য করলেন ব্রাহ্মসমাজে সভ্যদের পাশাপাশি কয়েকজন সভ্যাকেও। তারপর কেশবচন্দ্রকে ডেকে রসিকতা করে বললেন, 'সবে তো গাছ পুঁতেছেন! এরই মধ্যে ছাগল পোষা? সব যে মুড়িয়ে খাবে!'

কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের রসিকতার অর্থ বুঝলেন ও হেসে ফেললেন।

স্বার্থপর

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তাঁর ভক্তরা বললেন, 'ঠাকুর, স্বার্থপর লোকদের সম্পর্কে কিছু বলুন'।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের হাসতে হাসতে রসিকতা করে বললেন, 'বুঝলি, স্বার্থপর লোকেরা সমাজে অজ্ঞানই থেকে যায়। কী করে তাদের ঈশ্বরচিন্তা হবে? স্বার্থপর লোক এমন কিছুই করবে না, যাতে অন্যের উপকার হয়। তাকে যদি বলা হয় দোকান থেকে এক পয়সার সন্দেশ কিনে আনতে, সে তাও চুষে চুষে এনে দেবে।'

এরপর তিনি উদাহরণ দিয়ে বললেন,' যেমন ধর হাবাতে কাঠ। নিজে যখন জলে ভাসে একরকম করে ঠিকই ভাসে। কিন্তু যখনই একটা পাখি তার উপরে এসে বসে তখনই কাঠটা ডুবে যায়। ঠিক স্বার্থপর লোকের মত।'

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এই কথা শুনে ভক্তরা হো-হো করে হেসে উঠলেন। ধর্মকথা ও নীতি কথা খুব সহজ সরল ভাবে ভক্তদের বোঝাতেন শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রঙ্গ রসিকতা

জন্ম সাল-১৮৩৮

মৃত্যু সাল-১৮৯৪

ঘোমটা

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একবার তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নিয়ে চলেছেন ট্রেনে করে। তাঁর স্ত্রী ছিলেন পরমা সুন্দরী। ট্রেনের কামরায় রয়েছেন অনেক লোক জন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী ঘোমটায় ঢেকে রেখেছেন তাঁর মুখ। তখনকার দিনে বিবাহিতা রমনীরা মুখে ঘোমটা ঢেকে বাইরে বের হতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ট্রেনে স্ত্রীর পাশে বসে সংবাদপত্রে চোখ বোলাতে বোলাতে পর সংবাদপত্রের পাতা থেকে চোখ তুলে দেখলেন একজন নব্যযুবক আড়চোখে তাঁর স্ত্রীর ঘোমটা ঢাকা মুখের দিকে তাকাচ্ছে। ব্যাপার দেখে বঙ্কিমচন্দ্র মনে মনে হাসলেন। কিছু বললেন না। খানিক পরে আলাপ জমাতে শুরু করলেন সেই নব্যযুবকটির সঙ্গে। জিগ্যেস করলেন, 'কী করা হয়?'

আচমকা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্ন শুনে কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে যুবকটি উত্তর দিল' আজ্ঞে একটা কেরানীর চাকরি করি।'

বঙ্কিম আবার জিগ্যেস করলেন, 'তা মাইনে কত পাও?'

যুবকটি কুণ্ঠিত হয়ে বলল,' বেশি নয়, মাত্র বত্রিশ টাকা।'

তখন বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, 'আমি তখন থেকে লক্ষ্য করছি, তুমি এই মহিলার দিকে বারবার আড়চোখে তাকাচ্ছ! আমি এর ঘোমটা খুলে দিচ্ছি। বরং ভালো করেই দেখে নাও। হ্যাঁ আর একটা কথা বলি ভালো করে শুনে রাখো—আমি একজন ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট এবং সাহিত্যিক। নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আটশো টাকা মাইনে পাই। বইপত্র লিখেও ভালো আয় হয়। তা ধরো কমকরে সব মিলিয়ে মাসে প্রায় দেড় হাজার দুহাজার! পুরো টাকাটাই আমি সমর্পণ করেছি এই মহিলাকে। কিন্তু দুঃখের কথা, তবু এঁর মন আমি পাইনি! আর তুমি কিনা বত্রিশ টাকার কেরানী হয়ে এঁর মন পেতে চাও! দেড় হাজারকে সরিয়ে! বাঃ!'

এক কামরা লোকের সামনে বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে এহেন কথা শুনে নব্যযুবকটি লজ্জায় রাঙা হয়ে আর বসে থাকতে পারল না। সে পরের স্টেশনেই চলে গেল অন্য কামরায়। বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চিন্ত হয়ে পুনরায় মন দিলেন সংবাদপত্র পাঠে।

চিরকুট

বঙ্কিমচন্দ্র এক সকালে বসে একটি উপন্যাস রচনা করছেন। একজন বিলেত ফেরত বাঙালি সাহেব তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে এসে বাড়ির এক কাজের লোকের হাতে একটা ছোট কাগজ দিলেন এবং সেটা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পৌঁছে দিতে বললেন। কাজের. লোক সঙ্গে সঙ্গে সেই কাগজ বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র পড়ে দেখলেন, তাতে লেখা—'মিস্টার বি. চ্যাটার্জি-এর সাথে দেখা করতে চাই!'

বঙ্কিমচন্দ্র লেখাটা পড়ে চিরকুট বাহককে বললেন,' ওহে, ভদ্রলোককে জানিয়ে দাও মিস্টার বি.চ্যাটার্জী নামের কোনো লোক এখানে থাকেন না। আপনি ভুল করেছেন। এখানে থাকনে শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

চিরকুটবাহক বঙ্কিমচন্দ্রের কথামত ভদ্রলোককে সেকথা জানাতে বিলেতফেরত বাঙালি সাহেব ভদ্রলোকটি নিজের ত্রুটি বুঝতে পেরে লজ্জায় মাথা নত করে চলে গেলেন।

সংহার

বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'-র উপসংহার হিসাবে সাহিত্যিক দামোদর মুখোপাধ্যায় 'মৃন্ময়ী' নামের একটি উপন্যাস রচনা করেন। অতি নিম্নমানের রচনাশৈলী ছিল উপন্যাসটির। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং উপন্যাসটি পাঠ করেছিলেন। একদিন এক সাহিত্যসভায় দামোদরের সঙ্গে দেখা বঙ্কিমচন্দ্রের। ' কেমন লাগল আমার লেখা উপন্যাসটি'?—দামোদরের এই প্রশ্নের উত্তরে হল ভর্তি সাহিত্যরসিকদের মাঝে হাসতে হাসতে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, ' মশাই, আপনি আমার কপালকুণ্ডলার উপসংহার লিখে দেখছি একেবারে আমাকেই সংহার করেছেন।'

দামোদর বঙ্কিমচন্দ্রের রসিকতার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে একদম চুপ করে গেলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দামোদর মুখোপাধ্যায় ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বেয়াইমশাই। অর্থাৎ সম্পর্কটা ছিল যথাযথই রসিকতার।

বেয়াই-বেয়াই

বঙ্কিমচন্দ্র একবার এসেছেন সাহিত্যিক দামোদর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে তাঁর ভক্তের দল সেখানে। অর্থাৎ দামোদরের বাড়িতে সাহিত্যিকদের নিয়ে বসল একটি জমজমাট আড্ডা। সবাই যে যার চটি-জুতো খুলে রেখেছেন ঘরের বাইরে। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সৌখিন ব্যক্তি। তিনি পরতেন শুঁড়তোলা চটি। সাহিত্য পাঠ ও আলোচনা জমে উঠেছে। সঙ্গে টুকটাক আহারাদি। দামোদর একটু বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে বেরিয়ে দেখেন খানিকটা জল কোথা থেকে গড়িয়ে এসে লেগেছে বঙ্কিমচন্দ্রের চটিতে। তা দেখে দামোদর ঘরে ঢুকে বঙ্কিমচন্দ্রকে বললেন, ' বঙ্কিম চট্টো ভেসে গেল।'

রসিক বঙ্কিমচন্দ্র চটজলদি জবাব দিলেন, 'কোনদিকে হে? দামোদরমুখো বুঝি?'

কথা শুনে ঘরে হাসির রোল উঠল।

বেয়াই দামোদর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে উৎসব উপলক্ষে আর একবার এসেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। জমকালো আসর। নানা গুণী-মহারথীরা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে হুঁকা হাতে আসর আলো করে বসে আছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখে বেয়াই দামোদর মুখোপাধ্যায় সকলের সামনে মজা করে বললেন, ' এসো বঙ্কিম চট্টো। (অর্থাৎ বাঁকা চটি জুতো)।

রসজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যুত্তরে বললেন,' কোন দিকে হে বন্ধু, দামোদর মুখোয় বুঝি?' (অর্থাৎ দামোদরের মুখে)। দুই বেয়াইয়ের সম্পর্ক ছিল বড়ই মধুর। দুজনেই সাহিত্যিক, তাই দেখা সাক্ষাৎ হলেই ঠাট্টা-রসিকতা চলত নিয়মিত। অন্যরা এই রসিকতা বেশ উভোগ করতেন।

আর একবার দামোদর 'শান্তি' নামে এক উপন্যাস লিখে বঙ্কিমচন্দ্রকে উপহার দিলেন। উপন্যাস পড়ে বঙ্কিম মজা করে লেখেন—

প্রিয়তমেষু,

শান্তিপ্রাপ্ত হইলাম। ইহলোকে পাইলাম। পরলোকেও আশাকরি দামোদর বঞ্চিত করিবেন না।

ইতি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তাং-২২শে আশ্বিন।

মুখের মত

বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন বিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটকের লেখক দীনবন্ধু মিত্র। দীনবন্ধু ছিলেন সরকারি সুপার নিউমারি ইন্সপেক্টিং পোস্টমাস্টার। চাকরির সুবাদে তাঁকে নানা জায়গায় যেতে হত। একবার তিনি গেছেন আসামের কাছাড়ে। সেখান থেকে একজোড়া কাপড়ের জুতো কিনে নিয়ে এলেন বয়ঃকনিষ্ঠ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য। জুতো জোড়া ভালো করে মুড়ে একজন লোক মারফত পাঠিয়ে দিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে। তারসঙ্গে একটা চিরকুটে লিখলেন 'কেমন জুতো?'

বঙ্কিম জুতোজোড়া হাতে পেয়ে দেখলেন ও লেখাটি পড়ে মুচকি হাসলেন। তারপর জুতো বাহকের হাতে একটি চিরকুট লিখে ধরিয়ে দিলেন। কী লেখা সেই চিরকুটে? দীনবন্ধুর উদ্দেশ্যে সেই চিরকুটে লেখা ছিল ' ঠিক তোমার মুখের মত।'

অর্থাৎ তোমার মুখ যেমন সুন্দর, জুতো জোড়াও তেমনই।

হস্তিমূর্খ

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র একবার এসেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁঠালপাড়ার বাড়িতে। দুই সাহিত্যিকের সম্পর্ক ছিল রঙ্গ রসিকতা-ঠাট্টা তামাসার। বঙ্কিমচন্দ্র একদিন মজা করে একটা ছোট টুকরো কাগজে কী একটা লিখে দীনবন্ধুর অজান্তে তাঁর জামার পিছনে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিলেন। সেই লেখা পড়ে হাসছেন সকলেই। দীনবন্ধু কিছুই বুঝছেন না। শুধু ভাবছেন—কী ব্যাপার, সবাই আমার পিঠের দিকে তাকিয়ে হাসছেন কেন? শেষমেষ বুঝলেন, নিশ্চই বঙ্কিম কিছু কাণ্ড ঘটিয়েছেন। তখন দীনবন্ধু বঙ্কিমের ভ্রাতা পূর্নচন্দ্রকে ডেকে বললেন, ' ভাই, আমার পিঠে কী লেখা আছে একটু বলে দাও। কারণ হাতির পিঠে মশা-মাছি বসলে তো সে নিজে দেখতে পায় না।'

ছেড়ে দেবার পাত্র নন বঙ্কিমচন্দ্রও। চটজলদি তিনি রসিকতা করে বললেন 'বুঝলে তো, দেখতে পায় না বলেই তেমন জীবকে লোকে বলে হস্তিমূর্খ।'

বঙ্কিমের রসিকতায় দীনবন্ধু ও অন্যরা না হেসে পারলেন না।

হাফটোন ছবি

রামতনু লাহিড়ী ছিলেন ডিরোজিওর ইয়ং বেঙ্গল-এর অন্যতম সদস্য ও জ্ঞানান্বেষণ সমিতির সম্পাদক। সেই সময় সমাজে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাঁর পুত্র শরৎকুমার লাহিড়ী ছিলেন প্রখ্যাত পুস্তক প্রকাশক। শরৎকুমারের প্রকাশনের একটি গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি হাফটোন ছবি প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়। তখনকার দিনে এই দেশে হাফটোন ছবির ব্লক হতো না, আনতে হতো বিলেত থেকে। শরৎকুমার

তার পিতা রামতনুকে পাঠান বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে একটি ফটো চেয়ে নিয়ে আসতে। কিন্তু ছবি ছাপার ব্যাপারে বঙ্কিম খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু সম্মানীয় ব্যক্তি রামতনুর অনুরোধ উপেক্ষাই বা করেন কী করে! অনেক ভাবনাচিন্তা করে বঙ্কিমচন্দ্র রামতনুকে বললেন,'আপনি কিছু দিন পরে আপনার পুত্র শরৎকুমারকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি বিবেচনা করে দেখব কী করা যায়।'

রামতনু এ কথা শুনে প্রস্থান করলেন।

কয়েকদিন পর শরৎকুমারের ডাক পড়ল বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে। খুশি হয়ে এলেন শরৎকুমার। বঙ্কিমচন্দ্র শরৎকুমারের নামের সঙ্গেই শুধুমাত্র পরিচিত ছিলেন। আগে কখনো সাক্ষাৎ হয় নি।

শরৎকুমার বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে নম্রভাবে এসে দাঁড়ালে বঙ্কিমচন্দ্র জিগ্যেস করলেন, 'আপনার পরিচয়?'

শরৎকুমার হাসিমুখে বললেন, 'আই অ্যাম মিস্টার এস.কে. লাহিড়ী।'

বঙ্কিমচন্দ্র কৌতূহলবশত শরৎকুমারকে পুনরায় জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কী প্রয়োজনে আমার কাছে এসেছেন?'

শরৎকুমার বললেন, 'আপনিই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।'

বঙ্কিমচন্দ্র এবার চিনতে পারলেন যে ইনিই রামতনুর পুত্র। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমি তো কোনো এস.কে.লাহিড়ীকে চিনিনা। তাকে ডেকেও পাঠাইনি। তবে হ্যাঁ, শরৎকুমার লাহিড়ী বলে এক জনের আসার কথা ছিল বটে।'

নিজের অপরাধ বুঝে লজ্জা পেলেন শরৎকুমার। দোষ স্বীকার করে বঙ্কিমের কাছে নিজের ও পিতার পরিচয় দিলেন। তখন বঙ্কিচন্দ্র হেসে বললেন, 'তাই বলো, তুমিই শরৎকুমার, আমি কেমন করে এস.কে.লাহিড়ীকে চিনবো?'

বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক চিন্তামনস্ক হয়ে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করলেও মনে প্রাণে ছিলেন খাঁটি বাঙালি।

বুটের ঠোক্কর

বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই তাঁর সুহৃদ অধর সেনও ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। অধর সেন ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। বঙ্কিমচন্দ্রেরও ইচ্ছা ছিল একবার শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভ করেন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং এসেছেন অধর সেনের বেনিয়াটোলার গৃহে। খবর পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লোভ সামলাতে পারলেন না।

এলেন শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনে। অধর সেন বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এবং পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ' প্রভু, ইনিই সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অনেক বই লিখেছেন। আজ আপনাকে দর্শন করতেই এঁর আসা।'

সহজ-সরল মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখা মাত্রই আপন করে নিয়ে

বললেন, ' ওহে বঙ্কিম, কার হাতে পড়ে তুমি বেঁকলে গা?'

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে হেসে ফেলে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, ' আজ্ঞে হাতে নয় প্রভু, ইংরেজের বুটের ঠোক্করে বেঁকেছি।'

বঙ্কিমের কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও অধর সেন হেসে ফেললেন।

সাক্ষী

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তবে বিচারকের আসনে বসলেও তিনি রসিকতা করতে ছাড়তেন না। একবার একজন ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির নামে আদালতে নালিশ করে যে, সে জানলা খুলে প্রতিদিন তাঁর স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে।

মামলা উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে। বিচারকের আসনে বসে তিনি প্রথম ব্যক্তিকে জিগ্যেস করলেন, ' আপনার সাক্ষী আছে তো? নাহলে আপনি জানলেন কী করে লোকটি আপনার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকে।'

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা শুনে মাথা চুলকে ব্যক্তিটি বলল, 'হুঁজুর, সাক্ষী আমার স্ত্রী স্বয়ং! সে নিজেই দেখেছে লোকটি তার দিকে ড্যাব ড্যাব চোখে তাকিয়ে থাকে!'

কথা শুনে বঙ্কিমচন্দ্র সাহাস্যে বললেন, ' বুঝলাম, তাহলে দেখতে পাচ্ছি আপনার স্ত্রীরও পরপুরুষের প্রতি তাকিয়ে থাকার বদ অভ্যাস আছে। না হলে তিনি কেমন করে জানলেন এই ব্যক্তিটি তাঁর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছে?'

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা শুনে প্রথম ব্যক্তিটির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, হাসির রোল উঠল বিচারসভায়।

পরিশেষে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, ' চোখ আর হাওয়া কারও মানা মানে না, একথা সকলকে মনে রাখতে হবে।'

বাগবাজারের মেথরানী

বঙ্কিমচন্দ্র কর্মসূত্রে বারুইপুরে বদলি হয়ে আসার পর তার বাসায় নিয়মিত আসতেন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ও তৎকালীন চব্বিশপরগণার অ্যাসিসটেন্ট ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেনডেন্ট জগদীশ চন্দ্র রায়। তাঁরা এলে কয়েকদিন হৈহুল্লোড়, আমোদ আহ্লাদ, খানাপিনা চলত।

তখন বঙ্কিমচন্দ্র মজিলপুরে। দীনবন্ধু ও জগদীশ একবার রাত প্রায় নটায় বঙ্কিমচন্দ্রের মজিলপুরের বাসায় এসে হাজির। বঙ্কিমচন্দ্র এক মনে উপন্যাস রচনা করছিলেন। বাইরে দুই জন গাড়ি থেকে নেমে গলা ছেড়ে গান ধরলেন, 'আমরা বাগবাজারের মেথরানী গো.....!'

বঙ্কিমচন্দ্র গলা শুনে বুঝলেন বাইরে কারা এসেছেন। লেখা বন্ধ করে হাসতে হাসতে বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি চিৎকার বলে বললেন,' ও কালুয়া নিকাল দো, ও কালুয়া নিকাল দো।'

বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখে দীনবন্ধু ও জগদীশ আনন্দে দুহাত তুলে গান গাইতে গাইতে ঘরে প্রবেশ করলেন। দুই বন্ধুকে পেয়ে খুশি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

দক্ষিণা

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর দুই ভাই একবার দিগম্বর বিশ্বাসের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান। দিগম্বরের স্ত্রীর সাবিত্রী ব্রত উপলক্ষে এই ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ। গৃহকর্তা দিগম্বর যত্নসহকারে ভোজন করালেন বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর ভাইদের। ভোজনান্তে তৃপ্ত বঙ্কিমচন্দ্র হাত মুখ ধুয়ে দাঁড়ালেন দিগম্বরের সামনে। দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'খাওয়াদাওয়া তো হল, কই হে এবার দক্ষিণা দাও।'

দিগম্বর হাসতে হাসতে বললেন,' তুমি কি দুহাতে দক্ষিণা নেবে নাকি?'

বঙ্কিমচন্দ্র চটজলদি জবাব দিলেন,' না নিলে চলবে কেন ভাই। একটাকা গাড়িভাড়া। তিন ভাইয়ের রোজগার তো দেখছি মাত্র বারো আনা। বাকি চার আনা আমি নিজের পকেট থেকে দেবো নাকি?'

বঙ্কিমচন্দ্রের রসিকতা শুনে দিগম্বর ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন।

চিড়িতনের টেক্কা

বঙ্কিমচন্দ্র একদিন তাঁর সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে ট্রেনে চেপে যাচ্ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্য করলেন প্রত্যেক স্টেশনে যখন ট্রেন থামছে, একজন কৃষ্ণকায় কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া চুলওয়ালা যুবক তাঁদের কামরার কাছে এসে তাঁর স্ত্রীর দিকে ঘুরে ফিরে দেখে যাচ্ছে। শেষমেষ বঙ্কিমচন্দ্র একবার যুবকটির দিকে আঙুল তুলে স্ত্রীকে হাসতে হাসতে বললেন, 'দ্যাখো গিন্নি, ঠিক যেন চিঁড়িতনের টেক্কা!'

যুবকটি সেই কথা শুনতে পেয়ে বুঝতে পারলো, তাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। সে তৎক্ষনাৎ অপ্রতিভ না হয়ে উত্তর দিল,' মশাই, আপনার কাছে তো রঙের বিবি আছেই। তুরুপ করে নিন না।'

বঙ্কিমচন্দ্র যুবকটির উপস্থিত জবাবে খুশি হলেন।

চন্দ্র-চন্দ্র-চন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র একদিন গল্প করছিলেন আর এক 'চন্দ্র' কৈকালার চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে। দুই 'চন্দ্র'-এর খোশগল্প যখন জমে উঠেছে তখন আর এক চন্দ্রের প্রবেশ। তিনি সাহিত্যিক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

চন্দ্রনাথ ও চন্দ্রশেখরের ইতিপূর্বে আলাপ ছিল না। এই দায়িত্ব নিতে হল সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকেই।

বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখরকে দেখিয়ে চন্দ্রনাথকে বললেন, 'এঁকে চেন না?'

চন্দ্রনাথ বললেন,' না,চিনি না।'

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, ' আরে—উনি হলেন উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম।'

চন্দ্রনাথ ঠিক বুঝলেন না বঙ্কিমচন্দ্রের কথা। তখন বঙ্কিমচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, " চন্দ্রশেখর হলেন সাহিত্যজগতের বিখ্যাত বই 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'-এর রচয়িতা।"

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা শুনে বাকি দুই চন্দ্র হেসে উঠলেন।

কবি-সাহিত্যিক-সম্পাদক

নৈহাটিতে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন কবি নবীনচন্দ্র সেন। সঙ্গে এসেছেন 'সাধারণী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয় সরকার। বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষায় বৈঠকখানায় দুজন বসে। বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র ঘরে বসে। এমন সময় একজন দিব্যকান্তি সুপুরুষ হঠাৎ পিছন থেকে এসে নবীনচন্দ্রকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর মুখে মৃদু হাসি। সঞ্জীবচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে জিগ্যেস করলেন, 'লোকটা কে বলুন তো?'

নবীনচন্দ্র প্রণাম করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু প্রণাম করা হলো না। ভদ্রলোকটি নবীনচন্দ্রকে বুকে জড়িয়ে ধরে জিগ্যেস করলেন,'বলুন তো আমি কে?'

নবীনচন্দ্র হেসে উত্তর দিলেন,' আপনি বঙ্কিমবাবু।'

বঙ্কিমচন্দ্র জিগ্যেস করলেন,' কী করে চিনলেন?'

নবীচন্দ্রের চটজলদি জবাব,' শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়।'

নবীনচন্দ্রের রসিকতায় সন্তুষ্ট হয়ে রসিক বঙ্কিমচন্দ্র বললেন,' বটে, আমার গোঁফের ওপর তাহলে আপনার নজর পড়েছে!'

নবীনচন্দ্র হেসে বললেন, ' পড়ার কথা নয় কি?'

দুই কবি-সাহিত্যিকের রসিকতা শুনে সম্পাদক অক্ষয় সরকার হেসে উঠলেন। অক্ষয় সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব পরিচিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন ও বয়ঃ কনিষ্ঠ অক্ষয়চন্দ্রকে নাতি বলে ডাকতেন। অক্ষয়চন্দ্র 'সাধারণী' ছাড়াও

'নবজীবন' নামে আর একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে ধর্মতত্ব বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লেখেন।

বঙ্কিমচন্দ্র রসিকতা করে 'সাধারনী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্রের স্ত্রীর নাম দিয়েছিলেন 'আসাধারণী'।

কলসী ও দড়ি

বঙ্কিমচন্দ্র তখন হুগলীজেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি সপরিবারে থাকেন চুঁচড়ায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির কাছে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে। তাই নিয়মিত বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেবের বাড়িতে আড্ডা দিতে যেতেন। এমনই একদিন দুজনের খোশগল্প হচ্ছে। এমন সময় বাঁশবেড়ে বা বংশবাটির জমিদার রায়বাহাদুর ললিতমোহন ও তাঁর সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এসে ঢুকলেন ঘরে। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের আলাপ ছিল না। কিন্তু ভূদেব ন্যায়রত্নমহাশয়ের বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ভূদেব ন্যায়রত্নমহাশয়কে রসিকতা করে বললেন, 'এদিকে বুঝি কোথাও শ্রাদ্ধ আছে? তাই বুঝি বিদায় মাগুতে এসেছেন?'

ন্যায়রত্ন উত্তরে বললেন, ' না-না মশাই, ললিতবাবুর কাছে একটা বৈষয়িক কাজে এসেছিলাম।

কথাটা সত্য হলেও ললিতমোহন তামাসা করার সুযোগ হাতছাড়া না করে বললেন, 'বটে! এখনি দেব বামাল ধরিয়ে ! গাড়িতে এখনো কলসী মজুত আছে!'

ন্যায়রত্ন মশাইয়ের গাড়িতে সত্যসত্যই তাঁর একটা নতুন পিতলের কলসী ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র আর কতক্ষণ চুপ করে থাকতে পারেন?

তিনি হাসতে হাসতে বললেন,' ন্যায়রত্নমশাই, আপনি শ্রাদ্ধে এখনও যদি বিদায়ের কলসী গ্রহণ করেন, তবে সেই সঙ্গে একগাছি দড়িও নিতে ভুলবেন না! কারণ এই দড়ি-কলসী নিয়েই আলাপের সূত্রপাত হয় তাদের সঙ্গে! বঙ্কিমচন্দ্রের রসিকতা শুনে বাকি তিনজন একসঙ্গে হেসে উঠলেন।

কপালকুণ্ডলার জন্ম-কথা

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তখন খুলনায় বদলি। একদিন তাঁর খুলনার বাড়িতে আড্ডায় মেতেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়,দীনবন্ধু মিত্র ও শচীশ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। আড্ডার আসরে আলোচনায় উঠে আসছে সাম্প্রতিক সাহিত্য প্রসঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্র এমন সময় তাঁদের কাছে প্রশ্ন করলেন, ' বলো দেখি, যদি শৈশব থেকে যোলবছর পর্যন্ত কোন স্ত্রীলোক কাপালিকের দ্বারা বনের মধ্যে সমুদ্রতীরে পালিত হয় এবং কাপালিক

ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মানুষের মুখ দেখতে না পায়, সমাজের সব কিছু যদি তার অজানা থেকে যায়, পরবর্তীকালে যদি দৈবক্রমে কেউ তাকে বিবাহ করে সমাজে নিয়ে আসে, তবে তার কী রূপ অবস্থা হবে বলে তোমাদের মনে হয়?'

প্রশ্ন শুনে দীনবন্ধু ও শচীশ মাথা চুলকাতে লাগলেন, ভাবলেন—এ আবার কেমন প্রশ্ন রে বাবা! কিন্তু রসিক সঞ্জীবচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন,' মনে করো মেয়েটির বিবাহ হল একটি গরীবের বাড়িতে, তাহলে সে নির্ঘাত চোর হবে। কারণ খুব পরিস্কার—বনে-জঙ্গলে সে ভালো খেতে পরতে পারতো না। সমাজে ভালো ভালো খাবার দেখে তার লোভ হওয়া স্বাভাবিক। গরীবের ঘরে খেতে না পেলে সে চুরিবিদ্যাই শিখবে। শুধু খাবার নয়, সাজপোশাক করার জন্য সে গয়নাও চুরি করতে পারে!'

সঞ্জীবচন্দ্রের এই কথা শুনে দীনবন্ধু ও শচীশ হেসে উঠলেন। হাসলেন বঙ্কিমচন্দ্রও। তবে এই উত্তর তাঁর খুব একটা পছন্দ হল না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই ঘটনার কিছু পরেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অমর সৃষ্টি 'কপালকুণ্ডলা' রচনা করেন।

পেনসনের পেনসন

তখনকার ছোটলাট স্যার এসলে ইডেন বঙ্কিমচন্দ্রকে বড়ই স্নেহ করতেন। দুজনের মধ্যে মাঝে মাঝেই রঙ্গ রসিকতা চলতো।

একদিন ইডেন সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ডেকে জিগ্যেস করলেন, 'বঙ্কিমবাবু' আপনার পিতা কি আজও জীবিত আছেন?'

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'হ্যাঁ সাহেব, আছেন।'

ইডেন সাহেব পুনরায় জিগ্যেস করলেন, 'তা উনি কতদিন পেনশন ভোগ করছেন?'

বঙ্কিমচন্দ্র একটু ভেবে বললেন, 'পঁচিশ বছরের কম হবে না।'

ইডেন সাহেব তখন হাসতে হাসতে বললেন, 'দেখুন বঙ্কিমবাবু, কেউ পঁচিশ বছর চাকরি করলে আমরা তাকে পেনশন দিয়ে থাকি। আপনার পিতা তো পঁচিশ বছর পেনশন পাচ্ছেন. তাঁকে পেনশনের পেনসন দিলে কেমন হয়?'

রসিক বঙ্কিমচন্দ্র ইডেন সাহেবের রসিকতায় প্রাণখুলে হেসে উঠলেন।

দেমাকী

'সাধারণী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার সহ অনেকেই রসিকতা করে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'দেমাকী' বলে টিটকারী দিতেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্র রাগ করতেন না। তিনি

বলতেন,' এক গুলির আড্ডায় আমার বইয়ের সমালোচনা হচ্ছিল। তাদের ধারনা বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চই গুলি খায়, না হলে এমন রসিকতা কি তার হাত দিয়ে বের হয়।'

কথাটা যে তাঁর উদ্দেশ্যেই বলা সেটা অক্ষয়চন্দ্র বুঝলেন এবং আড্ডার আসরে হাসতে হাসতে বললেন,' আমি না হয় গুলিখোর, কিন্তু আপনার দেমাকে যে দেশের মাটি কম্পমান!'

সেই আড্ডার আসরে বসেছিলেন কবি নবীনচন্দ্র সেন। বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে বললেন, ' কথাটা ভুল নয়, ঠিকই! বহরমপুরে থাকার সময় আপিসের কাজের পর বাড়ি ফিরে লেখাপড়ার সুযোগ একটুও পেতুম না। সবসময় বাড়িতে স্তাবক-ভক্তবৃন্দের ভিড়। তাদের জ্বালাতনে আমি অতিষ্ট হয়ে উঠি। যে-ই আসে হুঁকো নিয়ে বসে গালগপ্পো জুড়ে দেয়! ব্যাস, লেখার দফারফা! কী করা যায়! কী ভাবে এদের হাত থেকে বাঁচা যায়! অনেক ভেবেচিন্তে বাড়ির দরজায় টাঙিয়ে দিলুম এক নোটিশ—কেউ আমার সাক্ষাৎ পাবেন না।

তারপর থেকেই বহরামপুরে আমার দেমাকী নাম ছড়িয়ে পড়ল। বাড়িতে কেউ আর জ্বালাতে আসতো না। আমি নিশ্চিন্তে আপিস থেকে ফিরে কাগজ-কলম নিয়ে বসে পড়তুম। সাহিত্যচর্চার ক্ষতি করে আমি কিছু করতে পারব না। তাতে লোকে আমাকে দেমাকী বললে আমার বয়েই গেল। কী বলো হে তোমরা?'

বঙ্কিমের কথাশুনে সবাই মাথা নাড়লেন।

দিনের গালে

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তখন অবসর গ্রহণ করেছেন। সেই সময় তিনি থাকতেন কলকাতার প্রতাপ চ্যাটার্জী লেনে নিজের বাড়িতে। সেখানে একদিন তিনি ভেতরের রোয়াকে বসে স্নানে যাবার আগে খালি গায়ে তেল মাখছিলেন।

এমন সময় সেখানে হাজির নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। দীনবন্ধু হঠাৎ দেখলেন দোতলা ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে আছেন বঙ্কিমচন্দ্রের সুন্দরী দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী!

তাঁকে দেখে রসিকতা করে দীনবন্ধু বললেন, 'অহো, এখানে কী চাঁদের শোভা!'

বঙ্কিমচন্দ্র তেল মাখা বন্ধ কবে ওপরের দিকে একবার তাকিয়ে হেসে পালটাপালটি উত্তর দিলেন, 'আহা গো, যেন দিনের (অর্থাৎ দীনবন্ধুর) গালের নোঙরা ফেলে দিয়েছে!'

দীনবন্ধু আর উত্তর দিতে পারলেন না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রঙ্গ রসিকতা

জন্ম সাল-১৮৬১
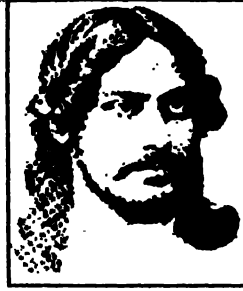
মৃত্যু সাল-১৯৪১

নতুন বৌঠানের রান্না

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু কবি ছিলেন না, তিনি রসিকও ছিলেন। সময় সুযোগ পেলেই তিনি পরিচিত-অপরিচিত মানুষজনের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতায় মেতে উঠতেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন বয়সে তরুণ। সবে মাত্র কবি হিসাবে তাঁর নাম একটু একটু করে ছড়াচ্ছে। সেই সময় তিনি নতুন কবিতা লিখেই প্রথম শোনাতেন তাঁর 'নতুন বৌঠান' কাদম্বরী দেবীকে। কাদম্বরী রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী। তিনি ছিলেন সাহিত্যপ্রেমী। 'ভোরের পাখি' কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা তিনি খুব পছন্দ করতেন। নতুন বৌঠানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছিল মধুর সম্পর্ক। ঠাকুরপো রবির লেখা কবিতা শুনে তিনি বলতেন, 'রবি, তুমি বিহারীলালের মত লেখ না কেন?' বিহারীলালকে রবি নিজের গুরু মনে করতেন। নতুন বৌঠানের মুখে এই কথা শুনে রবি আরো ভালো কবিতা লেখার চেষ্টা করতেন, যাতে নতুন বৌঠান সন্তুষ্ট হন। নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী এই ভাবে রবির লেখার মান উত্তরণের চেষ্টা করতেন।

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী নিয়মিত আসতেন জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে। কাদম্বরী দেবী তাঁকে নিমন্ত্রণ করে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াতেন। বিহারীলালকে কাদম্বরী দেবী একবার নিজের হাতে একটি সুন্দর আসন বুনে দিয়েছিলেন। সেই আসন উপহার পেয়ে খুশি হয়ে বিহারীলাল কিছুদিন পরে 'সাধের আসন' নামে একটি কাব্য রচনা করেন।

বিহারীলালের সঙ্গে ভোজ সভায় নিয়মিত ডাক পড়ত রবীন্দ্রনাথের। কাদম্বরী দেবী দু'জনকেই যত্ন করে রেঁধে খাওয়াতেন।

একদিন রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের সঙ্গে খেতে বসেছেন। বিভিন্ন রকমের সুস্বাদু পদ তৃপ্তি করে খাচ্ছেন দুই কবি। কাদম্বরী দেবী পরিবেশন করতে করতে জিগ্যেস করলেন, ' রবি, রান্না কেমন হয়েছে?'

রবীন্দ্রনাথ খেতে খেতেই উত্তর দিলেন, ' বৌঠান, পাক তো ভালই হয়েছে। এখন পরিপাক হলেই বাঁচি!'

রবীন্দ্রনাথের মুখে এই কথা শুনে বিহারীলাল ও কাদম্বরী দেবী দু'জনেই হেসে ফেললেন।

কবির রান্না

রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী মৃণালিণী দেবীকে 'ভাই ছুটি' বলে সম্বোধন করতেন। কবিতা লেখার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীর সঙ্গে মাঝে মাঝেই রঙ্গ রসিকতায় মেতে উঠতেন। একদিন কবি তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললেন, ' তোমরা কী আর রান্না করতে জান? আমি আজ তোমাদের একটা নতুন রান্না শেখাবো।'

মৃণালিণী দেবী শুনে বললেন, ' তাই নাকি ? কই দেখি কেমন রান্না!'

কবি গেলেন রাঁধতে। কী ভাবে?

কিছু আলু ও কড়াইশুটি সিদ্ধ করলেন। তারপর সেগুলোকে চামচের সাহায্যে ভালো করে মেশালেন এবং ছোট ছোট গুলি করলেন। শেষে সেই গুলিগুলোকে আধ কড়া ঘি-এ ভাজতে গেলেন। দূর থেকে সব লক্ষ্য করছিলেন মৃণালিণী দেবী। কবির আজব রন্ধন পদ্ধতি দেখে তিনি আর চুপ থাকতে না পেরে শেষমেষ বলেই ফেললেন, এভাবে ভাজা যাবে না, ওতে কিছু বেসন দিতে হবে।'

রবীন্দ্রনাথ না-ছোড়, তর্ক জুড়ে দিলেন গিন্নির সঙ্গে, বললেন, 'কেন হবে না? কই, না হবার তো কোনো কারণ দেখছি না!'

যতই গুলিগুলো কড়াইয়ের গরম তেলে ফেলেন, সেগুলো ততই ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে যেতে থাকল। এ দেখে হতাশ হলেন কবি। করুণ ভাবে তাকালেন স্ত্রীর দিকে। মৃণালিণী দেবী হেসে বললেন, ' হল তো!'

এবার হেসে ফেললেন রবীন্দ্রনাথ, বললেন, 'এই রকম হবার তো কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না!'

এ কথা শুনে হেসে ফেললেন মৃণালিণী দেবী। তারপর বেসন দিয়ে সেই গুলিগুলোকে ভাল করে ভেজে খেতে দিলেন কবিকে।

রবীন্দ্রনাথ সেই ভাজা মুখে পুরে খেতে খেতে হাসি মুখে মৃণালিণী দেবীকে বললেন, ' হ্যাঁ, এই হচ্ছে রান্না!'

দাড়িশ্বর

রবীন্দ্রনাথ একদিন এক সংগীতের আসরে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। কবি যখন

এলেন, তখন আসরে সংগীত পরিবেশন করছেন বিখ্যাত ধ্রুপদ গানের শিল্পী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। কবি তাঁর গান শুনে মুগ্ধ। গোপেশ্বরের গাওয়া শেষ হলে উদ্যোক্তারা রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে অনুরোধ করলেন, ' গুরুদেব, এবার আপনাকে গান গাইতে হবে।'

সেদিনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ শ্রোতা হিসাবেই উপস্থিত ছিলেন। উদ্যোক্তাদের অনুরোধ তিনি হাসতে হাসতে বললেন, ' বুঝেছি, বুঝেছি, গোপেশ্বরের পর এবার দাড়িশ্বরের পালা।'

রবীন্দ্রনাথের মুখে এই কথা শুনে আসরে হাসির রোল উঠল।

সজীব চেয়ার

রবীন্দ্রনাথ নিজেই ছড়া করে বলতেন—

"কোনদিন এত বুড়ো হবো নাকো আমি।
হাসি তামাসারে যবে কবো ছ্যাবলামি।।"

চিররসিক রবীন্দ্রনাথ রঙ্গ রসিকতা করতে খুব ভালবাসতেন।

একবার বেয়াই বাড়িতে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে কবিকে যথারীতি আপ্যায়ন করে একটা গদিমোড়া কেদারায় বসতে দেওয়া হল। রবীন্দ্রনাথ কেদারার দিকে তাকিয়ে ভুঁ কুঁচকে বললেন, 'ওহে, এটা সজীব নয়তো?'

চেয়ার আবার সজীব! সবাই ভাবলেন, রবীন্দ্রনাথ এ আবার কী বলছেন! চেয়ার বা কেদারা কাঠের তৈরী, জড় পদার্থ! তা আবার সজীব হয় নাকি?

সকলের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে এবার হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ। বললেন, ' অত ভাববার কী আছে? আমি বলছি—চেয়ারটা সজীব মানে ছারপোকা টারপোকা ভর্তি নয়তো?'

এ কথা শুনে এবার সকলে হাসতে লাগলেন।

সানাই

এক ভদ্রলোক প্রথমবার শান্তিনিকেতনে এসেছেন। তিনি দেখা করতে গেলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। গুরুদেবের কাছে যাওয়ার আগে ভদ্রলোকটিকে শান্তিনিকেতনের একজন মজা করার জন্য বললেন, ' জেনে রাখুন, গুরুদেব আজকাল কানে কম শুনছেন। আপনি কথা বলার সময় গুরুদেবের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জোরে কথা বলবেন। না হলে গুরুদেব কিছুই শুনতে পাবেন না!'

সেই কথা মনে গেঁথে নিয়ে ভদ্রলোকটি রবীন্দ্রনাথের ঘরে ঢুকলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন একটি বই পড়ছিলেন। ভদ্রলোকটিকে দেখে তিনি জিগ্যেস করলেন, 'আপনার নাম কী?'

এবার ভদ্রলোকটি রবীন্দ্রনাথের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'আমার নাম কানাই।'

এত জোরে চেঁচিয়ে ভদ্রলোকটিকে কথা বলতে শুনে রবীন্দ্রনাথ অবাক হলেন। শেষে রসিকতা করে বললেন, 'নামটা সানাই হলে আরো ভালো হতো।'

এ কথা শুনে ভদ্রলোকটি লজ্জা পেয়ে গেলেন।

বলাই

সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, যাঁর ছদ্মনাম বনফুল, এক সভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তাঁর বক্তৃতা শেষ হলে সবাই তাঁর বলার প্রশংসা করলেন। সভায় উপস্থিত রবীন্দ্রনাথও তাঁর বক্তৃতার প্রশংসা করে বললেন, 'একটা কথা আপনারা সবাই ভুলে যাচ্ছেন কেন— বলাই তো ভালই বক্তৃতা দেবে, ওর নামই যে বলাই। বলাই তো ওর কাজ।'

কবিগুরুর মুখে এই কথা শুনে সভায় হাসির রোল উঠল।

কুঁজোর জল

সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বা বনফুল একবার ভাগলপুর থেকে শান্তিনিকেতনে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। রবীন্দ্রনাথ তখন আছেন উত্তরায়ণে। বনফুল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এগারোটার সময় দেখা করতে এলেন। বনফুল ঘরে ঢুকে দেখলেন রবীন্দ্রনাথ একটা বিরাট ঘরে বিরাট টেবিলে ঝুঁকে মন দিয়ে লিখে চলেছেন। কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। বনফুল অনেকক্ষণ চুপ দাঁড়িয়ে রইলেন। ডেকে কবিকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। লিখতে লিখতে এক সময় রবীন্দ্রনাথই মুখ তুলে দেখলেন সামনে বনফুল দাঁড়িয়ে। বনফুলকে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'কখন এলে? বোসো, আমার লেখাটা এক্ষুণি শেষ হয়ে যাবে।'

বনফুল বসলেন। রবীন্দ্রনাথ লেখা শেষ করে বললেন, 'হ্যাঁ, বল কী খবর?'

বনফুল করজোড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গুরুদেব, অত ঝুঁকে লিখতে আপনার কষ্ট হয় না? আজকাল তো দেখি কতরকম চেয়ার বেরিয়েছে, তাতে ঠেস দিয়ে বসে আরাম করে লেখা যায়।'

বনফুলের কথা শুনে পরিহাসপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ মুচকি হেসে বললেন, 'জানি, সব

রকমের চেয়ারই আমার আছে। কিন্তু না ঝুঁকে লিখলে লেখা বেরোয় না যে। আসলে কুঁজোর জল কমে গেছে তো, তাই উপুড় করতে হয়।'

গুরুদেবের মুখে এ কথা শুনে বনফুল হেসে ফেললেন।

চিরঋণী

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ একজনকে গল্প করতে করতে বলেছিলেন, ' একটি লোক আমার কাছে এসে দশ টাকা ধার নিয়ে গিয়েছিল। নেবার সময় বলেছিল—গুরুদেব, আমি আপনার কাছে চিরঋণী রইলাম। এ কথা বলে রবীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চুপ থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'লোকটা কিন্তু সত্যবাদী ছিল, সে চিরঋণীই রয়ে গেল। দশটাকা সে আর আমাকে ফেরত দিয়ে গেল না।'

বিসর্জন মহড়ায়

রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে তখন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি মেতে উঠেছে। নিয়মিত রিহার্সাল চলছে। একদিন একটি বড় হল ঘরে ' বিসর্জন' নাটকের মহড়া চলছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত সেই মহড়ায়। আর থাকবেন নাই বা কেন, নাটকে তিনি নিজে অভিনয় করছেন জয়সিংহের চরিত্রে। দীনু ঠাকুর বা দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিনয় করছিলেন রঘুপতির ভূমিকায়। দীনু ঠাকুর ছিলেন লম্বা, চওড়া সুপুরুষ। নাটকের শেষ দৃশ্যে রবীন্দ্রনাথ অভিনীত জয়সিংহ চরিত্রটির মৃত্যু হবে এবং দীনু ঠাকুর অভিনীত রঘুপতি চরিত্রটি শোকাহত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে মৃতদেহের ওপর। প্রথম সবকটি দৃশ্যের মহড়া শেষ। এবার শেষ দৃশ্যের মহড়া।

যথাসময়ে রবীন্দ্রনাথ অভিনীত জয়সিংহর মৃত্যু হল, শোহাকতের অভিনয় করে কাঁদতে কাঁদতে রঘুপতি দীনু ঠাকুর ঝাঁপিয়ে পড়লেন রবীন্দ্রনাথের ওপর। ঝাঁকুনি সহ্য করতে না পেরে রবীন্দ্রনাথ তখন চেঁচিয়ে দীনু ঠাকুরকে বলে উঠলেন, ' ও দীনু, তুই ভুলে যাসনি, আমি কিন্তু সত্যি সত্যি মরিনি, বেঁচেই আছি।'

এ কথা শুনে মহড়ায় হাসির রোল উঠল।

বপুখানি

নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী শান্তিনিকেতনে নতুন অধ্যাপক হয়ে এসেছেন। তিনি যেমন পণ্ডিত, তাঁর চেহারাটাও তেমনি বিশাল। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম দেখা করতে গেলে গুরুদেব তাঁকে ' আপনি' সম্বোধন করে কথা বলেন। এতে নিত্যানন্দ

বড়ই বিব্রত হন। কারণ তিনি গুরুদেবের থেকে বয়সে অনেক ছোট। একদিন তিনি বাধ্য হয়েই রবীন্দ্রনাথকে বললেন, ' গুরুদেব, আপনি আমাকে আপনি আপনি বলছেন কেন ? তুমি বলবেন।'

একথা শুনে পরিহাসপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে বললেন, ' কী করি বাপু, তোমার যে বপুখানি! অন্তত তার মর্যাদা তো দিতেই হবে।'

এ কথা শুনে নিত্যানন্দ হেসে ফেললেন।

জোড়াসাঁকো নয়

রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন শিলাইদহে পদ্মা নদীর ওপর বজরায় বাস করেন। নদীর চরের গায়ে পাশাপাশি বাঁধা দুটি বজরা। মনোরম পরিবেশ, সাহিত্যচর্চার জন্য এর থেকে ভাল জায়গা আর কী হতে পারে! দুটি বজরার একটিতে রবীন্দ্রনাথ, অন্যটিতে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক অজিতকুমার চক্রবর্তী থাকেন। অসুস্থ অজিতকুমার স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় এসেছেন এখানে।

ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই সময় শিলাইদহে আমন্ত্রণ জানান কবিগুরু। গুরুদেবের আমন্ত্রণ—তাই সঙ্গে সঙ্গেই এসে গেলেন চারুচন্দ্র। তাঁর থাকার ব্যবস্থা হলো অজিতকুমারের বজরায়। অজিতকুমারের বজরায় নিজের জিনিসপত্র রেখে চারুচন্দ্র প্রণাম করতে এলেন গুরুদেবকে। গুরুদেবকে তখন মন দিয়ে একটি বই পড়ছিলেন। চারুচন্দ্রকে দেখে খুশি হলেন রবীন্দ্রনাথ। গুরুদেবকে প্রণাম করে চারুচন্দ্র অজিতকুমারের বজরায় যাবার জন্য পা বাড়ালেন। পাশাপাশি দুটি বজরায় যাতায়াতের জন্য এক বজরা থেকে অন্য বজরা পর্যন্ত একটা লম্বা শক্তপোক্ত তক্তা পাতা। চারুচন্দ্র অজিতকুমারের বজরায় যাবার জন্য সেই তক্তায় পা দিতেই রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'চারু, তক্তার ওপর দিয়ে খুব সাবধানে যেও, মনে রেখ, এটা জোড়াসাঁকো নয়, এক সাঁকো।'

কবির এই কথা শুনে চারুচন্দ্র হেসে ফেললেন।

হিংসা প্রবৃত্তি

শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর ঘরে একদিন অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রী ও অন্যকয়েকজন বসে হাল্কা গল্পগুজব করছিলেন। কবিগুরু তাঁদের কথাবার্তা মন দিয়ে শুনছিলেন। এমন সময় আচমকা কবিগুরু বিধুশেখর শাস্ত্রীকে বলে উঠলেন, ' শাস্ত্রীমশাই, আপনি এতদিন যে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন, কিন্তু আপনার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি গেল না কেন ?'

শাস্ত্রীমশাই এ কথা শুনে অবাক! কী এমন অন্যায় হল যে, গুরুদেব এমন কথা বললেন! আকাশপাতাল ভেবে কিছুই বুঝতে না পেরে শাস্ত্রীমশাই বললেন, 'গুরুদেব, আমার কী অপরাধ?'

এবার মুচকি হেসে রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীমশাইয়ের কামানো দাড়ি গোঁফের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, 'এই দাড়ি-গোঁফগুলোকে ছেড়ে দিন, বাড়তে দিন, আর হিংসা করবেন না।'

রবীন্দ্রনাথের মুখে এই কথা শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন বিধুশেখর শাস্ত্রী। অন্যরা হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন।

সাড়ে পাঁচটা

এক সাহিত্যসভায় যাবার নিমন্ত্রণ পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, সভা শুরু হবে ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। সময়কে প্রচণ্ড গুরুত্ব দিতেন গুরুদেব। কথা দেব অথচ কথা রাখব না—এটা তাঁর পছন্দ ছিল না। উদ্যোক্তাদের তিনি জানিয়ে দেন সভার দিন যথা সময়ে পৌঁছে যাবেন। যথারীতি তিনি নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে সেই সভায় উপস্থিত হলেন। কিন্তু এ কী কাণ্ড! দর্শকরা উপস্থিত, উদ্যোক্তারা কোথায়? তাঁদের কারোর দেখা নেই! রবীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। কিন্তু তখনো উদ্যোক্তাদের কাউকে আসতে না দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি একটি চিঠি লিখে রেখে ফিরে গেলেন। চিঠিতে লেখা ছিল—

"এসেছিলেম, বসেছিলেম।
দেখলেম কেউ নেই।
আমার সাড়ে পাঁচটা জেনো।
পাঁচটা তিরিশেই।"

কিছু পরে উদ্যোক্তারা এসে যখন চিঠিটি পড়লেন, তাঁদের চক্ষু চড়কগাছ!

উপরি

একবার ২৫ শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালনের ব্যবস্থা হয়েছে কালিম্পং-এ। তাই সেদিন সেখানে সাজো সাজো রব। সকাল থেকেই অনেকে আসছেন কবিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে। কবি সকলের সামনে 'জন্মদিন' নামে একটি নতুন কবিতা পড়লেন।

বিখ্যাত চিকিৎসক মনমোহন সেন সেদিন কবির সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সঙ্গে

তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ী দেবী ও শ্যালিকা চিত্রিতা দেবী।

কবি চিত্রিতা দেবীকে দেখে মনমোহনকে বললেন, ' ওহে ডাক্তার, তুমি তো ভাগ্যবান হে! একটি পাওনা আর একটি উপরি? আমাদের তো এত সৌভাগ্য ছিল না।'

গুরুদেবের মুখে এই কথা শুনে তিনজন হেসে উঠলেন এবং কবিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন।

বাঘ শিকারের গল্প

রবীন্দ্রনাথের কাছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের মানুষ আসতেন। একদিন সন্ধেবেলায় বিখ্যাত শিকারী কুমুদনাথ চৌধুরী এসেছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। হাতে শিকারের বন্দুক। এসেই তিনি গুরুদেবের কাছে সগর্বে নিজের বাঘ শিকারের গল্প করতে লাগলেন। গল্পের মাঝে তিনি রবীন্দ্রনাথকে জিগ্যেস করলেন, ' গুরুদেব, আপনি কখনো বাঘ শিকার করেছেন?'

গম্ভীর মুখে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'বাঘ শিকার? তা এক-আধটা নয় ভাই, বোধহয় গুণে শেষ করা যাবে না!'

এ কথা শুনে কুমুদনাথ সহ অন্যরা অবাক। রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা কবি হিসাবেই জানেন। কিন্তু উনি যে একজন দক্ষ শিকারী, তার ওপর অনেক বাঘ মেরেছেন, তা তো কখনো শোনা যায়নি! রবীন্দ্রনাথের মুখে বাঘ শিকারের কথা শুনে একেবারে চুপসে গেলেন কুমুদনাথ। তিনি ভেবেছিলেন, নিজের বাঘ শিকারের কথা বলে একেবারে মাত করে দেবেন। কিন্তু এ কী হলো! তখন একজন নীচু স্বরে রবীন্দ্রনাথকে জিগ্যেস করলেন, 'গুরুদেব, সত্যি সত্যিই আপনি বাঘ মেরেছেন?'

এবার রবীন্দ্রনাথ মুচকি হেসে বললেন, ' হ্যাঁ, আমি B U G বা ছারপোকার কথাই বলছি। না, কুমুদের মত টাইগার আমি কখনো মারিনি।'.

এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন কুমুদনাথ এবং শুরু করলেন আরো নতুন নতুন বাঘ শিকারের গল্প।

পিঠে পুলি

রবীন্দ্রনাথ ঘরোয়া মিষ্টি ও পিঠেপুলি খেতে খুব ভালবাসতেন। তাঁর পিঠেপুলিপ্রীতির কথা সকলেই জানতেন।

গুরুদেব তখন শান্তিনিকেতনে। এক শীতের রাতে আশ্রমের এক শিক্ষকের স্ত্রী রবীন্দ্রনাথের জন্য পিঠেপুলি তৈরী করে নিয়ে এলেন। খুব যত্ন করে তৈরী করেছেন, কারণ রবীন্দ্রনাথ খাবেন। গুরুদেবের কাছে পিঠে এনে তিনি বললেন, 'গুরুদেব,

আপনার জন্য পিঠে নিয়ে এসেছি, আপনি খাবেন?'

খুশি হয়ে রবীন্দ্রনাথ সব কটি পিঠে তৃপ্তি করে খেয়ে নিলেন। ভদ্রমহিলা জিগ্যেস করলেন, 'গুরুদেব, পিঠে কেমন লাগল?'

রবীন্দ্রনাথ এবার মজা করে ছড়া কেটে বললেন—

"লোহা কঠিন, পাথর কঠিন।
আর কঠিন ইষ্টক।
তার অধিক কঠিন কন্যা।
তোমার হাতের পিষ্টক।"

শান্তিনিকেতনের অনেক আশ্রমবালিকাই রবীন্দ্রনাথকে পিঠেপুলি ও মিষ্টি তৈরী করে খাওয়াতেন।

দণ্ডনিও

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ একদিন শান্তিনিকেতনের শিক্ষক নেপাল রায়কে একটি চিঠি লিখলেন—'কাল বিকেলে আমার এখানে এসো ও চা পান করে দণ্ড নিও।'

চিঠি হাতে পেয়েই নেপাল রায়ের চক্ষু চড়কগাছ! গুরুদেব এমন কেন লিখলেন? চা পান না হয় ঠিক আছে, কিন্তু দণ্ড নেওয়ার কথা লিখলেন কেন! কী এমন অপরাধ হল রে বাবা! সত্যিই কি শাস্তি পাওয়ার মত কিছু হয়েছে! চিন্তায় পড়লেন নেপাল রায়। তাঁর চোখ মুখ শুকিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল! সারারাত ঘুমোতে পারলেন না এই কথা ভেবে। গুরুদেব অসন্তুষ্ট হওয়া মানে আর শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করা যাবে না, থাকাও যাবে না!

পরের দিন বিকেলে নেপাল রায় গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন উত্তরায়ণে, কবিতা লিখছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নেপাল রায়কে দেখে লেখা থামিয়ে গম্ভীর ভাবে বললেন, 'বোসো, কথা আছে।'

নেপাল রায় আরও ভয় পেয়ে গেলেন। এরপর রবীন্দ্রনাথ স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। এর মধ্যে আরো অনেকে এসে হাজির। রবীন্দ্রনাথের ভৃত্য টেবিলে চা-এর সাথে লোভনীয় খাবার রেখে গেল। রবীন্দ্রনাথ সকলকে খেতে বললেন। সবাই খাবার তুলে খেতে শুরু করলেন। কিন্তু ভোজন রসিক নেপাল রায় খেতে পারলেন না। খাবেন কী করে? তাঁর বুকের মধ্যে ভয় লুকিয়ে রয়েছে যে! এইভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল। রাতও হল অনেক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শাস্তির কথা বলছেন না। নেপাল রায় খাবারে হাত দেননি দেখে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'তুমি তো কিছুই খেলে না। তাছাড়া আজকাল তোমার বড্ড ভুল হচ্ছে।'

এই বলে গম্ভীর হয়ে রবীন্দ্রনাথ ভেতরে চলে গেলেন। সবার সামনে আরো ভয়

পেয়ে গেলেন নেপাল রায়! ভুল হবার কথা কী বললেন গুরুদেব! এরপর রবীন্দ্রনাথ ভেতর থেকে একটা মোটা লাঠি এনে নেপাল রায়ের হাতে দিয়ে বললেন, ' নেপাল, এই নাও তোমার দণ্ড, সেদিন এখানে এসে ভুল করে ফেলে গেছ।'

এই কথা শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন নেপাল রায়। ভাবলেন—গুরুদেব তাহলে এই দণ্ড পাওয়ার কথাই লিখেছিলেন। তারপরে আফশোস করলেন— ইস্,ভয় পেয়ে চা-পান ও লোভনীয় খাবার থেকে বঞ্চিত হলাম!

মিষ-টক

খাদ্যরসিক রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই শান্তিনিকেতনে তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। আসলে রবীন্দ্রনাথ যেমন খেতে ভালবাসতেন, তেমন খাওয়াতেও ভালবাসতেন। কবিগুরুর খাসভৃত্য বনমালী এই খাবারের ব্যবস্থা করত। একবার গরমকালে রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছেন তাঁর আত্মীয় ও প্রথম যুগের চলচ্চিত্র অভিনেতা ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। যিনি ডি.জি নামেও পরিচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ধীরেন্দ্রনাথের ছেলেবেলা কাটে শান্তিনিকেতনেই। তিনি বালক বয়সেই অভিনয়, সংগীত, অঙ্কন, যন্ত্রবাদনে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। উনি রবীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন ও ' বাল্মিকী প্রতিভা' নাটকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অভিনয় করেন। রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন বাল্মিকী, ডি.জি হয়েছিলেন মায়া। ধীরেন্দ্রনাথ প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের সম্পূর্ণ বাংলা ছবি 'বিলেত ফেরত' তৈরী করেন। ১৯২১ সালে ২৬ ফ্রেব্রুয়ারি ভবানীপুরের রসা থিয়েটারে ছবিটি মুক্তিলাভ করে। এই ছবির মূল চরিত্রে অভিনয় করেন ডি. জি। রবীন্দ্রনাথ ধীরেন্দ্রনাথকে বিশেষ স্নেহ করতেন। তাই তিনি আসায় বিশেষ ভোজনের ব্যবস্থা করা হল। বনমালী বাজার থেকে আম কিনে আনল। কবি ও ডি.জি একসঙ্গে খেতে বসেছেন। আম খেতে শুরু করে ধীরেন্দ্রনাথের মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারটা আন্দাজ করে বললেন, ' কী ধীরু, আমটা মিষ্টি তো?'

কী আর বলেন ধীরেন্দ্রনাথ! তিনি চুপ করে হাসলেন। বনমালী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ' হ্যাঁ হ্যাঁ, আম মিষ্টি, আমি চাখিয়ে নিয়ে তবে কিনেছি। মিষ্টি না হওয়ার কারণ নেই।'

রবীন্দ্রনাথ এবার হেসে বললেন, ' আসলে বনমালী যাকে দিয়ে আম চাখিয়েছে সে আমওলারই লোক। আম চেখে সে নিশ্চই বলেছিল মিষ-টক। আর বনমালী শুনেছে **মিষ্ট**। ওর আর কী দোষ?'

রবীন্দ্রনাথের এই কথা শুনে ধীরেন্দ্রনাথ হেসে ফেললেন।

সাঁওতাল মেয়ে

একদিন রবীন্দ্রনাথ উত্তরায়ণের বারান্দার এক কোণে চেয়ার-টেবিলে বসে মগ্ন হয়ে কবিতা লিখছিলেন। বাগানে একটি সাঁওতাল মেয়ে সেই সময় ঘাস পরিস্কার করছিল। কাজ শেষ হলে বিকেলে মেয়েটি রবীন্দ্রনাথের পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াল। মেয়েটিকে দেখে রবীন্দ্রনাথ লেখা থামিয়ে বললেন, 'কী রে, কিছু বলবি?'

মেয়েটি এবার বলল, 'হ্যাঁরে, তুর কি কুন কাজ নাই? সুকালবেলা যখন কাজে এলম, দেখলম তুই এখানে বসে কী করছিস! দুপুরেও দেখলম, এখানে বসে আছিস! এখন আবার সনঝেবেলা আমাদের ঘরকে যাবার সময় হয়েছে—এখনও তুই এখানে বসে আছিস! আচ্ছা, তুকে কি কেউ কুন কাজ দেয় নাই?'

মেয়েটির মুখে এই কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ হেসে ফেললেন।

ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই গল্পটা শুনিয়ে বলতেন, 'দ্যাখো, সাঁওতাল মেয়েটার কী বুদ্ধি দ্যাখো! আমার স্বরূপটা ও ঠিক ধরে ফেলেছে!'

এ কথা শুনে সকলে হেসে উঠতেন।

পোকার উৎপাত

শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠার পর রবীন্দ্রনাথ নিজেই ছাত্রদের পড়াতেন। একদিন ইংরেজি ক্লাসে তিনি বিখ্যাত ইংরেজ কবি শেলীর কবিতা পড়াচ্ছেন। শান্তিনিকেতনে গাছের তলায় মনোরম পরিবেশে পড়াশোনা হয়। গুরুদেব বসেছেন মাঝখানে। তার চারপাশে ছাত্রদল। সেই সময় হঠাৎ কিছু পোকার উৎপাত শুরু হল। গুরুদেবের পরণে গা পর্যন্ত ঝোলা জোব্বা। তাঁর গায়ে পোকা কাটতে পারছে না। কিন্তু অল্পবয়স্ক ছাত্রদের গায়ে পোকা কামড়াতে লাগল। স্বভাবতই তারা পোকার জ্বালায় অস্থির! পড়ায় মন লাগছে না, শুধু তারা গা-হাত-পা চুলকাতে লাগল! রবীন্দ্রনাথ কিছুই বুঝতে পারেন না কেন ছাত্রদল ওরকম করছে! তিনি জানতে চাইলেন, 'কী হল? আজ তোমরা এত অস্থির কেন?'

ছাত্রদলের মধ্যে থেকে প্রমথনাথ বিশী উঠে বললেন, 'গুরুদেব, যদি অভয় দেন তো বলি, কেন আমরা অস্থির!'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, বলো বলো।'

তখন প্রমথনাথ বললেন, 'গুরুদেব, আপনি আমাদের শেলীর কবিতা পড়াচ্ছেন, কিন্তু এদিকে কীট্‌স আমাদের বড়ই বিরক্ত করছেন!'

রবীন্দ্রনাথ সব বুঝে হেসে ফেললেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ

একবার ক্ষিতিমোহন সেন সহ কয়েকজন ছাত্রকে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা পড়াচ্ছিলেন, সেদিনও পোকা-বিভ্রাট হয়েছিল!

ভাল পাত্র

রবীন্দ্রনাথ একবার মংপুতে গিয়ে মনমোহন সেনের বাড়িতে উঠেছেন। সেখানে তখন এসেছেন মনমোহনের স্ত্রী মৈত্রেয়ী দেবীর বোন চিত্রিতা দেবীও। একদিন কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের কাছে মৈত্রিয়ী দেবী জিগ্যেস করলেন, ' গুরুদেব, আপনার চেনাজানা কোনো ভাল পাত্র আছে? আসলে চিত্রিতার জন্য আমরা সুপাত্রের সন্ধান করছি।'

রসিক রবীন্দ্রনাথ উত্তরে বললেন,' হে সীমন্তিনী, আমার জানা একটিমাত্র পাত্র আছে। এবং অতি সৎ পাত্র বলেই আমার বিশ্বাস, কিন্তু সমস্যা হল তোমাদের ধারণায় তার বয়স একটু বেশিই হয়ে গেছে, কাজেই সে তো চলবে না।'

রবীন্দ্রনাথ যে রসিকতা করে নিজের সম্পর্কেই এ কথা বললেন সেটা বুঝতে পেরে হেসে ফেললেন মৈত্রেয়ী দেবী।

ইংলণ্ডে ইংরেজি

কবিগুরুর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ইংলণ্ডে গিয়ে কবিগুরুকে চিঠি লেখেন। আত্মীয়ের ইংলণ্ডে যাবার খবর শুনে একটু অবাক হলেন রবীন্দ্রনাথ। কারণ, আত্মীয়টির যা ইংরেজি বলার ধরণ! আত্মীয়টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিয়মিত পত্র বিনিময় হত। তাঁর ইংলণ্ডে যাবার খবর শুনে আত্মীয়টিকে মজা করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—'কী হে, বিলেতে তো সবার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে হয়। তোমার যা ইংরেজি বিদ্যে, তা ও দেশে তোমার কথা বলতে অসুবিধা হয় না ?'

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি পেয়ে মজা করে আত্মীয়টি প্রত্যুত্তরে লিখলেন—'আসলে আমি তো Fluently বলে যাই। সেক্ষেত্রে আমার কোনো সমস্যা হয় না। তবে হ্যাঁ—আমার কথা যাঁরা শুনছেন তাঁদের কোনো অসুবিধা হয় কি না আমি ঠিক বলতে পারব না।'

এই চিঠি পড়ে হাসলেন কবিগুরু। বুঝলেন, আত্মীয়টি তাঁর মতই এক রসিক মানুষ।

আহারে অভ্যাস বিরোধীতা

রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে খেতেন? তাঁর থালার পাশে বাটিতে করে বিভিন্ন পদ সাজিয়ে

দেওয়া হত। খেতে বসে তিনি এটা থেকে কিছুটা, ওটা থেকে কিছুটা তুলে খেতেন। না, কোনো প্রচলিত রীতি তিনি মানতেন না খাবার সময়। তাঁর এ এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট। তাঁর খাওয়া দেখে অনেকেই অবাক হতেন। বিশ্বভারতীর সেই সময়কার অধ্যাপক ও গ্রন্থসম্পাদক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত একদিন এই প্রথাগত রীতি বিরোধী খাবারের কথা তুলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সামনেই বলে বসলেন, 'গুরুদেব, আপনি কি জানেন, বিদ্যাসাগর মশায়েরও আহারের ব্যাপারে আপনার মত এইরকম অভ্যাস বিরোধিতা ছিল। তিনি আগে খেতেন দুধ, মিষ্টি, তারপরে খেতেন তেতো। এ কথা জেনেছি বিহারীলাল সরকারের বই পড়ে।'

রবীন্দ্রনাথ এ কথা শুনে রসিকতা করে বললেন, 'নন্দ, তুমি দেখছি প্রত্নতাত্ত্বিকদের পিসেমশাই। খুঁজে খুঁজে ঠিক বারও করেছে। এত তো জানতামই না। তুমি কোনদিন হয়তো আমার কথাও লিখে বসবে। তবে তাতে একটা সুবিধে হবে। কী সুবিধে জানো? লোকে বলবে—রবীন্দ্রনাথ আর বিদ্যাসাগরের অন্ততঃ একটি বিষয়ে মিল আছে আহারের সময় উভয়েরই বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেত।'

রবীন্দ্রনাথের এ কথা শুনে নন্দগোপাল হেসে উঠলেন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথের খাসভৃত্য এসে বলল, 'গুরুদেব, আসুন, খাবার বেড়েছি—।'

মাতৃদায়

সালটা উনিশশো পাঁচের কিছু আগে, রবীন্দ্রনাথ তখন রীতিমত ব্যস্ত বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে। লর্ড কার্জনের বঙ্গ ভঙ্গের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কবি তখন লিখছেন অনেক কবিতা, অনেক গান। দলবল নিয়ে যাচ্ছেন বিভিন্ন সভা সমিতিতে। রাখিবন্ধন উৎসব করছেন। সদলবলে গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন পথে পথে। ঠিক এই সময় রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়ের কন্যার বিবাহের নিমন্ত্রণ এল। মহারাজা রবীন্দ্রনাথকে বিবাহের দিন সকাল সকাল আসতে বলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কী করেন, চারদিকে সভা করে তিনি যখন বিয়েবাড়িতে পৌঁছলেন তখন সন্ধে হয়ে গেছে। অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন স্বয়ং মহারাজ।

রবীন্দ্রনাথকে আসতে দেখে তিনি বললেন, 'আসুন আসুন, আমার কন্যাদায়, আপনি কোথায় সকাল সকাল আসবেন, তা না এত দেরি করে এলেন!'

এ কথা শুনে কবি হাসলেন এবং বললেন, ' তা ঠিক, আমার আরো আগে আসা উচিত ছিল। কিন্তু কী করব বলুন মহারাজ, আপনার যেমন কন্যাদায়, আমারও তেমন মাতৃদায়. এই দেখুন না, এখানে আসার আগেই দুটো জায়গায় সভা করে এলুম ।'

একথা শুনে মহারাজা বললেন, ' তাই নাকি? হ্যাঁ, ওটারও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

চলুন, ভেতরে চলুন।'

পচা ডিম

একদিন শান্তিনিকেতনের পাশের গ্রামের এক গৃহকর্তা নিমন্ত্রণ করলেন রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ক্ষিতিমোহন সেনকে। দুই অতিথি খেতে বসেছেন। গৃহকর্তা খুঁটিনাটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখছেন, অতিথিদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। খাবার থালার পাশে সাজানো অনেক বাটি, তাতে বিভিন্ন পদের খাবার। তার মধ্যে একটিতে ছিল ডিমের কালিয়া। ডিমটি খেতে গিয়ে ক্ষিতিমোহন তাতে পচা গন্ধ পেলেন। তাই তিনি বাটিতে ডিমটি নামিয়ে রাখলেন এবং মনে ভাবলেন, গুরুদেব যা করবেন তিনিও তাই করবেন। এই ভেবে তিনি রবীন্দ্রনাথের দিকে আড়চোখে তাকালেন। তাকিয়ে কী দেখলেন ক্ষিতিমোহন? দেখলেন, রবীন্দ্রনাথ ঐ পচা ডিম পুরে দিলেন মুখে! এই দৃশ্য দেখে অবাক ক্ষিতিমোহন একপ্রকার বাধ্য হয়েই চোখ বুঝে পচা ডিমটা মুখে পুরে দিলেন। ডিমটা খাওয়ার পর থেকেই তাঁর শরীরটা কেমন করতে লাগল। ভোজনান্তে আশ্রমে ফেরার পথে ক্ষিতিমোহন গুরুদেবকে জিগ্যেস করলেন, ' এই পচা ডিম কী করে খেলেন, গুরুদেব? আমার তো খাওয়ার পরই বমি পেয়ে গিয়েছিল, এখনও গা গুলোচ্ছে!'

রবীন্দ্রনাথ এ কথা শুনে বললেন. ' ডিমটা তুমি খেয়েছ নাকি? আমি তো খাইনি।'

এ কথা শুনে ক্ষিতিমোহন জিগ্যেস করলেন, ' সে কী! আপনি খাননি? তবে যে দেখলাম , আপনি ডিমটা মুখে তুলছেন?'

এবার রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, ' তুমি কী ভাবছ, ওই ডিম আমি খেয়েছি? আসলে ডিমটা আমার দাড়ির ফাঁক দিয়ে একেবারে চাপকানের মধ্যে চালান করে দিয়েছি। এখন ওটাকে বের করতে পারলে বেঁচে যাই।'

গুরুদেবের মুখে এ কথা শুনে ক্ষিতিমোহন অবাক!

বাঁদর

শান্তিনিকেতনে অসুস্থ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তাঁর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। তখন দুপুর বেলা। রবীন্দ্রনাথ বিছানায় শুয়ে আছেন। পাশে একটি চেয়ারে বসে প্রতিমা দেবী। দুজনে নানারকম কথাবার্তা বলছেন। রবীন্দ্রনাথ কথা বলতে বলতে হঠাৎ প্রতিমা দেবীকে বললেন, 'বৌমা, বাঁদরটা বড্ড জ্বালাচ্ছে, ওটা বন্ধ করে দাও তো!' চারদিক তাকিয়ে দেখলেন প্রতিমা দেবী। কই, কোথাও বাঁদর চোখে পড়ল না। আর তাছাড়া কীভাবেই বা বাঁদরকে বন্ধ করবেন! কী করে বলবেন গুরুদেবকে এই

কথা? ভাবতে লাগলেন প্রতিমা দেবী। রবীন্দ্রনাথ আবার বললেন,' বৌমা, কী হল? দেখছ না, বাঁদরটা বড্ড জ্বালাচ্ছে!'

প্রতিমা দেবী এবার বললেন, কই, বাঁদর তো আমার চোখে পড়ছে না!'

রবীন্দ্রনাথ এবার হেসে বললেন, ' বাঁদর—মানে বাঁ-দোরটা বন্ধ করতে বলছি, দ্যাখো না, রোদ এসে বড্ড মুখে লাগছে যে!'

এ কথা শুনে প্রতিমা দেবী হেসে ফেললেন এবং বামদিকের দোরটা বন্ধ করে দিলেন।

চাপকান

রবীন্দ্রনাথ একবার মংপুতে গিয়ে বিখ্যাত লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে অতিথি হয়ে ছিলেন। কবি সেখানে সবাইকে সর্বক্ষণ মাতিয়ে রাখতেন। একদিন সবার সামনে গান গাওয়া শেষ করে হঠাৎ দু হাত দিয়ে নিজের দু'কান চেপে বললেন, ' বলো দেখি, এটা কী?'

সকলেই অবাক! কোথাও কিছু নেই। তবু গুরুদেব এ কথা জিগ্যেস করছেন কেন? মৈত্রেয়ী দেবী বললেন, ' কিছুই তো নেই, গুরুদেব, আপনি নিশ্চই হেঁয়ালি করছেন, তাই না?'

রবীন্দ্রনাথ এবার হেসে বললেন, 'উঁহু, হেঁয়ালি নয়, তবে এটাও ঠিক, জানতাম চট করে তোমরা বলতে পারবে না। একটু ভাবো , ভেবে বলো।'

কিন্তু কেউই বলতে পারলেন না। তখন রবীন্দ্রনাথ হা ঃ হাঃ করে হেসে বললেন, 'দেখছো না, এটা হচ্ছে চাপকান।'

এ কথা শুনে এবার সবাই হেসে উঠলেন।

ছবি আঁকা

শান্তিনিকেতনে একদিন সকালবেলায় রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকছেন। পাশে দাঁড়িয়ে শান্তিনিকেতনের পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মন দিয়ে ছবি আঁকা দেখছেন। আঁকা শেষ হতে বিধুশেখর রবীন্দ্রনাথকে জিগ্যেস করলেন, ' গুরুদেব, এত কাজকর্ম, লেখাপড়ার মাঝে আপনি কী ভাবে ছবি আঁকতে শিখলেন?'

রং-তুলি গোছাতে গোছাতে রবীন্দ্রনাথ মজা করে উত্তর দিলেন 'মা সরস্বতী প্রথমে আমাকে নিজের লেখনীটি দিয়েছিলেন একপ্রকার দয়া করেই। তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেল। তখন তিনি ভাবলেন, না কাজটা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, সম্পূর্ণ করতে হবে। তাই তিনি নিজের তুলিকাটিও আমাকে দান করে গেলেন। এই সেই তুলি।'—ব'লে

রবীন্দ্রনাথ একটি তুলি হাতে নিয়ে বিধুশেখরকে দেখালেন। বিধুশেখর তো রবীন্দ্রনাথের মুখে এই রকম কথা শুনে অবাক!

হাতি কেনা দেখে

রবীন্দ্রনাথ একবার বিখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও তাঁর স্ত্রী নির্মলকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে গেছেন। সেখানে গিয়ে একদিন তিনজন বেরিয়েছেন কেনাকাটা করতে। রবীন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ পর লক্ষ্য করলেন, নির্মলকুমারী বিভিন্ন দোকান থেকে নানা সাইজের আবলুশ কাঠের হাতি কিনছেন। মনে কৌতূহল জাগল রবীন্দ্রনাথের। নির্মলকুমারী এত হাতি কিনছে কেন! শেষমেষ রবীন্দ্রনাথ নির্মলকুমারীকে জিগ্যেস করে বসলেন, ' কী ব্যাপার, তুমি এত হাতি কিনছ কেন?'

গুরুদেবের এই প্রশ্নে লজ্জা পেয়ে গেলেন মিতভাষী নির্মলকুমারী। হাসতে হাসতে বললেন,' না মানে, উনি (অর্থাৎ বিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ) এই ধরণের হাতি খুব পছন্দ করেন, তাই—'

এ কথা শুনে রসিক রবীন্দ্রনাথ হেসে উঠে বললেন, 'তাই বলো, এতক্ষণে বুঝতে পারছি, প্রশান্ত কেন তোমাকে এত পছন্দ করে!'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নির্মলকুমারী ছিলেন স্থুলকায়া ও শ্যামা। গুরুদেবের মুখে এই কথা শুনে প্রশন্তচন্দ্র ও নির্মলকুমারী দুজনে না হেসে থাকতে পারলেন না।

মধুর কবিতা

মংপুতে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী' পত্রিকায় মধু বিষয়ক একটি কবিতা লিখেছিলেন। এই কবিতা প্রকাশের কিছুদিন পরে মংপুতে রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি পার্সেল আসে। কবি পার্সেল খুলে দেখেন তাতে এক বোতল মধু! পাঠিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের এক অচেনা ভক্ত। মধুর বোতল উপহার পেয়ে খুশি হয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেন, ' দ্যাখো , মধু নিয়ে কবিতা লিখেছি বলে মধু উপহার পেলাম।'

এক ঘর ভর্তি লোকের সামনে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ তখন মজা করে বলেন, 'বাবামশাই, আপনি যদি চাল, ডাল, তেল নিয়ে কবিতা লিখতেন তবে বেশ হত। ঘরে চাল, ডাল, তেল আসত। তাহলে সংসার খরচ কিছুটা কমত।'

রথীন্দ্রনাথের মুখে এ কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ সহ অন্যরা হোঃ হোঃ করে হেসে

ওঠেন। কথায় বলে— যেমন রসিক পিতা, তেমন রসিক পুত্র।

দুধ খাওয়া দুধ মাখা

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের খাসভৃত্য ছিল বনমালী। সে রবীন্দ্রনাথের দেখাশোনা করত। তার গায়ের রঙটি ছিল কুচকুচে কালো।

একবার কবিপত্নী মৃণালিণী দেবী এসেছেন শান্তিনিকেতনে। এসেই তিনি নিজের কাঁধে সংসারের সব দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন। কবির জন্য রান্না করা, কবিকে খেতে দেওয়া, ঘরদোর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে সাজানো—সব কাজ করতেন কবির ' ভাই ছুটি'। বনমালীকে আর বিশেষ কিছুই করতে হত না।

একদিন কবিগুরু বনমালীকে ডেকে জিগ্যেস করলেন, 'কী রে বনমালী, খাওয়া-দাওয়া কেমন চলছে?'

বনমালী উত্তর দিল,' আজ্ঞে, খাওয়া-দাওয়া ভালোই চলছে। দিদিমণি আমাকে কোনো কাজই করতে দেন না, উপরন্তু দুধ খাওয়াচ্ছেন।'

রবীন্দ্রনাথ এ কথা শুনে রসিকতা ক'রে বললেন, ' বটে! খুব দুধ খাওয়াচ্ছেন, তাই না? কিন্তু দুধ খাওয়াচ্ছেন কেন? দুধ মাখালেই তো পারতেন! তাহলে অন্তত তোর গায়ের রং একটু ফর্সা হতো। দুধ খেয়ে তো তোর গায়ের রঙের বেশি উন্নতি হচ্ছে বলে মনে হয় না।'

এ কথা শুনে বনমালী লজ্জা পেয়ে বলল, 'কী যে বলেন গুরুদেব!'

বিদেশের উপহার

সদ্য ইউরোপ ভ্রমণ সেরে শান্তিনিকেতনে ফিরেছেন রবীন্দ্রনাথ। দুপুরবেলা তিনি ঘুমোতেন না। বিশ্রাম নিচ্ছেন কোনার্কে। কবিকে নিরিবিলিতে পাবার আশায় শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রী গেলেন কোনার্কে। কবি বিধুশেখরকে দেখে খুশি হয়ে ইউরোপের গল্প শোনাতে লাগলেন। বললেন, কীভাবে বিদেশীরা তাঁকে আদর অভ্যর্থনা করেছেন। কবি বিধুশেখরকে বিদেশীদের দেওয়া বিভিন্ন উপহার দেখালেন। বিধুশেখর খুশি মনে সব কথা শুনলেন ও উপহার দেখলেন। রবীন্দ্রনাথ একটি উপহার নিয়ে বিধুশেখরকে বললেন, ' শাস্ত্রীমশাই, নিন, এটি আপনাকে দিলাম।'

বিধুশেখর বললেন, ' গুরুদেব, এ নিয়ে আমি কী করব? এ আমার কোনো কাজে লাগবে না।'

এ কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ মজা করে বললেন, ' জানতাম, আপনি নেবেন না।

সেইজন্যই তো আপনাকে দিতে চাইলাম। না হলে দিতাম না কি!'

কবির রসিকতায় হেসে ফেললেন বিধুশেখর।

দুগ্ধপোষ্য

গরমকালে শান্তিনিকেতন প্রচণ্ড গরম পড়ে। সেই কারণে অনেক শিক্ষক ও ছাত্র গরম সহ্য করতে না পেরে এই সময় বাড়ি চলে যান। ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ দুধ এই সময় বাড়তি পড়ে থাকে। কী করা যায়! খাবার ঘরের পরিচালক নিজে এসে একদিন এ কথা জানিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথকে। সব শুনে রবীন্দ্রনাথ ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, ' আচ্ছা, শাস্ত্রীমশাই তো শান্তিনিকেতনেই আছেন, তাই না? আর তিনি তো নিরামিষভোজী। তাঁকেই না হয় বেশি করে দুধ দিন।'

খাবার ঘরের পরিচালক রবীন্দ্রনাথের এই কথা শুনে চলে গেলেন। পরের দিন রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠি লিখে পত্রবাহকের হাত দিয়ে শাস্ত্রীমশাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। শাস্ত্রীমশাই চিঠি খুলে পড়লেন, তাতে লেখা—' শাস্ত্রীমশাই, এখন থেকে আপনার কাছে দৈনিক তিন-চার সের দুধ যাবে। আপনাকে দুগ্ধপোষ্য রাখব মনস্থ করেছি।'

এই পত্র পড়ে শাস্ত্রীমশাই মুচকি হাসলেন।

কমলের প্রতি রবির উক্তি

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে দেহলীর ওপর থাকতেন। নীচে থাকতেন তাঁর সম্পর্কে নাতি দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দীনুর স্ত্রী কমলা দেবী। একদিন আড্ডার আসরে রবীন্দ্রনাথ দীনু ঠাকুরকে বললেন,' দ্যাখ দীনু, তোর ঘরের কথা প্রকাশ করে হাটে হাঁড়ি ভাঙার কোনো প্রয়োজন আছে? কমলের সঙ্গে মানে নাত-বৌয়ের সঙ্গে আমার কী রকম আলাপটালাপ হয়, সেটা তো ঘরোয়া ব্যাপার। এই কথাকে কবিতা লিখে বই ছাপানো বড় অন্যায়। কেন তুই বন্ধুবান্ধবদের কাছে এ কথা বলতে গেলি?'

আড্ডার আসরে অনেকেই উপস্থিত। সকলের সামনে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে কথা বলায় দীনু ঠাকুর অপ্রস্তুতে পড়ে গিয়ে বললেন, 'আমি কিছুই করিনি, তাছাড়া কবিতাই বা কে লিখল জানিনা!'

রবীন্দ্রনাথ গম্ভীর হয়ে তখন একটা চটি বই বের করে দীনু ঠাকুরের হাতে দিয়ে বললেন, ' দ্যাখ দ্যাখ, এই প্রমাণ।'

দীনু ঠাকুর বইটি হাতে নিতেই সবাই বইয়ের দিকে ঝুঁকে দেখলেন বইটির প্রথম

কবিতার শিরোনাম 'কমলের প্রতি রবির উক্তি'।

এতক্ষণ দীনু ঠাকুর বুঝলেন, রবীন্দ্রনাথ রসিকতা করেছেন এবং বোঝা মাত্র দীনু ঠাকুর সহ অন্যরা হেসে উঠলেন।

চরণপদ্ম

রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁর পার্সোনাল সেক্রেটারি সুধাকান্ত রায় চৌধুরীকে নিয়ে রামগড় পাহাড়ে বেড়াতে গেছেন। একদিন সকালে সুধাকান্ত দেখলেন, গুরুদেব নীচে বসে এক পায়ের মোজা খুলে হাত দিয়ে পায়ের তলটা ঘষছেন। সুধাকান্ত জিগ্যেস করলেন, 'গুরুদেব, কী হয়েছে?'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'চরণপদ্ম নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছি, চরণ কমল, চরণপদ্ম, পাদপদ্ম এসব পদকীর্তনও শুনেছি অনেকবার। কিন্তু কেন যে পা-কে পদ্ম বলে, আজ সেটা ভাল করে বুঝতে পারলাম। অন্য লোকের পদ যে পদ্মই তা জানিনা, তবে আমার চরণ যে পদ্ম তাতে কোনো সন্দেহ রইল না। কারণ এত জায়গা থাকতে মৌমাছি মোজা ভেদ করে আমার পায়ের তলেই হুল বিঁধিয়ে দিল। এতেই বোঝা গেল আমার চরণ প্রকৃতই পদ্ম।'

একথা শুনে সুধাকান্ত হেসে ফেললেন।

বৈবাহিক

সে সময় শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারের দায়িতে ছিলেন রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি রাতে বাড়িতে গিয়ে পড়ার জন্য প্রতিদিন গ্রন্থাগার থেকে অনেকগুলো বই বোঝাই করে নিয়ে ফিরতেন।

এমনই এক সন্ধ্যায় তিনি বেশকয়েকটা পছন্দের বই সঙ্গে নিয়ে গ্রন্থাগার থেকে বাড়ি ফিরছেন। এমন সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন, ' ওহে বৈবাহিক, শুনে যাও দেখি একবার।'

রবীন্দ্রনাথের মুখে এই কথা শুনে অবাক প্রভাতকুমার! কেন গুরুদেব এমন বললেন!— এ কথা ভাবতে ভাবতে রবীন্দ্রনাথের সামনে এসে তিনি বললেন, ' গুরুদেব, আপনি আমাকে কেন বৈবাহিক বলছেন?'

রসিক রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, ' আরে, তুমি সেই বৈবাহিক নয়, তুমি বই বয়ে নিয়ে যাচ্ছো বলে আমি তোমাকে বই-বাহিক বলে ডাকছি। বুঝলে?'

এ কথা শুনে হেসে ফেললেন প্রভাতকুমার।

নিরামিষ না আমিষ

শান্তিনিকেতনে একবার একটি ছোট ছেলে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে জানতে চায়—'ডিম জিনিসটাকে কেন আমিষ বলা হয়? নিরামিষ বললে কী ক্ষতি?'

কবি উত্তরে মজা করে লিখলেন,' ঠিকই তো, কই ডিমের গায়ে আঁশ দেখেছি বলে তো মনে হয় না। কেমন সুন্দর দিব্যি গোলগাল—খাসা আলুর মত।'

রসিক রবীন্দ্রনাথের উত্তর পেয়ে ছোট ছেলেটি খুবই আনন্দ পায়।

তৃতীয় রসস্রষ্টা

একদিন সকালে সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বা বনফুল সস্ত্রীক দেখা করতে এসেছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। গুরুদেবের জন্য বনফুলের স্ত্রী ঘরের দুধ দিয়ে খানিকটা সন্দেশ করে নিয়ে এসেছেন। ঘরে প্রবেশ করেই বনফুলের স্ত্রী সন্দেশের কৌটোটা রবীন্দ্রনাথের হাতে দিতেই রবীন্দ্রনাথ একটা সন্দেশ মুখে পুরে বনফুলকে বললেন, 'বাহ! চমৎকার! এ সন্দেশ তুমি কেমন করে ভাগলপুরে পেলে?'

বনফুল তখন গৃহিনীকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার স্ত্রী করেছেন। আমাদের ঘরে গাই আছে। এই সন্দেশ তারই দুধ থেকে হয়েছে।'

ঘরে বসেছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিকে গোল গোল চোখে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে বললেন, 'এতো বড় চিন্তার কারণ হল দেখছি!'

সকলে একসঙ্গে জিগ্যেস করলেন, ' কেন গুরুদেব? কী হল?'

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'বাংলাদেশে দুটি মাত্র রসস্রষ্টা আছে জানতুম। প্রথম জন দ্বারিক আর দ্বিতীয়জন এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এ যে দেখছি তৃতীয় রসস্রষ্টার আবির্ভাব হল।'

গুরুদেবের কথা শুনে বনফুলের স্ত্রী লজ্জা পেলেন, বনফুল সহ অন্যরা হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন।

মশা মারার তেল

শান্তিনিকেতনে মশা কামড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে হাতে পায়ে একটা মশা মারার তেল মাখতেন। এমনই একদিন তিনি তেল মাখছেন। সেই সময় শান্তিনিকেতনের এক শিক্ষক তাঁকে তেল মাখতে দেখে জিগ্যেস করলেন, 'গুরুদেব, কী তেল মাখছেন?'

রসিক রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'অনেকেই ভাবে বুড়ো বয়সে আমার বাত হয়েছে,

তাই এই তেল মাখছি, তুমি যেন তাই ভেব না। আসলে আমাদের এই শান্তিনিকেতনের মশারা খুব নম্র তো, সব সময়েই পদসেবায় ব্যস্ত, তাই তাদের আপ্যায়নের জন্য এই আয়োজন।'

রবীন্দ্রনাথের এই কথা শুনে সেই শিক্ষক হেসে ফেললেন।

কবি কবিরাজ

শুধু কবিতা লেখাই নয়, রবীন্দ্রনাথ সময় সুযোগ পেলেই হোমিওপ্যাথি বায়োকেমিক চর্চা করতেন। অনেকেই তাঁকে বলতেন ক্ষুদে চিকিৎসক। তিনি নিয়মিত ডাক্তারি বই পড়তেন ও রোগীদের ওষুধ দিতেন। পাশাপাশি তিনি খাদ্যনীতির ওপর রীতিমত পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন এবং অন্যদের তা অনুসরণ করতে বলতেন। একবার তিনি নিজেই কিছুদিন সবুজ শাক সব্জি ও সেদ্ধ তরিতরকারি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই সময় তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা বন্ধ। কিন্তু মুখে হার মানেন না। কেউ তাঁকে কিছু বললেই তিনি হেসে বলতেন, ' না হে না, আমার এই নীতিকে কোনো ত্রুটি নেই। কেবল আমার স্বাস্থ্যই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তোমরা মনে রেখো আমি যেমন কবি, তেমন কবিরাজও।'

গুরুদেবের এ কথা শুনে তাঁর ঘনিষ্ঠরা না হেসে থাকতে পারতেন না।

বসন্তের টিকা

একবার বোলপুরে বসন্ত মহামারির আকার নেয়। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। আশ্রমের সকলেই বসন্তের টিকা নিচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথকেও বসন্তের টিকা দেবার ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ না-রাজ। কিছুতেই তিনি টিকা নেবেন না। কেউই তাঁকে বোঝাতে পারলেন না। শেষে এলেন স্বয়ং চিকিৎসক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে বোঝাতে গিয়ে চিকিৎসক নিজেই ঘাবড়ে গেলেন। চিকিৎসককে দেখেই রবীন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে বললেন, ' আরে ডাক্তার যে! তা আমার কাছে কেন এসেছ? যাদের ফিরে ফিরে বসন্ত আসে তাদের কাছে গিয়ে টিকা দাও, বুঝলে ডাক্তার, আমার অত বছরে বছরে বসন্ত আসে না!'

ডাক্তার আর কী করেন! রবি কবির কথা শুনে তিনি মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

চোখের জল

বৃদ্ধ বয়সে রবীন্দ্রনাথের একবার চোখের অসুখ হয়। ডাক্তার চোখ পরীক্ষা করে ওষুধ দেন। ড্রপার দিয়ে কবির চোখে সেই ওষুধ দিতেন রানী চন্দ। সেই ওষুধে কবির

চোখ জ্বালা করত। এর ফলে চোখ দিয়ে জল বেরোতো। রবি কবি একদিন রসিকতা করে রানী চন্দকে বলেন, 'ও আমার চক্ষুদাত্রী, তুমি একেবারে তৈরী হয়ে এসেছ দেখছি! মনে রেখো, ইতিহাসের পাতায় কিন্তু তুমি অমর হয়ে থাকবে।'

রানী চন্দ জিগ্যেস করেন,' কী ভাবে, গুরুদেব?'

রবীন্দ্রনাথ হেসে বলেন, ' যখন কেউ আমার জীবনী লিখবে, তখন তুমি দাবি করতে পারবে যে, শুধু একজনই দিনে তিন চারবার করে রবীন্দ্রনাথের চোখের জল ঝরাতে পেরেছে, সে তুমিই ! নয় কি?'

গুরুদেবের এই কথা শুনে রানী চন্দ হেসে ফেললেন।

গোলগোল অক্ষর

মংপুতে লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে একবার বেড়াতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছুদিন ছিলেন। একদিন রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেন, 'আচ্ছা মৈত্রেয়ী, একটা জিনিস আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করছি, তোমাদের প্রত্যেকের হাতের লেখা আশ্চর্যরকম এক! কেমন গোলগাল অক্ষর! এটা কী করে হলো?'

কবির কথা শুনে মৈত্রেয়ী দেবী হেসে বলেন, ' গুরুদেব, আর বলবেন না, সারা বাংলার হাতের লেখা এক হয়ে দঁড়িয়েছে শুধু মাত্র আপনার লেখা কপি করে।'

এ কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ গম্ভীর মুখে বলেন, ' সত্যি! তা হলে তো যথেষ্টই শঙ্কার কারণ দেখছি! ভাগ্যিস আমার ব্যাঙ্কের খাতা শূন্য, তা না হলে তো আমাকে রীতিমত ভাবনায় পড়তে হত হে!'

রবীন্দ্রনাথের মুখে এ কথা শুনে মৈত্রেয়ী দেবী হেসে ফেলেন।

গর্জন

সময় সুযোগ পেলেই রবীন্দ্রনাথ চেনা মানুষজনের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতা ঠাট্টা তামাসায় মেতে উঠতেন। কবি তাঁর খাসভৃত্য উমাচরণের সঙ্গেও রঙ্গ রসিকতা করতেন। উমাচরণের মৃত্যুর পর তার জায়গায় এল সাধুচরণ। সে কাজকর্মে যথেষ্টই পটু। তবে সে বড়ই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। মনিবের সঙ্গে সবসময় দূরত্ব রেখে চলে। কম কথা বলে। যেটুকু প্রশ্ন, শুধু তার উত্তর দেয়। হাসেই না বলা যায়। তবে নিজের কাজ করে যায় মন দিয়ে। তার কাজে কবি সন্তুষ্ট, কিন্তু তার গম্ভীর স্বভাব কবির পছন্দ নয়। সাধুচরণ সম্পর্কে কেউ কিছু জানতে চাইলে তাই কবি হেসে বলতেন, 'আমার নতুন ভৃত্য সাধুচরণ যা গম্ভীর ! মনে হয়, যেন আমার গার্জেন। ওর কথা শুনতে পাই

না, তবে গর্জন শুনতে পাই।'

তবে কিছুদিনের মধ্যেই কবি সাধুচরণকে নিজের মত করে নিয়েছিলেন।

বাক্যের আঘাত

শান্তিনিকেতনে একবার কবি জ্বরে আক্রান্ত । লেখালিখি বন্ধ। শুধুই বিশ্রাম। সেই সময় একদিন সকালে কয়েকজন বিহারী সাহিত্যিক এলেন কবির সঙ্গে দেখা করতে। ভৃত্যের মুখে তাঁদের আসার খবর শুনে কবি বললেন, 'কী করা যাবে, ওঁদের ডাকো, এতটা পথ এসেছেন, ফিরিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না।'

ভৃত্য তাঁদের নিয়ে এলেন কবির ঘরে। সেখানে কবির ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বসে। চার-পাঁচজন বিহারী সাহিত্যিক তাঁদের লেখা বই কবির হাতে তুলে দিলেন এবং জানতে চাইলেন কবির অভিমত। এরপর তাঁরা তাঁদের লেখা পাঠ করতে শুরু করলেন। কবি কী আর করেন, চুপ করে শুনতে লাগলেন। বিরক্ত হয়ে উঠলেন কবির ঘনিষ্ঠ লোকেরা। একজন শেষমেষ বাধ্য হয়ে বলেই বসলেন, 'আপনারা থামুন, কবির জ্বর হয়েছে।'

কে কার কথা শোনে! বিহারী সাহিত্যিকরা এক একজন করে রচনা পাঠ করেই চললেন। তাঁদের থামানো দায়। এই ভাবে চলল দীর্ঘক্ষণ। অনেক পরে তাঁরা থামলেন এবং কবিকে প্রণাম করে চলে গেলেন। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা থেকে রেহাই পেয়ে রবীন্দ্রনাথ হেসে তাঁর ঘনিষ্ঠদের বললেন, ' বুঝলে, প্রায় জখম হবার দাখিল! তোমরা কখনো দেখছ বাক্যের আঘাতে দেহ ক্লিষ্ট হতে? আজ আমার তাই হল! '

কবির এ কথা শুনে তাঁর ঘনিষ্ঠলোকেরা হেসে ফেললেন এবং কবিকে বিশ্রাম দেবার জন্য সকলে ঘর থেকে প্রস্থান করলেন।

কালা সাহেব

রবীন্দ্রনাথ একদিন বোলপুর থেকে ট্রেনে চেপে চলেছেন। জানলার ধারে বসে সুন্দর প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে করতে চলেছেন। বর্ধমানে ট্রেন থামতে কবির কামরায় উঠলেন এক কালা সাহেব। তাঁর মুখে সিগারেট। সঙ্গে অজস্র মালপত্র। কালা সাহেব ইচ্ছা করলেই কবির পাশের কামরাতে উঠতে পারতেন। কিন্তু তিনি কবির রিজার্ভ করা কামরাতেই উঠলেন। তাঁর উদ্ধত ভঙ্গি কবির পছন্দ হল না। ভ্রমণের সময় কবি সঙ্গ বাহুল্য মোটেও পছন্দ করতেন না। তাই সাহেবকে দেখেই বিরক্ত হয়ে কবি

বললেন, 'আপনি কে মশাই?'

কালা সাহেব সিগারেট টানতে টানতে বললেন, ' কেন মশাই? আমি মানুষ!' রবীন্দ্রনাথ এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাই নাকি? যাক আমার সন্দেহভঞ্জন হল।'

কবির কথার অর্থ বুঝলেন না কালা সাহেব। তিনি নিজের মালপত্র গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

মেঘমুক্ত দিগন্ত

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী বা বলডুইন-এর মাথার টাক বাড়তে দেখে একদিন রবীন্দ্রনাথ বললেন, ' ও সুধাকান্ত, তোর শিরোদেশ যে ক্রমেই মেঘমুক্ত দিগন্তের আকার ধারণ করছে। খুব সাবধান!'

এ কথা শুনে সুধাকান্ত বললেন, 'গুরুদেব, আমার বাবারও শেষ জীবনে ও রকম হয়েছিল!'

এবার রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, ' তাইতেই বুঝি ওটা শিরোধার্য করেছিস?'

এ কথা শুনে সুধাকান্ত নিজের টাকে হাত বুলিয়ে হেসে ফেললেন।

চাঁদ ঢাকা

শান্তিনিকেতনে একদিন রাতে রবীন্দ্রনাথ জানলার পাল্লা খোলা রেখে শুয়ে আছেন। পূর্ণিমার রাত, জ্যোৎস্না এসে পড়েছে কবির মুখে। চোখে আলো পড়ায় ঘুম আসছে না বলে কবি ভৃত্য মহাদেবকে ডেকে বললেন, 'ওরে আমার ঘুম হচ্ছে না, চাঁদটা ঢেকে দে তো!'

কী ভাবে চাঁদ ঢাকা হবে তা কিছুতেই ভেবে না পেয়ে বোকার মত মাথা চুলকোতে লাগল মহাদেব। কবি বললেন ' কীরে , চাঁদটা ঢেকে দিবি তো! দেরী করছিস কেন?'

এবার মহাদেব আমতা আমতা করে বলল,' গুরুদেব, কী ভাবে চাঁদ ঢাকতে হয় জানি না তো!'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'সে কী রে! চাঁদ ঢাকতে পারছিস না?'

মহাদেব আবার বলল, ' না!'

এবার রবীন্দ্রনাথ হেসে ফেলে বললেন, 'বোকা কোথাকার! ওই দিকের জানলাটা বন্ধ কর দেখি।'

কবির কথায় মহাদেব জানলা বন্ধ করতেই ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথ তখন বললেন, ' কী রে, এবার চাঁদ ঢাকা পড়ল তো?'

মহাদেব হেসে বলল, 'হ্যাঁ, গুরুদেব!'

সেনগুপ্ত দাশগুপ্ত

একদিন রানী চন্দ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ট্রেনে চেপে চলেছেন। ট্রেনের দুলুনিতে রানী চন্দের দু'চোখে লেগে যায়। কিছুক্ষণ পর উঠে দেখলেন রবীন্দ্রনাথ নিজের মনে কী সব বিড় বিড় করছেন। শোনার জন্য রানী চন্দ নিজের কানটা নিয়ে গেলেন কবির মুখের কাছে। তিনি শুনলেন কবি বলছেন, ' সেনগুপ্ত..........দাশগুপ্ত......... সেনগুপ্ত..........দাশগুপ্ত!'

অবাক হয়ে রানী চন্দ জিগ্যেস করলেন, 'গুরুদেব, আপনি এ কী বলছেন?'

কবি হেসে উত্তর দিলেন,' শুনতে পাচ্ছিস না? ওই দ্যাখ, ট্রেনের চাকায় শব্দ হচ্ছে...... সেনগুপ্ত.......দাশগুপ্ত............ সেনগুপ্ত.......দাশগুপ্ত.......।'

কবির কথা শুনে রানী চন্দও মন দিয়ে ট্রেনের চাকার শব্দ শুনতে লাগলেন।

কান্না হাসি

রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে অস্ত্রোপচারের পর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। সেই সময় অনেকেই কবির সেবায় নিযুক্ত হন। তাঁদের মধ্যে একজন নির্মল কুমারী। একদিন সকালে নির্মলকুমারী গম্ভীর মুখে কবির কাছে এসে দাঁড়ালেন। কবি তখন ঘুমোচ্ছিলেন। ঘুম ভেঙে নির্মলকুমারীকে গম্ভীর মুখে থাকতে দেখে কবি এমন গোল গোল বড় বড় চোখ করলেন যে নির্মলকুমারী না হেসে পারলেন না। তাঁর হাসি দেখে কবি বললেন,' হ্যাঁ, সবসময় এই রকম হাসি মুখে থাকবে। একদম গম্ভীর মুখ করে থাকবে না।'

নিজের কষ্ট যতই হোক, অন্যেরা তাঁর কষ্ট দেখে কষ্ট পাক— এটা কবি চাইতেন না। তাই নিজের কষ্ট চেপে কবি অন্যকে হাসাচ্ছেন দেখে নির্মলকুমারীর দু'চোখ জলে ভরে ওঠে।

নির্মলকুমারীর চোখে জল দেখে কবি বললেন, ' না না, কান্না নয়, আমি হাসি দেখতে ভালবাসি।'

প্রাণ ও টাকা

একবার নির্মলকুমারী ট্রেনে চেপে বোলপুরে আসছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। ভিড় ট্রেনে ওঠার সময় হঠাৎই তাঁর পা ফসকে যায়! প্রায় ট্রেনের নীচে তিনি পড়ে যাচ্ছিলেন! এক সহযাত্রী কোনো রকমে তাঁকে বাঁচান!

নির্মলকুমারী শান্তিনিকেতনে এসে ভয়ে ভয়ে রবীন্দ্রনাথকে পুরো ঘটনাটা শুনিয়ে

বলেন, ' গুরুদেব, আপনার কাছে আসতে গিয়ে প্রাণটাই দিয়ে ফেলেছিলুম আর একটু হলে!'

এই কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ' সে কী! তুমি তার চেয়ে আমার জন্য কিছু টাকা দিলেই ভাল করতে!'

নির্মলকুমারী কবির কথা কিছুই না বুঝতে পেরে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন দেখে কবি হেসে বলেন, ' তুমি সেই গল্পটা বুঝি জাননা? সেই যে, একজন আর একজনকে বোঝাচ্ছে, একে বলে টাকা—বুঝেছ? এ তো আর প্রাণ নয় যে দিলেই হল! এ হচ্ছে টাকা!'

গুরুদেবের কথা শুনে এবার নির্মলকুমারী হেসে ফেললেন।

ভূতে বিশ্বাস

শান্তিনিকেতনের এক ভদ্রলোক একদিন রবীন্দ্রনাথকে জিগ্যেস করেন, ' গুরুদেব, আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন?'

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ' আমি তো বিশ্বাস করিই, স্বচক্ষে দেখেওছি। মাঝে মধ্যে তার দৌরাত্ম্য টের পাই। ভূতেরা সাহিত্যে, রাজনীতিতে এবং এক সময় তুমুল দাপাদাপি জুড়ে দেয়। ওরা দেখতে শুনতে ঠিক মানুষের মত।'

রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে ভদ্রলোক হেসে ফেলেন ও বোঝেন রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রতিক সময়ের কিছু মানুষের প্রতি আচ্ছা খোঁচা দিলেন বটে!

বিশেষ পদ

শান্তিনিকেতনে এসেছেন এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন খাওয়ার জন্য। কবি এবং ঐ ব্যক্তি উভয়েই পাশাপাশি বসেছেন মধ্যাহ্নভোজনে। কবির ভৃত্য দুজনকেই একই খাবার খেতে দিয়েছে। অবশ্য কবি কম খান, কিন্তু অতিথি ভদ্রলোকের খাবার পরিমান কিছু বেশি। অতিথি ভদ্রলোক খেতে খেতে দেখলেন কবিকে একটি পদ বেশি দেওয়া হয়েছে! ভদ্রলোক সেই পদটির দিকে বারবার তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। মনে মনে ভাবলেন, কবি কেন একটি পদ বেশি খাচ্ছেন! কী পদ ওটি? নিশ্চই কোনো সুস্বাদু পদ! ইস্, আমি বঞ্চিত হচ্ছি ওই বিশেষ পদটি থেকে!

কবি বুঝতে পারলেন ভদ্রলোকের মনের কথা। ভদ্রলোকটি যেভাবে বারবার ঐ পদটির দিকে তাকাচ্ছেন তাতে যে কোনও মানুষেরই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। কবি তখন তাঁর ভৃত্যকে ডেকে গম্ভীর ভাবে বললেন, 'আমি এসব পক্ষপাতিত্ব একদম পছন্দ করি না। যেহেতু আমি তোদের গুরুদেব, সেইজন্য টপ্ করে কিনা এই একটা পদ

আমাকে বেশি দিয়ে দিলি। এই পদটা নিয়ে এসে ঐ বাবুকেও দে!'

ভৃত্য বাটিভর্তি সেই বিশেষ পদ ভদ্রলোকটির খাবার থালার পাশে এনে রাখল। পদটি হাতে তুলে মুখে দিতেই ভদ্রলোক মুখ বেঁকিয়ে উঠলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন হেসে বললেন, ' কেমন লাগল পদটা ? ওটা আরকিছু নয়, নিমপাতা বাটা, খান, খান—।'

ভদ্রলোকটি তখন হেসে ফেললেন এবং মনে মনে ভাবলেন, এই পদটির জন্য আমার মনে লালসা জেগেছিল, ইস্!

পান মার্গে অগ্রগতি

রবীন্দ্রনাথের ভক্তরা তাঁকে নিয়মিত ফল পাঠাতেন। যেমন অতুলপ্রসাদ লক্ষ্ণৌ থেকে আম পাঠাতেন, দার্জিলিং-এর এক মহিলা ভক্ত পাঠাতেন কমলালেবু। কলকাতার ভক্তরাও অনেকে নানা রকম ফল পাঠাতেন। কবি প্রাতরাশের পর এক গ্লাস এই ফলের সরবত খেতেন। সেই সময় যাঁরা উপস্থিত থাকতেন তাঁরা এক গ্লাস ফলের সরবত থেকে বঞ্চিত হতেন না।

'অগ্রগতি' পত্রিকার সম্পাদক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত একদিন কবির কাছ থেকে লেখা নিতে এসেছেন। সেটা কবির সরবত খাওয়ার সময়। ভৃত্য কবির সঙ্গে নন্দগোপালের জন্যও এক গ্লাস সরবত নিয়ে এল। কিন্তু সরবত মুখে দিয়েই নন্দগোপাল নাক কুঁচকে উঠলেন। সরবতের স্বাদ তাঁর ভাল লাগছিল না। কিন্তু মুখ ফুটে তা কবিকে বলতেও পারছেন না। কিন্তু কবি ঠিকই বুঝে গেলেন এর কারণ। আসলে কবি সেদিন টমেটোর সরবত খাচ্ছিলেন। কবি তখন হেসে বললেন,' কী নন্দগোপাল, সরবত ভাল লাগছে না ? এ যে অতি উৎকৃষ্ট পানীয় হে। তাহলে তো দেখছি, এই পান মার্গে তোমার অগ্রগতির বেশি আশা নেই।'

এ কথা শুনে নন্দগোপাল হাসলেন ও গ্লাসভর্তি সরবত এক দমে পান করে নিলেন। 'অগ্রগতি' পত্রিকার সম্পাদক বলেই কবিগুরু তাঁর সঙ্গে এরকম রসিকতা করলেন।

ম্যাগ ক্যাক

রবীন্দ্রনাথের চাপে পড়ে একবার অনিলকুমার চন্দকে 'তাসের দেশ' নাটকে অভিনয় করতে হয়। নাটকে অনিলকুমারের খুব কম সংলাপ। রুইতনের চরিত্র। এক প্রকার বাধ্য হয়েই নাটকে অনিলকুমারকে অভিনয় করতে হয়। তাঁর ইচ্ছা ছিল না। কারণ তিনি কথা বললে সিলেটি টান এসে যায়। কী রকম ? তিনি মেঘকে ম্যাগ বলেন। কিন্তু নাটকে তো এরকম উচ্চারণ চলবে না। তাই রবীন্দ্রনাথ 'মেঘ' শব্দের পরিবর্তে

'কুয়াশা' বসালেন। এতে অনিলকুমারের সুবিধা হল।

একদিন 'তাসের দেশ' নাটকের রিহার্সাল চলছে। এমন সময় রবীন্দ্রনাথের খাস ভৃত্য বনমালী কেক নিয়ে এল সকলের জন্যে। বলল, ' এক দিদিমণি ক্যাক করে পাঠিয়েছেন।'

এরপর সে রবীন্দ্রনাথকে বলল, 'গুরুদেব, আগে আপনি একটু ক্যাক খান।'

বনমালীর কথা শুনে কবিগুরু হেসে বললেন, ' ওরে ওটা খেয়ে আমার কাজ নেই, শোন, যারা মেঘকে ম্যাগ বলে তাদের ক্যাক খাওয়া গে!'

এই ব'লে রবীন্দ্রনাথ অনিলকুমারের দিকে এগিয়ে দিলেন কেকের থালা।

তবে একা অনিলকুমার নন, রিহার্সাল শেষে সবাই মিলে কেকটা ভাগ করে খেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের চাপে পড়ে নাটকে অভিনয় করে অনিলকুমার শেষ পর্যন্ত সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন।

বনমালীর উচ্চারণ

রবীন্দ্রনাথের খাসভৃত্য বনমালীর ভাষার সমস্যা ছিল। সে যেমন কেককে ক্যাক বলত, তেমন লম্বাকে বলত নাম্বা। কবি অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই বনমালীকে দিয়ে সঠিক উচ্চারণ করাতে পারেন না। কবি তখন মংপুতে। ঘরে বসে কবিতা লিখছিলেন। এমন সময় মৈত্রেয়ী দেবীর প্রবেশ। মৈত্রেয়ী দেবীকে দেখেই কবি লেখা থামিয়ে হেসে বললেন, ' কী ব্যাপার? আজ সমস্ত দিন যে দর্শন নেই, ছিলে কোথায়? লিশ্চই একটা চৌকিতে নাম্বা হয়ে শুয়ে বালিশের ওপর চুল ফেলে দিয়ে প্রবাসী পড়তে পড়তে লিদ্রা দিচ্ছিলে?'

মৈত্রেয়ী দেবী কবির মুখে বনমালীর মত উচ্চারণ শুনে রীতিমত অবাক! বললেন, 'এ কী, গুরুদেব, আপনি বনমালীর মত কথা বলছেন যে—!'

কবি হেসে বললেন, ' কী আর করব বল, আমি ঠিক করেছি এবার থেকে বনমালীর মত নাম্বা বলব। কতদিন থেকে আমি ওকে বোঝাচ্ছি—ওরে নাম্বা নয়, লম্বা বল, কিন্তু কে কার কথা শোনে! ও যখন শুনবে না তখন আমাকেই মেনে নিতে হবে ওর ভাষাটা! ঠিক করিনি?'

রবিকবির কথা শুনে কিছু বলতে যাবেন মৈত্রেয়ী দেবী, এমন সময় ঘরে ঢুকে বনমালী বলল, ' গুরুদেব, নাম্বা নাম্বা বেগুন এনেছি, বেগুনি ভেজে দেব, খাবেন?' রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীকে বললেন, 'শুনলে কথা?'— বলেই কবি ও মৈত্রেয়ী দেবী হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন। কিছু না বুঝে হাঁ করে তাকিয়ে রইল বনমালী।

বৃদ্ধ সেতু

রবীন্দ্রনাথ কালিম্পং-এ লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন গায়ক দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে। দিলীপকে কবি বলেন, ' ও দিলীপ, শোনো, এই হচ্ছে সেই মৈত্রেয়ী, যে তোমার গান শুনতে চায়।'

এরপর কবি মৈত্রেয়ীকে বলেন, 'ও মৈয়েত্রী, এই হচ্ছে সেই দিলীপ, যে বান্ধবী বৎসল!'

এরপর কবি দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'মনে রেখো, তোমাদের আলাপের সেতু হলাম আমি। দেখো, সেতুটি কিন্তু বৃদ্ধ, বেশি দলন সহ্য করতে পারবে না, তাই আলাপ করতে গিয়ে একটু রয়ে সরে সয়ে এগিও, বুঝলে?'

কবির এই কথা শুনে দিলীপ ও মৈত্রেয়ী দুজনেই হেসে ফেললেন।

চ-কর

একদিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথের চা তেষ্টা পেয়েছে। কবি তাঁর খাসভৃত্য বনমালিকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি চা করে আন দেখি।'

কিন্তু বনমালীর বড্ড দেরী দেখে তিনি কপট বিরক্ত প্রকাশ করে বললেন, 'চা-কর, কিন্তু সু-কর নয়।'

এর কিছুক্ষণ পর বনমালী চা তৈরী করে নিয়ে এলে কবি কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করে বলেন, 'বনমালী , তুই বোধহয় জানিস না যে তোর অতুলনীয় কর্ম্মণ্যতায় আমি খুব বেশি পুলকিত হইনি?'

বনমালী গুরুদেবের কথার কিছুই বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে টেবিলের ওপর চা রেখে জিগ্যেস করে, ' রাতে কী খাবেন বাবামশাই?'

বনমালী কখনো রবীন্দ্রনাথকে 'বাবামশাই' বলত, আবার কখনো বলত 'গুরুদেব'।

অস্থির মতি

একদিন বিকেলে রবীন্দ্রনাথ কয়েকজন পরিচিত মানুষজনের সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন। এমন সময় সেখানে এলেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ। রথীন্দ্রনাথকে দেখে রবীন্দ্রনাথ বললেন, ' ও,তুই এসেছিস, ভাল কথা, কাল বিকেলে মাদ্রাজ যেতে হবে আমাকে, তুইও সঙ্গে যাবি। যা টিকিট কেটে আন।'

কথামত রথীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ পরে টিকিট কেটে এনে বললেন, 'বাবামশাই, এই নিন

টিকিট।'

পুত্র টিকিট কেটে এনেছে দেখে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ বলে বসলেন, ' না রে, ভাবছি কাল আর মাদ্রাজ যাব না। তুই টিকিট ফেরত দিয়ে আয়।'

বাবামশাই-এর কথা শুনে রথীন্দ্রনাথ টিকিট ফেরত দিতে যেই না হন্তদন্ত হয়ে চললেন, অমনি আর একজনকে রবীন্দ্রনাথ পাঠালেন তাঁকে ফিরিয়ে আনতে! রথীন্দ্রনাথ ফিরে এসে জিগ্যেস করলেন, 'বাবামশাই, কী হল, ডাকলেন কেন?'

এবার রবীন্দ্রনাথ বললেন, ' না রে রথী, ভাবছি কাল বিকেলে মাদ্রাজেই যাবো, টিকিট ফেরত দিয়ে লাভ নেই!'

রবীন্দ্রনাথের এই আচরণে পুত্র রথীন্দ্রনাথ মোটেও অবাক হলেন না। কিন্তু বাকিরা স্বভাতই হতভম্ব! তাঁরা ভাবলেন, কবি এত অস্থির মতি কেন!

রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁদের হাসতে হাসতে বললেন, 'কী হে, আমাকে অস্থিরমতি মনে হচ্ছে, তাই না? মনে রেখো আমি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাতি। বাবু চেঞ্জেস হিজ মাইণ্ড।'

কবির মুখে এ কথা শুনে রথীন্দ্রনাথ সহ বাকিরা হেসে উঠলেন।

মণিবাবার মাহাত্ম্য

লেখালিখির ফাঁকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর খাস ভৃত্য বনমালীর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গল্পগুজব করতেন। কবি মাঝে মাঝেই রঙ্গ রসিকতায় মেতে উঠতেন খাস ভৃত্যের সঙ্গে। একদিন সন্ধেবেলায় কবি গল্প করছিলেন অনিল চন্দের সঙ্গে। কাছেই দাঁড়িয়েছিল বনমালী। কথা প্রসঙ্গে সাপের কথা উঠতেই বনমালী বলল, 'জানেন বাবামশাই, আমাদের গ্রামে একজন আছে—তার নাম মণিবাবা—' এই বলে বনমালী মণিবাবার মাহাত্ম্য শুরু করল, 'মণিবাবার এত মাহাত্ম্য, যদি কাউকে বিষধর সাপ কাটে তো তার সামনে তিনবার মণিবাবা, মণিবাবা, মণিবাবা বললেই সে উঠে বসবে, বিষ অমনিই নেমে যাবে। আমাদের গাঁয়ে তাই সবাই মণিবাবাকে খুব মানে।'

এ কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'বটে?'

বনমালী বললেন, 'হ্যাঁ, মণিবাবার নামের এত গুণ!'

এবার রবীন্দ্রনাথ অনিল চন্দকে বললেন, 'অনিল, যা তো যেখান থেকে পারিস একটা বিষধর কেউটে সাপ জোগাড় করে আন। এনে সাপটাকে দিয়ে বনমালীকে কাটা। তারপর তিনবার, থুড়ি তিনশোবার মণিবাবার নাম উচ্চারণ কর, দেখি বনমালী কেমন করে উঠে দাঁড়ায়!'

কবির কথা শুনে অনিল চন্দ হেসে ফেললেন। তা দেখে বনমালী লজ্জা পেয়ে সঙ্গে

সঙ্গে মাথা চুলকোতে চুলকোতে সেখান থেকে চলে গেল। মনিব রবীন্দ্রনাথ ভৃত্য বনমালীকে বিশেষ স্নেহ করতেন। বনমালী ছিল সহজ সরল মাটির মানুষ। ঘরের কাজকর্মে সে ছিল দক্ষ।

চক্ষু লজ্জা

বলডুইন বা সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের নিত্যসঙ্গী। একবার সুধাকান্ত নতুন চশমা পরে কবির কাছে আসেন। কবি তাঁর দিকে এমনভাবে তাকালেন, যেন একজন অপরিচিত মানুষ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে! তারপর কবি মজা করে সুধাকান্তকে জিগ্যেস করলেন, ' ওহে সুধাকান্ত, কে তোমার চক্ষু পরীক্ষা করেছেন? আর কেই বা তোমার চোখে চশমা দিয়েছেন?'

সুধাকান্ত উত্তর দিলেন, 'কেন, ডাক্তারবাবু চক্ষু পরীক্ষা করে চশমা দিয়েছেন!'

কবি এবার বললেন, 'আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাব, যাঁরা তোমার চোখে চশমা দিয়েছেন।'

সুধাকান্ত জিগ্যেস করলেন, 'কেন?'

রবীন্দ্রনাথ এবার হেসে উত্তর দিলেন, 'সুধাকান্ত, তোমার তো চক্ষুলজ্জার বালাই নেই, তবু ওঁরা তোমার চোখে পর্দা দিয়েছেন।'

কবির এ কথা শুনে সুধাকান্ত হেসে ফেললেন।

মায়া-দয়া

রবীন্দ্রনাথের বেশিরভাগ গানের সুরকার দীনেন্দ্রনাথ যখন খুব ছোট, তখন কবি নতুন লেখা গানে সুর সংযোজন নিজেই করতেন এবং সুর সংযোজন করেই ডাকতেন স্নেহের ভাইপো বিখ্যাত চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ সুর সংযোজন করেই ভুলে যেতেন। তাই অবনীন্দ্রনাথের ওপর সুর মনে রাখার দায়িত্ব পড়ত। অবনীন্দ্রনাথ কবির সঙ্গে এসরাজ সঙ্গত করতেন। শুধু অবনীন্দ্রেনাথ নন, কবি যাঁকেই প্রথম নতুন গান তোলাতেন, তাঁকেই গানের সুরটা মনে রাখতে হতো। একদিন রবীন্দ্রনাথকে অবনীন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি তো তোমার গান ভাল গাইতে পারি না, আর তাছাড়া তোমার সুর আমার গলায় আসে না। কিন্তু তোমার লেখা গান যদি আমার সুরে গাই, তোমার আপত্তি আছে?'

অবন ঠাকুরের কথা শুনে কিছুক্ষণ ভেবে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'না না,তাতে আমার আপত্তি নেই। তবে যে গানগুলোয় আমি লিখে সুর দিয়েছিলাম, সেগুলোর ওপর আমার মমতা আছে, যদি সেগুলো নেহাত গাইতে ইচ্ছে করে একটু মায়া-দয়া রেখে

গেয়ো।'

রবি কাকার কথা শুনে হেসে ফেললেন অবনীন্দ্রনাথ।

অসাধারণ মানুষ

রবীন্দ্রনাথ কখনো আগে গান লিখতেন, পবে সুর করতেন, আবার কখনো গান ও সুর এক সঙ্গে রচনা করতেন। কিন্তু সমস্যা একটাই—কবি কিছুতেই সুর মনে রাখতে পারতেন না। তাই তৈরী হওয়া সেই নতুন গান কাউকে শেখানোর জন্য তিনি চিৎকারে বাড়ি মাথায় করতেন। কাউকে শেখানো মানে, তার ওপর সুর মনে রাখার দায়িত্ব পড়ে যেত। একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একটি নতুন গানে সুর বসিয়ে কবি বারান্দায় পায়চারি করতে করতে চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন, 'অমলা, অমলা, গানটা শিগগির এসে শিখে নাও, নাহলে এক্ষুনি ভুলে যাব।'

কবির ডাক শুনে অমলা ছুটে আসেন এবং গানটা শিখে নেন। অমলা দাস ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বোন। কবিপত্নী মৃণালিণী দেবী কবির চেঁচামেচি শুনে কাজ ফেলে ছুটে আসেন ও কবির রকম সকম দেখে হাসতে হাসতে বলেন, 'ও অমলা, এমন মানুষ কখনো দেখছ, যে নিজের দেওয়া সুর ভুলে যায়?'

এ কথা শুনে অমলাও হাসেন। তাই দেখে রবীন্দ্রনাথ মৃণালিণী দেবীকে রসিকতা করে বলেন, 'ছোটবউ, অসাধারণ মানুষের সব কিছুই অসাধারণ হয়, বুঝলে? তুমি তো আর আমাকে চিনলে না!'

কবির কথা শুনে মৃণালিণী দেবী আরও হাসতে হাসতে বলেন, 'তাই নাকি?'

জল সিঞ্চিত ক্ষিতি

কবির অন্তরঙ্গ সুহৃদ আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। একদিন প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভিজে ক্ষিতিমোহন এলেন তাঁর প্রিয় কবিবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। আপাদমস্তক বৃষ্টিতে ভেজা ক্ষিতিমোহনকে দেখে রবীন্দ্রনাথ রসিকতা করে বলেন—

"ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে।
জল সিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে।"

কবিগুরুর রসিকতায় হেসে ফেললেন বন্ধু ক্ষিতিমোহন। রবীন্দ্রনাথ সময় সুযোগ পেলেই ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতায় মেতে উঠতেন। কবির রসিকতা রীতিমত উপভোগ করতেন ক্ষিতিমোহনও।

পুত্রবধু

রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই বিদেশভ্রমণে যেতেন। কখনো একা, কখনো কাউকে সঙ্গে নিয়ে নিতেন। কবির পুত্রবধু প্রতিমা দেবী বেশ কয়েকবার কবির সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। প্রতিমা দেবীকে কবি বিশেষ স্নেহ করতেন। কবি প্রতিমা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন শহরে ঘুরেছেন। কোনো কোনো সময় পুত্র রথীন্দ্রনাথও সঙ্গে থাকতেন। একবার কবি ভারতবর্ষের একটি শহরে নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে চলেছেন ট্রেনে। কবি একটি কামরায় জানলার ধারে বসে মনোরম প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে চলেছেন। পাশের কামরায় আছেন প্রতিমা দেবী সহ আরো কয়েকজন। কিন্তু কথায় আছে খ্যাতির বিড়ম্বনা। কোন স্টেশনে ট্রেন থামা মাত্রই ভক্তের দল কবিকে ফুলের মালায় ভরিয়ে দেন। কবি বারণ করতে পারেন না। মুচকি হাসেন ও ভক্তদের ভালবাসা মেনে নেন। কিন্তু কতক্ষণ এ রকম চলতে পারে? শেষমেষ কবি ভক্তদলের ভালবাসায় ক্লান্ত হয়ে একটা উপায় বের করলেন। কী উপায়? গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছতে তাঁর ভক্তরা যেই না ফুল মালা নিয়ে ছুটে আসেন, কবি তাঁদের বলেন, 'আরে আপনারা করেন কী! আমি তো ফুলের মালায় ঢাকা পড়েই গেছি, পাশের কামরায় আমার ব্রাইড মাদার রয়েছেন, যান, তাঁকে গিয়ে নামান ও অভ্যর্থনা জানান।'

কবির কথা শুনে সবাই অবাক , কে এই ব্রাইড মাদার? তখন কবি হাসতে হাসতে বললেন, 'ডটার ইন ল হল বাংলায় পুত্রবধু বা বউমা, তাই ব্রাইড মাদার।'

কবির কথা শুনে ভক্তের দল হেসে ফেললেন ও ছুটলেন প্রতিমা দেবীকে অভ্যর্থনা জানতে।

আলখাল্লা

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে সচরাচর আলখাল্লা পরতেন। একবার এক বিখ্যাত ব্যক্তি শান্তিনিকেতনে আসায় তাঁর সৌজন্যে কবি ধুতি চাদর পরেন। সুপুরুষ কবিকে ঐ সাজে সুন্দর দেখাচ্ছিল। আশ্রমের সবাই খুশি, কবিকে নতুন সাজে দেখে।

এর কিছুদিন পরে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী কবিকে বলেন, 'সেদিন ধুতি চাদরে আপনাকে দারুণ লাগছিল, গুরুদেব। আপনি কেন ধুতিচাদর পরেন না? ওতে কিন্তু আপনাকে বেশ মানায়, এবার থেকে মাঝে মাঝে ধুতি চাদর পরবেন।'

এ কথা শুনে কবি হেসে বলেন, 'তোমরা আমাকে ওরকম বাড়িয়ে বল, আর ধুতি পরব কী ? ওতে বড় ল্যাঠা, ধুতি কোঁচাও রে, পাট করো রে, ওই দুঃখেই ধুতির বদলে বালিশের ওয়াড়গুলো পরে থাকি, এতে কোনো ঝামেলা নেই।'

পদসেবা

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬ সালে একবার ঢাকায় গিয়েছিলেন। একদিন কবি নদীতে তুরাগ বোটে আরামকেদারায় বসে আছেন। কয়েকজন মেয়ে তাঁকে ঘিরে বসে। তারা কবির কাছে গান শিখছিল। কবি তাদের 'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা, নিয়ো হে নিয়ো' গানটি শেখাচ্ছিলেন। গান শেখানোর শেষে কবি মজা করে হেসে বললেন, 'দেখো তোমার যেন গেয়োনা—বেদনায় ভরে গেছে পেয়ালা।'

কবির কথা শুনে মেয়েরা হেসে উঠল। এর কিছুক্ষণ পরে কবি হাসতে হাসতে মেয়েদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'না, ঢাকাই মেয়েরা দেখছি একদম কাজের নয়। কিন্তু হ্যাঁ, ঢাকাই মশারা বড়ই কাজের। কেমন সুন্দর নিরলসভাবে পদসেবা করছে।'

মেয়েরা কবির কথার অর্থ বুঝল ও হাসতে হাসতে কবির পদসেবা করতে লাগল।

কবীন্দ্র

কবিগুরু একবার তাঁর জন্মদিনে কালিম্পং-এ মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে অতিথি হয়ে আছেন। কবির জন্মদিন বলে কথা। হৈ হৈ ব্যাপার। কত লোক আসছেন সকাল থেকে কবিকে শুভেচ্ছা জানাতে। দুপুরে পিয়ন এসে কবির নামে অনেক ডাক দিয়ে গেল। তাতে জন্মদিন সংখ্যার কিছু পত্রপত্রিকা, কিছু উপহার, কিছু চিঠি, শুভেচ্ছা, কবিতা। রবীন্দ্রনাথ সেগুলো দেখতে দেখতে লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবীকে বললেন, 'কই, তুমি তো একটাও কবিতা লিখলে না? আমি বেশ কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছি আমার প্রতি তোমার ভক্তি অসম্ভব দ্রুত কমে যাচ্ছে! ওই তো টেবিলে কাগজ কলম রয়েছে, তাড়াতাড়ি 'হে রবীন্দ্র কবীন্দ্র' ব'লে একটা কবিতা লিখে ফেল। দ্যাখো, আমার নামটা কেমন সুবিধের। অন্তত কবিদের জন্য তো বটেই। আমার নামের সঙ্গে মিলের জন্য হাপিত্যেস করতে হবে না। রবীন্দ্রর সঙ্গে কবীন্দ্র মিল লাগিয়ে দিলেই কবিতা হয়ে যাবে। নয় কি?'

কবির কথা শুনে মৈত্রেয়ী দেবী হাসলেন ও কবিকে প্রণান করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন।

রাজপুত্রের ছবি

রবিকবির সত্তরবছর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতায় তাঁর ভক্তদল জন্মজয়ন্তী উৎসবের বিশাল আয়োজন করে। কবি সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে ফাঁক বুঝে কিছুক্ষণ সাত নম্বর ল্যান্সডাউন রোডে মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে কাটিয়ে আসেন। মৈত্রেয়ী দেবীর

সেই সময় একটি বাঙালি বধূর ছবি আঁকছিলেন। কবি সেই ছবি দেখে হাসতে হাসতে বলেন, 'আমরা পুরুষেরা যখন লিখি তখন নারীদের কথা লিখি, যখন আঁকি নারীদের ছবি আঁকি, তোমরাও দেখছি তাই কর! এত অহঙ্কার তোমাদের ! পুরুষদের ছবি আঁক না, আঁক নিজেদেরই ছবি!'

কবির কথা শুনে মুচকি হেসে মৈত্রেয়ী দেবী একটি অশ্বারোহী রাজপুত্রের ছবি আঁকলেন। রাজপুত্র বনের মধ্যে একাকী চলেছেন। ছবিটি কবির খুব পছন্দ হয়। তিনি মৈত্রেয়ী দেবীকে রসিকতা করে বলেন, 'এই রাজপুত্রই বুঝি আসবেন?'

কবির কথায় মৈত্রেয়ী দেবী হেসে ফেললেন।

মৃণালিণীর রেসিপি

খাদ্যরসিক রবীন্দ্রনাথ খাদ্য নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন। অবশ্য ঝক্কি ঝামেলার বেশিরভাগটাই সামলাতে হত কবিপত্নী মৃণালিণী দেবীকেই। কবি নানা ধরণের মিষ্টি খেতে পছন্দ করতেন। মৃণালিণী দেবী সেই সব মিষ্টি তৈরী করতেন। কখনো দইয়ের মালপো, চিঁড়ের পুলি, কখনো আমের মিঠাই। একবার কবির 'ভাই ছুটি' বা 'ছোটবউ' মৃণালিণী দেবী গজার এক নতুন সংস্করণ তৈরী করেন। যা খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু। কবি এর নাম দিলেন 'পরিবন্ধ'। কবি একবার মৃণালিণীকে মানকচুর জিলিপি তৈরী করতে বলেন। সেটি সাধারণ জিলিপির থেকেও সুস্বাদু হয়। একবার চিকিৎসা বিদ্যার গবেষক বসুবিজ্ঞান মন্দিরের সদস্য ডাঃ জ্যোতিপ্রসাদ সরকার শান্তিনিকেতনে এলে কবি তাঁকে চায়ের টেবিলে নিমন্ত্রণ করে পান্তুয়া খাওয়ান। জ্যোতিপ্রসাদ মিষ্টি বড় ভালবাসতেন। তাই থালা ভর্তি পান্তুয়া শেষ করতে সময় নিলেন না। কবি তাঁকে জিগ্যেস করলেন, 'কিসের পান্তুয়া খেলে বলো তো ভাই?'

জ্যোতিপ্রসাদ বললেন, 'নিশ্চই ছানার!'

কবি তখন হেসে বললেন, 'ঠকে গেলে বন্ধু, ওগুলো ওলের তৈরী। মৃণালিণীর রেসিপি।'

কবির কথা শুনে জ্যোতিপ্রসাদ অবাক!

কত রূপে এঁকেছি

বৃদ্ধ বয়সে রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকার নেশায় মগ্ন হয়ে পড়েন। রানী চন্দ সেই সময় কবির কাছে এসে বসে থাকতেন। এবং প্রয়োজন মত কবিকে সাহায্য করতেন। যেমন, রঙ গুলে দেওয়া, তুলি এগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। কবি মাঝে মধ্যে রানী চন্দকে সামনে

বসিয়ে মডেল করেও ছবি আঁকতেন। কিন্তু হায়, ছবি শেষ হলে রানী চন্দ সেই ছবির সঙ্গে নিজের কোনো মিল খুঁজে পেতেন না। তিনি ছবি দেখে হেসে কবিকে বলতেন, 'গুরুদেব, এ কার ছবি? এ তো আমি নই!'

তখন রবীন্দ্রনাথ হেসে উত্তর দিতেন, 'না রে এ তোরই ছবি, তোর তো গর্ব হওয়া উচিত, আমি তোকে কত রূপে এঁকেছি, দেখতো!'

রানী চন্দকে কবিগুরু বিশেষ স্নেহ করতেন।

ডিসিশন

মংপুতে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথ একদিন লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবীর স্বামী ডাক্তার মনমোহন সেনকে বললেন, 'তোমরা সপরিবারে একবার কলকাতায় চলো।'

মনমোহন বললেন, 'গুরুদেব, আমার এখন অনেক কাজ, এখন কী করে যাই বলুন?'

কিন্তু কবি না-ছোড়। সেই সময় ঘরে ঢুকলেন মৈত্রেয়ী দেবী। তাঁকে দেখে কবি বললেন, ' ও মৈত্রেয়ী, তোমাদের সবার কলকাতায় যাবার ব্যবস্থা করে ফেললুম।'

একথা শুনে মনমোহন তো অবাক! মৈত্রেয়ী দেবী বললেন, 'আমরাও সেই আলোচনাই করছিলাম। কিন্তু ওঁর যে অনেক কাজ!'

কবি তখন বললেন, 'শোনো, একবার যখন দক্ষিনাচরণ সেন হয়ে গেছে তখন আর চিন্তা কিসের?'

মৈত্রেয়ী দেবী ভ্রু কুঁচকে বললেন, 'গুরুদেব, দক্ষিনাচরণ সেন আবার কে?'

রবীন্দ্রনাথ মুচকি হেসে বললেন, 'সে কী! তোমরা দক্ষিণাচরণ সেনকে জানো না? যার নাম ডি সি সেন অর্থাৎ ডিসিশন! সেই ডিসিশন যখন একবার হয়ে গেছে তখন আর তো পরিবর্তন করা যাবে না, বুঝলে?'

কী আর করা যায়। কবির কথা মেনে নিয়ে মনমোহন হাসতে হাসতে বললেন, 'চলুন, চলুন, তাহলে কলকাতা ঘুরেই আসি।'

এ কথা শুনে মৈত্রেয়ী দেবী হাততালি দিয়ে উঠলেন।

নিরামিষাশী কবি

রবীন্দ্রনাথ 'নতুন বৌঠান' কাদম্বরী দেবী ও স্ত্রী মৃণালিণী দেবীর অকাল মৃত্যুতে বড় আঘাত পেয়েছিলেন। তাই এই দু'জনের মৃত্যুর পর কবি মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দেন। যদিও প্রথম বয়সে কবি মাছ-মাংস খেতে খুব ভালবাসতেন। একদিন সুধাকান্তর সঙ্গে

কবির আমিষ-নিরামিষ নিয়ে জোর তর্ক বাধে। সুধাকান্ত ঘোর মাংসাশী। অন্য দিকে কবি তখন নিরামিষাশী। সুধাকান্ত একবার বাজি ধরে বাঘের মাংস খেয়েছিলেন। স্বভাবতই তিনি আমিষাহারকে সমর্থন করে বলেন, ‘ জীব পর্যায়ে তৃণভোজীদের চেয়ে মাংসাশীরা বেশি বিক্রমশালী।’

এ কথা শুনে কবি বলেন, ‘বটে! তাহলে হাতি, ঘোড়া, মহিষ, উট এদের বুঝি তোমরা জীবের মধ্যে গণ্য কর না? ওরা কেউ মাংস খায় বলে শুনিনি!’

আসলে সুধাকান্ত তর্ক করতে বসে তৃণভোজী বলতে শুধু গরু, ছাগল, হরিণ এদের কথাই ভেবেছিলেন। হাতি, ঘোড়া, উট, মহিষের নাম ওঠায় সুধাকান্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। তা দেখে হাসতে হাসতে কবি বলেন, ‘দ্যাখো, নিরামিষের কাছে আমিষ হেরে গেল।’

সুধাকান্ত এবার হেসে ফেললেন কবির কথা শুনে।

সহ সম্পাদক

শান্তিনিকেতনে একদিন বিকেলে কবির ঘরে সাহিত্য-আলোচনা হচ্ছে। কথা প্রসঙ্গে একটি পত্রিকার নাম ওঠায় রবীন্দ্রনাথ বললেন, ‘হ্যাঁ, এক সময় আমি এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম।’

কবির কথা শুনে আর একজন বললেন, ‘তাই নাকি?’

তারপর সেই ব্যক্তি অন্য আর এক জনের নাম উল্লেখ করে বললেন, ‘উনি এই পত্রিকার সহ সম্পাদক ছিলেন।’

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ‘সহ কি দুঃসহ বলতে পারব না। তবে ছিলেন বলে মনে হচ্ছে।’

কবির কথায় ঘরে হাসির রোল উঠল।

ঢাকা খোলা

রবীন্দ্রনাথ একবার ঢাকায় গিয়েছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের অতিথি হয়ে। রমেশচন্দ্র একদিন কবিকে ঢাকা শহর দেখাতে নিয়ে যান। সেই সময় ঢাকা শহরের রাস্তা ছিল সরু আর নোংরা। রমেশচন্দ্র শহরের যে অংশে থাকতেন সেটা অবশ্য শহরের নতুন অংশ, নাম—রমনা। তার চারদিকে খোলা সবুজ মাঠ। প্রত্যেক বাড়ির সামনে অনেকটা ফাঁকা জমি। স্বাভাবতই নতুন এবং পুরনোর তফাতটা বড় বেশি চোখে লাগত। রবীন্দ্রনাথ ঢাকা শহর দেখতে দেখতে রমেশচন্দ্ররকে বললেন, ‘রমেশ, তোমাদের এলাকার নাম বদলানো উচিত।’

রমেশচন্দ্র শুনে বললেন, 'কেন, গুরুদেব?'

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'এই ঢাকা শহরের ঢাকা অংশের নাম সার্থক। এই রমনার চারদিকে খোলা মাঠ, তাই এর নাম হওয়া উচিত— খোলা।'

কবির কথায় রমেশচন্দ্র হেসে ফেললেন।

দুষ্টু যখন শান্ত

শান্তিনিকেতনের আশ্রমের মেয়েরা শ্রীসদনের অধ্যক্ষা হেমবালা দেবীকে মাসিমা বলত। মেয়েরা তাঁকে যেমন ভয় পেত তেমন ভালবাসত। কয়েকটি দুষ্টু মেয়ে তাঁকে অস্থির করে তুলত। তখন হেমবালা দেবী রবীন্দ্রনাথের কাছে বাধ্য হয়ে নালিশ করতেন। আশ্রমে গৌরী, লাবী, মালতী নামে তিনজন মেয়ে ছিল। তারা ছিল বড় দুষ্টু প্রকৃতির । জোড়াসাঁকোয় 'নটীর পূজা' নাটকে অভিনয় করে আসার পর তাদের বিবাহ হয়ে যায়। বিয়ের পর তারা আর চঞ্চল, অস্থির, দুষ্টু রইল না, একদম শান্তশিষ্ট লক্ষ্মী বউ হয়ে গেল।

আশ্রমের এক দিদিমণির মুখে এই তিন দুষ্টুর বিয়ের পর শান্ত হয়ে যাওয়ার কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ হেসে বলেন, 'কী ভুলই না করেছি এত দিন। আমার উচিত ছিল শ্রী সদনে একজন শাশুড়ি এনে বসানো। তাহলে ঐ মেয়েরা আগে থেকেই শান্তশিষ্ট হয়ে থাকত।'

কেমিক্যাল মিউজিক

শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের টানেই শৈলজারঞ্জন এম.এস.সি পরীক্ষায় রসায়নে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েও শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভক্ত। অধ্যাপনার পাশাপাশি যখন তাঁর সংগীত চর্চা এগিয়ে চলেছে তখন কবিগুরু তাঁকে ডেকে একদিন জিগ্যেস করলেন, 'যদি কেউ তোমাকে জিগ্যেস করে তুমি কী কর, তবে তুমি কী উত্তর দেবে?'

শৈলজারঞ্জন বললেন, 'কেন, বলব আমি অধ্যাপনা করি।'

রবীন্দ্রনাথ তখন বললেন, 'অধ্যাপনা কর বলবে, কিন্তু কোন বিষয়ে অধ্যাপনা কর বলবে?'

শৈলজারঞ্জন বললেন, 'কেন, আমার বিষয় কেমিস্ট্রির কথা বলব।'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'না না, একটা নয়, বরং দুটো মিশিয়ে বলবে, বুঝলে?'

এ কথা শৈলজারঞ্জন বুঝতে পারলেন না। তিনি জিগ্যেস করলেন, 'দুটো মিশিয়ে বলব মানে? কার সঙ্গে কী মেশাব?'

এবার রবীন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে বললেন, 'হয় বলবে মিউজিক্যাল কেমিস্ট্রি, নয় বলবে কেমিক্যাল মিউজিক, কেমন?'

কবির এই কথা শুনে শৈলজারঞ্জন হেসে ফেললেন।

কনক কলস

মংপুত্রে মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে থাকার সময় একদিন রবীন্দ্রনাথ গাইছিলেন—

"কেন বাজাও কাঁকন কণ কণ কত ছল ভরে

ওগো ঘরে ফিরে চল কনক কলসে জল ভরে

কেন বাজাও—কেন বাজাও কাঁকন কণ কণ"

এই গান গাইতে গাইতে কবি বলে উঠলেন, 'ইস্, কী বোকাই ছিলুম তখন, নাহলে এমন লিখি? তবে এখন হলে লিখতুম—যাবে তো যাও না, তুমি গেলে এমন বিশেষ ক্ষতি হবে না, কিন্তু তোমার ওই কনক কলসটা রেখে যাও; বিশ্বভারতীর কাজে লাগবে।'

রবীন্দ্রনাথ এরকম আপন মনে কত গান গাইতেন, কত কথা বলতেন। মৈত্রেয়ী দেবী প্রমুখ অনেকেই কবির এরকম অনেক মুহূর্তের সাক্ষী।

জোড়াসাঁকোর ভূত

রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে পদ্মাবোটে স্ত্রী মৃণালিণী দেবীকে নিয়ে থাকতেন তখন এক বিধবা মহিলাকে রেখেছিলেন স্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য। মহিলাটির একটা বাই ছিল, সে সব সময় পুরুষমানুষকে ভয় করত। কবির পদ্মাবোটে নানা লোকের যাতায়াত। আর সেটাই বড় সমস্যা মহিলাটির। এই আচরণে মনে মনে বিরক্ত হতেন মৃণালিণী দেবী। তিনি কবিকে তা জানান। কবি একদিন মহিলাটিকে বুঝিয়ে বলেন, 'জগৎ থেকে পুরুষ জাতটাকে লুপ্ত করে দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তোমাদের মত তাদেরও পৃথিবীতে থাকবার অধিকার আছে। আমি কী করতে পারি বল। তুমি এমন আচরণ কোরো না।'

তবে কাকে বোঝানো! সে সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে। ঐ কে এলো! ঐ কোন পুরুষের ছায়া!—এই সব! তবে মহিলাটি একমাত্র পছন্দ করত বলেন্দ্রনাথকে। অন্যদিকে বলেন্দ্রনাথ তাকে দু'চক্ষে সহ্য করতে পারত না। মেয়েটিকে মৃণালিণী দেবীর সাহায্যের জন্য রাখা। কিন্তু সে কোনো কাজই করে না। শুধু খায় দায় ঘুমোয়। কিছু কাজ

করতে বললেই বলে, 'এ কাজ করার জন্য আমি আসিনি, এসেছি নিজের উন্নতি করতে।'

কবি সব শুনে ভাবলেন, একে আর রাখা যাবে না, আগে তাড়াতে হবে। কিন্তু কী ভাবে!

একদিন কবি সপরিবারে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গেলেন। সঙ্গে ঐ মেয়েটিও। সবাই মিলে তাকে তাড়াবার ছক করল। ভূতের ভয় ছিল মেয়েটির। তাকে থাকতে দেওয়া হল তেতলার ঘরে। গভীর রাতে তাকে ভয় দেখিয়ে সবাই নানা রকম শব্দ করত, কেউ ভূতের মুখোশ পরে ভয় দেখাত। এই সব কাণ্ড দেখে মেয়েটি চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'ওবাবা, ওমা! এ যে ভূতের বাড়ি গো! এখানে আমি আর থাকতে পারব না!'

প্রচণ্ড ভয় পেয়ে সে পরের দিন কবি ও মৃণালিণীদেবীকে পেন্নাম করে নিজের পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে পালিয়ে গেল।

সে বিদায় নিতে কবি ও মৃণালিণী দেবী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

ঘুমের ব্যাঘাত

কলকাতা থেকে কয়েকজন সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে শান্তিনিকেতনে এসেছেন। কবি ক্ষিতীশকে বললেন, 'দ্যাখো, এঁরা হলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক, বড় সেণ্টিমেণ্টাল। এদের যত্নের যেন ক্রটি না হয়, তুমি লক্ষ্য রেখ।'

রাত পেরিয়ে সকাল হল। সাহিত্যিকরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের জিগ্যেস করলেন, 'কাল রাত্রে ঘুম হয়েছিল? তোমরা বড্ড খারাপ সময়ে এসেছ, যা গরম! তবে সে আমার দোষ নয়, আকাশের।'

কবির কথা শুনে একজন সাহিত্যিক বললেন, 'না গুরুদেব, রাতে গরমে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় নি। তবে কোকিলের ডাকে ঘুম হয়নি।'

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, ' তোমরা কবি সাহিত্যিক, তোমাদের কী আর কোকিলের ডাকে ঘুম হয়? ঘুমের ব্যাঘাত তো হবেই। হ্যাঁ, আমারও ঘুমের ব্যাঘাত হয়। না, কোকিলের ডাকে নয়, মশার কামড়ে।'

কবির কথা শুনে সাহিত্যিকরা হেসে ফেললেন।

গরম লুচি

একদিন মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন সুরুল কুঠিবাড়িতে 'ফাল্গুনী' নাটক লিখছিলেন। এই বাড়িতে পরবর্তীকালে বিশিষ্ট

কংগ্রেস নেতা আচার্য কৃপালনী কিছুদিন ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী আসায় খুশি রবীন্দ্রনাথ। গান্ধীজী সূর্যাস্তের আগে রাতের খাবার খেয়ে নেন। তবে খাবার বলতে অন্য সকলের মত ভাত বা রুটি নয়, বাদাম!

রবীন্দ্রনাথ গল্পগুজব করে মেঝেতে পাতা আসনে বসে গরম গরম লুচি খেতে শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথের লুচি খাওয়া দেখে গান্ধীজী বললেন, 'এ কী আপনি সাদা ময়দার লুচি খাচ্ছেন? এ যে বিষ!'

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ একটুকরো লুচি মুখে পুরে বললেন, 'বাট মিস্টার গান্ধী, ইট ইজ এ ভেরি স্লো পয়জন।'

রবীন্দ্রনাথের কথায় গান্ধীজী হেসে ফেললেন।

লালু

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিকেলবেলা যখন চা খেতেন, তখন একটা কুকুর রোজ তাঁর পায়ের কাছে এসে বসত। কবি তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন, আনন্দে লেজ নাড়ত কুকুরটা। রবীন্দ্রনাথ কুকুরটার নাম দিয়েছিলেন 'লালু'। কারণ তার গায়ের রং ছিল লাল। প্রসঙ্গত উল্লেখ, শরৎচন্দ্রের একটি কুকুর ছিল, তার নাম 'ভেলু'। কবি চায়ের সঙ্গে মাখন পাঁউরুটি খেতেন এবং সেই খাবার প্রতিদিন লালুকে দিতেন। কবির ঘনিষ্ঠজনেরা বলাবলি করতেন, কবির মতই লালুরও খাবার ব্যাপারে সৌখিনতা দেখা যায়। এ কথা শুনে কবি মুচকি হাসতেন। কোনোদিন যদি পাঁউরুটিতে মাখন না লাগিয়ে লালুকে দেওয়া হত, সে মুখেই তুলত না খাবার। তাই কবি লালুর জন্য পাঁউরুটিতে মাখন ভর্তি করে লাগিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে কবির খাসভৃত্য বনমালী লালুকে মাখন পাঁউরুটি খেতে দিত। কিন্তু বনমালী পাঁউরুটিতে কম মাখন লাগিয়ে দিত বলে কুকুর সেই খাবার মুখে তুলত না। তাই দেখে কবি বনমালীকে ধমক দিতেন। বলতেন, 'দেখেছিস কুকুরের কী ডিগনিটি? এমন ভদ্র কুকুর বড় একটা দেখা যায় না।'

কোনো দিন বিকেলে লালুর যদি আসতে একটু দেরী হয়ে যেত, সেদিন কবি অস্থির হয়ে উঠতেন। কবির এই কুকুরপ্রীতির কথা শান্তিনিকেতনের অনেকেই জানতেন।

এপ্রিল ফুল

কবি অক্ষয় চৌধুরী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বন্ধু। তবু কিশোর রবির সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়সেই অক্ষয় চৌধুরীর সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে নানারকম আলোচনা করতেন। একবার পয়লা এপ্রিলের দিন জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে অক্ষয় চৌধুরীর আসার কথা। রবি আগে থেকেই

জ্যোতিদাদাকে বলে রেখেছেন, আজ অক্ষয় চৌধুরীকে এপ্রিল ফুল করতে হবে অর্থাৎ ঠকাতে হবে। জ্যোতিদাদা হেসে সায় দিয়েছেন। সেদিন বিকেলে রবি ও জ্যোতির বাবামশাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে যেতেই রবি প্রস্তুত! যথা সময়ে অক্ষয় চৌধুরী এলেন। রবি নকল দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে পার্শী সেজে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে দিলেন। বললেন, 'হামি বোম্বাই থেকে আসেছি, ভাইসাব।'

সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মবেশী রবি তাঁর সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে আলোচনাও শুরু করে দিলেন। অক্ষয় চৌধুরীও আলোচনা জুড়ে দিলেন পার্শী ভদ্রলোক অর্থাৎ ছদ্মবেশী রবির সঙ্গে। রবির এত নিখুঁত অভিনয় যে অক্ষয় চৌধুরী একটুও বুঝতে পারলেন না। ভেতর থেকে সব দেখে হাসতে লাগলেন জ্যোতিদাদা। কিন্তু সব পণ্ড হয়ে গেল তারকনাথ পালিত আসতেই। কী হল?

তিনি এসে রবিকে ঠিক চিনতে পারলেন ও রবির মাথায় চাপড় মেরে বললেন, 'এ কী রবি! কী হচ্ছে?'

ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে পার্শী ভদ্রলোকের নকল দাড়ি গোঁফ খসে পড়ল! অক্ষয় চৌধুরী দেখলেন ও চিনলেন আসল রবিকে। জ্যোতিদাদা সহ অন্যরা হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন। অক্ষয় চৌধুরী ভাবলেন, সত্যি রবি আচ্ছা এপ্রিল ফুল করেছে বটে! এমন ঠকা আগে কখনো ঠকিনি!

এক গ্লাস রস

রবীন্দ্রনাথ একদিন শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণের বারান্দায় বসে আছেন। সেই সময় শান্তিনিকেতনের শিক্ষক আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন কবির সঙ্গে দেখা করতে এলেন। দু'জনে বসে গল্প করছেন, এমন সময় কবির খাস ভৃত্য বনমালী কবিকে একটা সুন্দর কাঁচের গ্লাসে কিসের রস দিয়ে গেল, কবি তৃপ্তি ভরে সেই রস চুমুক দিয়ে খেতে লাগলেন। ক্ষিতিমোহন ভাবলেন, এ নিশ্চই দামী ফলের সরবত। কবির কী সৌভাগ্য, তিনি এই রস পান করছেন। ইস্ আমি বঞ্চিত হলাম। আমাকেও তো এক গ্লাস রস খেতে দেওয়া উচিত ছিল। এমন তো আগে কখনো হয়নি! খাদ্যরসিক ক্ষিতিমোহন লোভে পড়ে বারবার সেই গ্লাসের দিকে তাকাতে লাগলেন। কথা বলতে বলতে কবি বুঝতে পারলেন ক্ষিতিমোহনের মনের কথা। কবি তখন বনমালীকে বললেন, 'শোন, এই বাবুকেও আমার মত পানীয় এনে দে, উনিও খাবেন, তাড়াতাড়ি আন।'

কবির কথা শুনে ক্ষিতিমোহন খুশি হলেন। কথামত বনমালী কবির মতই এক গ্লাস রস এনে ক্ষিতিমোনকে খেতে দিলো। মনে মনে উৎফুল্ল ক্ষিতিমোহন গ্লাস হাতে নিয়েই চুমুক দিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। কবি এবার হাসতে হাসতে বললেন, 'কী হে ক্ষিতিমোহন, কেমন লাগল পানীয়? ওটা হচ্ছে নিমপাতার

রস।' কোনো উত্তর না দিতে পেরে ক্ষিতিমোহন চুপ করে রইলেন। কবি এইভাবে অনেকের সঙ্গেই মজা করছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃতই রসে টৈটম্বুর। তাঁর মত রসিক মানুষ সত্যিই খুঁজে পাওয়া ভার।

মুখ্য সংস্করণ

সালটা সম্ভবত ১৯৪০। রবীন্দ্রনাথ তখন অসুস্থ অবস্থায় বিশ্রাম নিচ্ছেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। সেই সময় তিনি বিছানায় শোয়া অবস্থাতেই হাতমুখ ধুতেন, চুল আঁচড়াতেন। এ সব কাজ করিয়ে দেবার লোক ছিল। একদিন সকালে তিনি শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন, অনিলকুমার চন্দ সেই সময় এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কবির উঠে বসার মত শারীরিক ক্ষমতা নেই, কিন্তু তবু রসিকতা করতে ছাড়েন না। অনিলকুমার তাঁকে প্রণাম করতে কবি গম্ভীর স্বরে বললেন, 'বলো অনিল, রবীন্দ্ররচনাবলীর এখনকার মুখ্য সংস্করণের খবর কী?'

অনিলকুমার কবির কথার প্রকৃত অর্থ না বুঝতে পেরে রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রকাশের খবর গড়গড় করে বলতে শুরু করে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁকে ধমক দিয়ে রসিকতা করে বললেন, 'সত্যিই অনিল, তুমি সিলেটি বাঙাল বটে! আমি জানতে চাইছিলুম আজ আমার মুখের অবস্থা কী রকম?

অনিলকুমার এবার কবির কথা শুনে হেসে ফেললেন।

নাম চুরি

রবীন্দ্রনাথ একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ঢাকা শহরে যান এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের অতিথি হন! রমেশচন্দ্রের পুত্রের বয়স নয়-দশ। তার ভাল নাম অশোক এবং ডাক নাম রবি। বাড়িতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এসেছেন! তাই রমেশচন্দ্র বাড়ির সকলকে জানিয়ে দেন, যে ক'দিন গুরুদেব এখানে থাকবেন কেউ যেন অশোককে রবি নামে না ডাকে। পুত্রকেও সেই মত রমেশচন্দ্র জানিয়ে দেন যে, রবি নামে কেউ ডাকলে সে যেন সাড়া না দেয়। কিন্তু সব শেখালেই তো আর হয় না। রবীন্দ্রনাথ রমেশচন্দ্রর বাড়িতে এসেই অশোকের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন এবং জানতে চাইলেন, ' তোমার নাম কী?'

ছোট্ট অশোক উত্তর দিল, 'আমার নাম রবি।'

নাম শুনে রবীন্দ্রনাথ রমেশচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রীকে ডেকে রসিকতা করে বললেন, 'না বাপু, তোমরা লোক ভাল নয়।'

এ কথা শুনে রমেশচন্দ্র অবাক! ভাবলেন, কী হল! কবিকে তিনি জিগ্যেস করলেন, 'গুরুদেব, কী ব্যাপার?'

রবীন্দ্রনাথ এবার হেসে বললেন, 'আমি আসার পূর্বেই দেখছি আমার নামটা চুরি করে বসে আছ! এরপর তো আরও অনেক কিছু চুরি করবে হে!'

কবির কথা শুনে সকলে হেসে উঠলেন।

মালাবদল

প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসুর কন্যা গৌরী দেবীর সঙ্গে যখন সন্তোষ ভঞ্জের বিয়ে হয় কবি তখন খুবই অসুস্থ। বিছানা থেকে নামতে পারতেন না কবি। তিনি তখন থাকতেন উদয়ণে। গৌরী দেবী ফুল দিয়ে চমৎকার মালা গাঁথতেন ও অলঙ্কার তৈরী করতেন। বিয়ের পর স্বামীকে নিয়ে গৌরী দেবী কবির সঙ্গে দেখা করতে এলেন। একটি সুন্দর মালা গেঁথে এনে গৌরী দেবী কবির গলায় পরিয়ে দেন। কবি অসুস্থ শরীরেই রসিকতা করে গৌরী দেবীর স্বামী সন্তোষ ভঞ্জের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখলে, ওর কী দুঃসাহস! তোমার সামনেই আমার সঙ্গে মালাবদল করছে!'

কবির কথা শুনে সন্তোষ ভঞ্জ ও গৌরী দেবী হেসে ফেললেন ও কবিকে প্রণাম করলেন। কবি নব দম্পতীকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন।

কবির দণ্ড

বৃদ্ধ বয়সে রবীন্দ্রনাথ ভালভাবে হাঁটতে পারতেন না। তবু তিনি সারাদিন চুপকরে ঘরে বসে থাকতেও পারতেন না। একদিন তিনি আস্তে আস্তে হেঁটে কলাভবনে এলেন। সেখানে এসে তিনি চারদিকে তাকিয়ে বললেন, ' কই? আমার দণ্ড কই?'

কবির কথা শুনে সবাই অবাক। গুরুদেবের হাঁটতে অসুবিধা হয় সবাই জানে, কিন্তু তিনি আবার হাতে লাঠি নিলেন কবে থেকে?

সেই সময় শিল্পী নন্দলাল বসুর বড় মেয়ে গৌরী দেবী কবির পাশে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন। তখন কবি তাঁর কাঁধে হাত রেখে ঘুরে ঘুরে কলাভবনের সব কিছু দেখতে লাগলেন। এরপর কবি উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, 'কী ব্যাপার, তোমরা কি এখানে কোনো ফটোগ্রাফারের ব্যবস্থা রাখোনি?'

সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরার ব্যবস্থা হল। গৌরী দেবী সলজ্জ দাঁড়ালেন গুরুদেবের পাশে। কিন্তু তাঁরা আলোর বিপরীতে দাঁড়ানোর জন্য ফটোতে একটি কালো কাগজ ছড়া কিছুই দেখা গেল না।

কবি গৌরী দেবীকে বিশেষ স্নেহ করতেন।

ভদ্রলোক

রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় এসেছেন শুনে তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন হেমন্তবালা দেবী। কিন্তু যখন হেমন্তবালা এলেন, কবি তখন ঘরে ছিলেন না। কিন্তু এসেছেন যখন দেখা করেই যাবেন—এই সিদ্ধান্ত নিয়ে হেমন্তবালা দেবী কবির ঘরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ চুপ বসে থাকার পর হেমন্তবালা টেবিলে কবির খাতাপত্র আনমনে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। সেই সময় কবির প্রবেশ। রবীন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকেই গম্ভীর মুখে বললেন, 'এ তোমার কেমন স্বভাব হে? ভদ্রলোকের ঘরে ঢুকে কাউকে কিছু না বলে এটা সেটা নাড়াচাড়া করছ?'

হেমন্তবালা দেবী তখন কবির কথার উত্তরে হাসতে হাসতে বললেন, 'আমি কোন্ ভদ্রলোকের ঘরে ঢুকে কী নাড়াচাড়া করতে গেছি বলুন?'

কবি বললেন, ' সে কী কথা? আমাকে তুমি ভদ্রলোক মনে কর না?'

হেমন্তবালা দেবী বললেন, 'আহা, আপনার বাড়িতে আসতে আবার আমাকে অনুমতি নিতে হবে?'

এবার কৃত্রিম গাম্ভীর্য সরিয়ে কবি হেসে উঠলেন। হেসে উঠলেন হেমন্তবালা দেবীও।

খালি ওষুধ খায়

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ সবার দিকে সমান নজর রাখতেন। কেউ অসুস্থ হলে কবি ঠিক বুঝতে পারতেন। একদিন শৈলজারঞ্জনকে তিনি বলেন, 'কী ব্যাপার, গলাটা ধরা ধরা লাগছে, শরীর ভাল নেই নিশ্চই।'

শৈলজারঞ্জন স্বীকার করে বলেন, 'হ্যাঁ গুরুদেব, শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।'

রবীন্দ্রনাথ তখন শৈলজারঞ্জনকে জোর করে বায়োকেমিক ওষুধ দিয়ে বলেন, 'নাও, এক্ষুনি খেয়ে নাও। আর হ্যাঁ, নামটা কিন্তু খাতায় লিখে রাখতে ভুলো না।'

এর কিছুদিন পরে কবি অন্য একজনকে শৈলজারঞ্জন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, 'ওকে অমনি মোটাসোটা দেখছ, ওর ভেতরে হাইপোকনড্রিয়া আছে। খালি ওষুধ খায়!' এই কথা পরে শৈলজারঞ্জনের কানে যেতে তিনি এসে ভয়ে ভয়ে কবিকে বলেন, 'গুরুদেব, আমি কি আপনার কাছে ওষুধ চেয়ে খাই? আপনি একথা বলেছেন যে?'

কবি তখন হেসে বলেন, 'হ্যাঁ বলেছি, রগড় করে বলেছি, তুমি একটু দেরীতে বুঝেছ, এই যা! তা হ্যাঁ, এখন শরীর কেমন আছে?'

কবির কথায় শৈলজারঞ্জন হেসে বলেন, 'ভাল।'

চির কুমার

রবীন্দ্রনাথ একবার দাক্ষিণাত্যে যাচ্ছিলেন। ট্রেন যাত্রার সময় বড় বড় স্টেশনে ট্রেন থামা মাত্রই ভক্তের দল কবিকে মালা পরিয়ে যাচ্ছিলেন। কবি তখন তাঁর সঙ্গী অ্যান্ড্রুজকে বললেন, 'আমি বড় ক্লান্ত, তুমি ওদের বুঝিয়ে বল। ওদের সঙ্গে কথা বল।'

তো তাই মেনে নিলেন অ্যান্ড্রুজ। ভোর হতেই একটা স্টেশনে ট্রেন থামল। কিছুক্ষণ পর অ্যান্ড্রুজ কবির কাছে এলেন। তাঁর গলায় একরাশ মালা। তিনি কবিকে বললেন, 'গুরুদেব, দেখুন, আপনার জন্য আমাকে কত মালা পরতে হয়েছে।'

রবীন্দ্রনাথ তখন রসিকতা করে বললেন, 'যারা মালা পরাল তাদের মধ্যে কোনো অবিবাহিতা মেয়ে ছিল কি?'

কবির কথা শুনে চির কুমার অ্যান্ড্রুজ মুচকি হাসলেন।

রসের সাগর

রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে বিশেষ স্নেহ করতেন। ইন্দিরা দেবীও ভক্তি করতেন গুরুদেবকে। ইন্দিরা দেবী প্রতিদিন লরেটো কলেজে পড়তে যেতেন। তিনি যেতেন গাড়ি করে। যাবার সময় তিনি প্রতিদিন দেখতেন, বড় রাস্তার মুখে একজন সুসজ্জিত যুবক দাঁড়িয়ে। বাড়ির বড়দের নজরে এল ব্যাপারটা। কিন্তু তিনি কী করেন? কেউ যদি দাঁড়িয়ে থাকে তাঁর দোষ কোথায়?

বাড়ির সমবয়সী ভাই দাদা দিদিরা মজা মস্করা করার এই সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাইলেন না। তাঁরা ইন্দিরা দেবীকে রাগাতেন। কিন্তু মজা হবে অথচ রবীন্দ্রনাথ থাকবেন না তা কখনো হয়?

রবীন্দ্রনাথের কানে কথাটা যেতেই তিনি চুপি চুপি একটা গান লিখে ফেললেন এবং ইন্দিরা দেবীর উপস্থিতিতে সবার সামনে গেয়ে শোনালেন। ইন্দিরা দেবী তো লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলেন গান শুনে। গানটা হল—

"সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে।
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে।"

এরপর কবি গানটি দিলেন ইন্দিরা দেবীকে।

রবীন্দ্রনাথ সময় সুযোগ পেলেই চেনাপরিচিতদের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতায় মেতে উঠতেন। তাঁকে রসের সাগর বললে খুব ভুল বলা হবে না।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রঙ্গ রসিকতা

জন্ম সাল-১৮৬৩

মৃত্যু সাল-১৯১৬

টাইটেল

কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অনেকের কাছে ডি.এল রায় নামে পরিচিত। একদিন সকালে তিনি নিজের ঘরে বসে একটি নাটক রচনা করছেন। এমন সময় এক স্বল্প পরিচিত ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। লোকটিকে দেখে কলম থামিয়ে চশমা হাতে দ্বিজেন্দ্রলাল বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন?'

লোকটি সরকারি খেতাব পেয়ে আনন্দে গদগদ হয়ে দ্বিজেন্দ্রলালকে জানাতে এসেছেন। বাঁধভাঙা উচ্ছাসে একটু বেশি আত্মীয়তা দেখিয়ে লোকটি বললেন, 'বলি, তুমি কেমন ধারার মানুষ হে মিস্টার দ্বিজু?'

দ্বিজেন্দ্রলাল এ হেন সম্বোধন শুনে তো অবাক। ভ্রু কুঁচকে বললেন, 'কেন, কী হল?'

লোকটি বললেন, 'আমি টাইটেল পাওয়ায় বিশ্বশুদ্ধ লোক আমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, আর তুমি কিনা নিজের লোক হয়েও একবারও খোঁজ নিলে না গা।' দ্বিজেন্দ্রলাল বুঝলেন পাগলের খপ্পরে পড়েছেন! তখন হাসতে হাসতে বললেন, 'হা কপাল আমার! তুমি টাইটেল পেয়ে আনন্দে লাফাচ্ছ! আসলে সরকার বাহাদুর যে তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছেন সেটাও বুঝতে পারনি। না হলে তুমিই বলো, তোমার মত অশিক্ষিত লোকের কী করে টাইটেল মিলবে? কী হে চুপ কেন? বলো কিছু—!' দ্বিজেন্দ্রলালের কথা শুনে 'আসি ভাই একটু তাড়া আছে' বলে লোকটি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালালেন! দ্বিজেন্দ্রলালও নিশ্চিন্তে নাট্যরচনায় মন দিলেন। লেখার সময় কেউ তাঁকে

বিরক্ত করলে তিনি খুব অসন্তুষ্ট হতেন!

ইঁটের বদলে পাথর

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একদিন গল্প করছিলেন এক ইংরেজের সঙ্গে। কথায় কথায় সেই ইংরেজ ব্যক্তিটি বললেন, 'হিন্দু ধর্মটা মিথ্যা, কারণ তাহারা পৌত্তলিক।'

নিজ ধর্ম সম্পর্কে ইংরেজের মুখে এহেন মন্তব্য শুনে দ্বিজেন্দ্রলালের মাথা গরম হয়ে গেল। তিনি পিঠোপিঠি বললেন, 'সাহেব, খ্রীষ্টধর্মটা খুব ভুল!'

ইংরেজ জিগ্যেস করলেন, 'কেন? ভুল কেন?'

দ্বিজেন্দ্রলাল হেসে বললেন, 'পরমেশ্বর তো একদিনই জগত তৈরী করতে পারতেন! ছয়দিন সময় নিলেন কেন? আর তাছাড়া করলেন তো একদিন আবার কেন বিশ্রাম করলেন? এই পৃথিবী তৈরী করতে কি তাঁর বড় বেশি পরিশ্রম হয়েছিল?'

হিন্দিতে একটা কথা আছে—ইঁট কা জবাব পত্থর সে! অর্থাৎ ইঁটের জবাব পাথরে! তো এ হেন জবর জবাব পেয়ে লাল মুখো সাহেবের মুখ আরও লাল হয়ে গেল! সেটা লজ্জায়!

বিলিতি ও দেশী

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একদিন রায়পুরে এক দরবারে অদ্ভুত পোশাক পরে হাজির হলেন। কী রকম? ধুতি-চাদর-লালকোট- বিলিতি টুপি! উপস্থিত সকলেই তাঁর এই বেশ দেখে অবাক! কমিশনার সাহেব হেসে বললেন,'আপনি পাগল নাকি মশাই! না হলে এরকম পোশাক পরে কেউ আসে?'

দ্বিজেন্দ্রলাল রাগ করলেন না, হাসতে হাসতে বললেন, 'আমি বিলিতি ও দেশী পোশাক মিশিয়ে পরে এই দুই আলাদা জাতির মিলনের পরিচয় দিয়েছি। এবার বলুন আইডিয়াটা কেমন?'

দ্বিজেন্দ্রলালের কথা শুনে উপস্থিত প্রত্যেকেই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন। কবি এরকম রঙ্গ রসিকতা করতে খুব ভালবাসতেন।

রিজেন্ট পার্কে

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একদিন বন্ধুদের সঙ্গে কলকাতার রিজেন্ট পার্কের ভেতর দিয়ে গল্প করতে করতে আসছিলেন। এমন সময় তিনি দেখেন, পার্কের ভেতরে এক সাদাপোশাক পরিহিত পাদ্রী হাত নেড়ে নেড়ে চিৎকার করে বক্তৃতা করছেন! বক্তৃতার মধ্যদিয়ে তিনি ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন। স্বভাবতই তাঁর চারদিকে ধর্মভীরু মানুষের ভিড়। ভিড়ে খ্রীস্টানদের পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমান শ্রোতাও রয়েছেন!

'কী বলছেন পাদ্রী, একটু শুনি চলুন' — বন্ধুদের একথা বলে উৎসুক দ্বিজেন্দ্রলাল

ভিড় ঠেলে বক্তৃতা শোনার জন্য একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন ধর্মপ্রচারক পাদ্রীসাহেব তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,' শয়তান তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে!'

দ্বিজেন্দ্রলাল পাদ্রীসাহেবের এই কথা শুনে ভিড়শুদ্ধ লোকের সামনে গলা তুলে বললেন,' হ্যাঁ-হ্যাঁ, সে তুমিই বটে!'

দ্বিজেন্দ্রলালের কথা শুনে পাদ্রীর মুখ চুন!

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন উপস্থিত সকলেই।

বিচার প্রসঙ্গে

বিখ্যাত 'সাজাহান' নাটকের লেখক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এক রাতে গল্প করছিলেন এক ইংরেজ সাহেবের সঙ্গে। সাহেব তাঁকে বললেন,' আপনারা তিন-চার বছর বিদেশে থেকেও আমাদের দেশের রীতিনীতি সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেননি। কীভাবে আমাদের ওপর বিচার করবেন?'

কথা শুনে তৎক্ষনাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল বলে উঠলেন, 'সাহেব, আপনারা দৈবশক্তিতে বোধহয় বিদেশ থেকেই আমাদের রীতিনীতি জানতে পারেন, আর তাই আমাদের বিচার করতে পারেন। নয় কি?'

দ্বিজেন্দ্রলালের মুখে চটজলদি এহেন কথা শুনে সাহেব আর কিছু কথা বলতে না পেরে 'গুড নাইট' বলে চলে গেলেন!

তরুণ নাট্যকার

এক তরুণ নাট্যকার একদিন সকালে দেখা করতে এসেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে। তরুণ নাট্যকারটি কথায় কথায় তোষামোদ করতে থাকেন দ্বিজেন্দ্রলালকে। তরুণ নাট্যকারের আবেগ এতটাই বেড়ে যায় যে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালকে বলেন —'হে কবি, হে নাট্যকার, আপনি এদেশের একজন আদর্শ মহাপুরুষ। আমি আপনাকে যত ভক্তি করি, এজগতে আর কাউকে তেমন ভক্তি করি না। আমি আপনার লেখার গুনমুগ্ধ ভক্ত, আপনি আমাকে আপনার চরণে স্থান দিন......।'

পুজো পেতে অভ্যস্ত বা আগ্রহী ছিলেন না দ্বিজেন্দ্রলাল। তিনি বুঝেছিলেন এ ছোঁড়ার নিশ্চই কোনো ধান্দা আছে! আসলে তরুণ নাট্যকারটির তোষামোদের আসল উদ্দেশ্য ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের সাহায্যে রঙ্গমঞ্চে তার একটা নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করা। তরুণ নাট্যকারটি নিজের মুখেই এই ইচ্ছে প্রকাশ করেন দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে। সঙ্গে চলতে থাকে তোষামোদ। শেষমেষ অতিষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রলাল বলেই ফেললেন, ' কী বলেন মশাই! আপনি আমার চেয়ে আদর্শ পুরুষ খুঁজে পাননি? আপনি আমাকে যত

ভক্তি করেন এত ভক্তি পৃথিবীতে আর কাউকে করেন না? আপনার বাবা-মা এখনও জীবিত, আপনি তাঁদের চেয়েও বেশি আমাকে ভক্তি করেন? আপনি যে এত নির্লজ্জ, এমন অপদার্থ তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি! উঃ কী জঘন্য তোষামোদ! কই দেখি আপনাকে একটা প্রণাম করি! — বলেই দ্বিজেন্দ্রলাল পরিস্কার ঘরের মেঝেতে সটান শুয়ে পড়ে সেই তরুণ নাট্যকারকে সত্যসত্যই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে বললেন,' সত্যি আপনি মশাই ধন্য, আপনি ধন্য!'

তরুণ নাট্যকার লজ্জিত হলেন। অতিরিক্ত তোষামোদের ফল সুখের হল না। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁকে প্রণাম করে চলে গেলেন।

নিমন্ত্রণপত্র

বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ছিলেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শ্বশুরমশাই। দ্বিজেন্দ্রলাল একবার তাঁর শ্বশুরবাড়িতে বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজনদের এক ভোজ দিয়েছিলেন। তার শ্যালক জিতেন্দ্রনাথও ছিলেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক।

যে নিমন্ত্রণ পত্রটি তিনি পাঠিয়েছিলেন নিমন্ত্রিতদের, তা এরূপ—

''যাঁহার কুবেরের ন্যায় সম্পত্তি, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধি, যমের ন্যায় প্রতাপ, এহেন আপনি আপনার ভবনের নন্দনকানন ছাড়িয়া, আপনার পদ্মপলাশনয়না ভামিনী সমভিব্যাহারে, আপনার স্বর্ণশকটে অধিরূঢ় হইয়া এই দীন অকিঞ্চিৎকর অধমদের গৃহে, শনিবার মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্নে আসিয়া যদি শ্রীচরণের পবিত্র ধূলি ঝাড়েন—তবে আমাদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়।

ইতি

শ্রীসুরবালা দেবী। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মজুমদার।''

এই নিমন্ত্রণ পত্র পড়ে প্রত্যেকেই মজা পেয়েছিলেন। অনেকেই এর প্রত্যুত্তরে কৌতুকময় উত্তর দিয়েছিলেন। কবি ও দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কাব্য করে লেখেন—

"ন চ সম্পত্তি ন বুদ্ধি বৃহস্পতি,
যমঃ প্রতাপ চ নাহিক মে।
ন চ নন্দনকানন, স্বর্ণসুবাহন
পদ্মবিনিন্দিত পদ্মযুগ মে।
আছে সত্যি পদরজ রত্তি, — তাও পবিত্র কি জানিত নে,

চৌদ্দপুরুষ তব ত্রাণ পায় যদি, অবশ্য ঝাড়িব তব ভবনে।
কিন্তু—
মেঘাচ্ছন্ন শনি অপরাহ্নে যদি গুরু বাধা ঘটে মে
কিম্বা যদ্যপি সহসা চুপি চুপি প্রেরিত না হইপরধামে।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কাব্য-পত্র পড়ে মজা পেয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং।

দ্বিজেন্দ্রলালের শ্যালিকাপতি ব্যারিস্টার কুমুদ চৌধুরীও নিমন্ত্রণ পত্রের প্রত্যুত্তরে একটি রসাল ছড়া রচনা করে পাঠান।

ছড়াটা এই রকম—

" ডানাকাটা পরী
গাঁজাগুলি আকবরী,
হোমা-পেত্নী ধন্বন্তরি
ত্রয়ে নমস্করি
এত কহে পায়ে ধরি
শ্রী কুমুদ চৌধুরী।।"

দ্বিজেন্দ্রলাল এই চিঠিগুলি সযত্নে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন ব্যক্তিগত লেখায় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এই পত্রগুলির উল্লেখ করেন।

রসিক দ্বিজেন্দ্রলালের কাছের মানুষজনরাও ছিলেন রীতিমত রসিক।

জানা যায়, ওই ভোজসভায় নিমন্ত্রিতদের অতি যত্নে আপ্যায়ন করে দ্বিজেন্দ্রলাল ভোজন করিয়েছিলেন।

বেশ হবে

এক সাহেব দ্বিজেন্দ্রলালকে বলেন,' আমার ইচ্ছে ইংরেজরা ভারতবর্ষ থেকে চলে যায়, আর এক জাতি এসে বাঙালিকে ছিন্নভিন্ন করে। তারা যেমন ইংরেজ বিরূপ, ইংরেজ বিদ্বেষী, তেমন ফল পাবে, বেশ হবে!'

চটজলদি দ্বিজেন্দ্রলাল সাহেবের মুখের ওপর উত্তর দিলেন,'আমিও দেখব ইংরেজ সাহেবরা ভারতবর্ষ ছেড়ে গেলে কেমন অনাহারে মরবে, বেশ হবে!'

সাহেবের আর উত্তর দেওয়ার মুখ রইল না।

দাড়ি কলপ

দ্বিজেন্দ্রলালের কলকাতার বাড়িতে একদিন ঘরোয়া সাহিত্যসভা বসেছে। তাঁর বন্ধু সাহিত্যিক-কবিরা অনেকেই এসেছেন। কেউ স্বরচিত রচনা পাঠ করছেন, কেউ মত্ত আলোচনায়। মাঝেমাঝে নানারকম কথাবার্তা হচ্ছে। চলছে টুকটাক খাওয়া দাওয়া।

এমন সময় দ্বিজেন্দ্রলাল রসিকতা করেই বললেন,' ওহে, আজকের এমন দিনটা যে শুধুমাত্র সাহিত্যচর্চা করে মিছে কেটে যাচ্ছে! বলো দেখি কী করা যায়?'

এক বন্ধু হাসতে হাসতে বললেন 'না-না, মিছে কাটতে দেব না, খানিকবাদেই এসে যাচ্ছেন দাদামশায়, তাঁর পাকা দাড়িতে কলপ লাগালে কেমন হয়?'

দ্বিজেন্দ্রলাল বললেন, 'মন্দ বলনি বন্ধু!'

তো দ্বিজেন্দ্রলাল এর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর চাকরকে ডেকে একটি শিশিতে জল ভরে কাগজে মুড়ে রাখতে বললেন এবং শিখিয়ে দিলেন—যখনই দাদামশায় আসবেন তখন ডাকা মাত্রই যেন সে কাগজে মোড়া শিশিটা নিয়ে আসে, আর কেউ জিগ্যেস করলে যেন বলে—'ওষুধের দোকান থেকে কেনা।'

সব প্রস্তুতি সারা। বাইরে কাশতে কাশতে কে যেন এলেন! দাদামশায় এসেছেন! যত্ন করে দাদামশায়কে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো। কিছুক্ষণ পরে দ্বিজেন্দ্রলাল কথা প্রসঙ্গে দাদামশায়-এর দাড়িতে কলপ লাগানোর ইচ্ছে প্রকাশ করলেন ও কলপ আনা হয়ে গেছে বলে চাকরকে ডাক দিলেন। ডাক পাওয়া মাত্র 'যাই প্রভু' বলে চাকর কলপের শিশি হাতে হাজির!

দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-সাহিত্যিক বন্ধুরা দাদামশায়-এর লম্বা দাড়ি ধরে কলপের শিশি নিয়ে কলপ লাগানোর চেষ্টা করলেন। দাদামশায়ও ভয়ে তাদের হাত থেকে দাড়ি ছাড়িয়ে নিলেন ও ছুটে পালিয়ে দাড়ি কলপ হবার থেকে বাঁচলেন!

ভীত দাদামশায়ের ছুটে পালানো দেখে দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁর বন্ধুরা হেসে গড়াগড়ি খেলেন। এই দাদামশায় ছিলেন সাহিত্যিক প্রসাদদাস গোস্বামী। তিনি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের আত্মীয় ও নিত্যসহচর। দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে প্রসাদদাসের নাতজামাই হতেন। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল প্রসাদদাসকে দাদামশায় বলতেন।

গ্রীষ্মে লেপ

দাদামশায় প্রসাদদাস গোস্বামীর সঙ্গে মাঝে মাঝেই রঙ্গ রসিকতায় মেতে উঠতেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবীন দাদমশায়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। দাদামশায়ও স্নেহ করতেন দ্বিজেন্দ্রলালকে। তাঁদের সম্পর্কটা ছিল হাসি-ঠাট্টার। দাদামশায় প্রসাদদাস প্রায়ই আসতেন দ্বিজেন্দ্রলালের কলকাতার বাড়িতে। এমনই একদিন তিনি এসেছেন কবি-গৃহে। তখন গ্রীষ্মকাল। দাদামশায় গরমে ঘেমে নেয়ে একাকার! অন্যান্য সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে বসেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। দাদামশায়কে দেখে রসিকতা করে তিনি বলে উঠলেন, 'ওহে তোমরা দেখছ না আমাদের দাদামশায়ের শীত পাচ্ছে, ওঁকে লেপ চাপা দাওহে!'

এ কথা বলা মাত্র দ্বিজেন্দ্রলালের রসিক বন্ধুরা সত্য সত্যই লেপ নিয়ে এসে চাপা দিয়ে দিলেন দাদামশায়ের গায়ে! দাদামশায় দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁর বন্ধুদের এহেন মধুর জ্বালাতনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি কিছু মনে করতেন না। বরং মনে মনে মজাই পেতেন।

রসিকে রসিকে

'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে একদিন দ্বিজেন্দ্রলাল হ্যাট কোট পরে হাজির। সেখানে ছিলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল পাঁচকড়িকে হাসতে হাসতে বললেন,' তোমার এখানে বাপু আসতে বড় ভয় করে। তুমি বঙ্গবাসী এডিটর, গোঁড়াদের সর্দার বলে কথা!'

ইন্দ্রনাথ হেসে বললেন,' না মশাই, পাতিদের সর্দার। কমলালেবু জন্মায় সিলেটে। সেই কমলা বাংলার মাটিতে ফললে গোঁড়া হয়। পাঁচকড়ি এই দেশেরই, তাই পাতি বা বড় জোর শ্রদ্ধা করে কাগ্‌জী বলা যেতে পারে।'

রসিকতা শুনে দ্বিজেন্দ্রলাল বললেন, ' ঠিক চিনেছি, আপনি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যো, কেমন, কারণ এমন উপমাযুক্ত রসিকতা আর কে করতে পারে?'

ইন্দ্রনাথ বললেন,' আমিও তোমায় ঠিক চিনেছি, তুমি দ্বিজেন্দ্রলাল—বিলেত ফের্তা ক'ভাই। তাই তো?'

দুই রসিকের পরিচয় হয়ে গেল পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে।

স্বামী বিবেকানন্দের রঙ্গ রসিকতা

জন্ম সাল-১৮৬৩

মৃত্যু সাল-১৯০২

নখ কাটার গল্প

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন রসিক মানুষ। সময়ে অসময়ে তিনি বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতায় মেতে উঠতেন।

একবার স্বামী বিবেকানন্দ গেছেন আমেরিকার চিকাগো শহরে। বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে যোগ দিতে। সেখানে তিনি উঠেছেন জর্জ হেলের বাড়িতে। স্বামীজী বেশ কিছুদিন হাত, পা-এর নখ কাটার সময় পাননি বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে। নখ কাটতে হবে —তাই তিনি একটি পেনসিল কাটার ছুরি চাইলেন জর্জ হেলের কন্যাদের কাছে। তারা জিগ্যেস করল, 'ছুরি দিয়ে কী করবেন?'

স্বামীজী বললেন,' হাত পায়ের নখ বড় হয়েছে, কাটবো।'

স্বয়ং স্বামীজী নখ কাটার জন্য ছুরি চেয়েছেন! কে আগে এনে দিতে পারে—এ নিয়ে জর্জ হেলের কন্যাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি লেগে গেল। শেষমেষ একটি মেয়ে ছুরি এনে 'কই দিন, আমিই নখ কেটে দিই'—বলে গালিচার ওপর পিছনদিকে পা মুড়ে বসল। তারপর ভক্তিভরে অতি সন্তর্পণে পায়ের বুট ও মোজা খুলে নখ কাটতে লাগল। কী নখ কাটার ধরন! এই নখ কাটে, তো সেই নখ কাটে। কখনো পা হাঁটুর ওপর রেখে আস্তে নখ কাটে, কখনো পা গালিচায় রেখে নখ চাঁচে, কখনো সে নিজেই প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে মাথা নিচু করে। বিবেকানন্দের যেন ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। অনেকক্ষণ পর নখ কাটা শেষ করে পায়ে জুতো-মোজা পরিয়ে দিয়ে যন্ত্রপাতি গুটিয়ে মেয়েটি বিবেকানন্দের সামনে হাত পেতে বলল,' স্বামীজী, কই দাম দিন, আপনার নখ কেটে দিলাম যে, আমরা আমেরিকানরা দাম না পেলে কোনো কাজ করি না। নাপিতের দোকানে •খ কাটলে আপনাকে দু-তিন ডলার দিতে হতো। আমি ঘরে বসে কেটেছি, কমসম করে এক ডলার দিলেই চলবে। কই দিন, দিন।'

মেয়েটির কথা শুনে হাসলেন স্বামীজী। তারপর বললেন, 'বুঝলাম, কিন্তু এই যে তুমি আমার পা ছোঁয়ার ও নখ কাটার অধিকার পেয়েছ, এর জন্য কী দেবে আমাকে? যে সে আমার পা ছুঁতে পারে না। আমার পা ছুঁলে প্রণামী দিতে হয়। পোপদের পা ছুঁলেও টাকা দিতে হয় শুনেছি। এবার বলো তুমি কী করবে, কত টাকা প্রণামী দেবে আমাকে?

স্বামী বিবেকানন্দের কথা শুনে মেয়েটি দু'চোখ গোলগোল করে বলল,' বাব্বা! কাজও করবো আবার টাকাও দেবো?' — এই বলে মেয়েটি ছুটে ভেতরে চলে গেল। কাণ্ড দেখে হেসে উঠলেন জর্জ হেল ও তাঁর অন্য মেয়েরা। হাসলেন বিবেকানন্দও।

টাকা নয়, স্বামীজী ওই মেয়েটিকে পরে একটি সুন্দর উপহার এনে দিয়েছিলেন।

গো-মাতার সন্তান

'গোরক্ষিণী' সভার সম্পাদক গিরধারীলাল একদিন স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বিবেকানন্দ তখন মনোযোগ সহকারে একটি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছিলেন। গিরধারীকে দেখে তিনি হাসিমুখে আলাপ শুরু করলেন ও জিগ্যেস করলেন, 'মশাই, আপনাদের সভার উদ্দেশ্য কী?'

স্বামীজীর প্রশ্ন শুনে উৎসাহিত হয়ে গিরধারীলাল বললেন, 'স্বামীজী আমরা বিভিন্ন জায়গায় পিজরাপোল স্থাপন করেছি।'

বিবেকানন্দ জিগ্যেস করলেন,' কী করা হয় ওখানে?'

গিরিধারী বললেন,' জরাগ্রস্থ, দুর্বল, রুগ্ন গো-মাতাদের আমরা সেখানে রেখে লালন-পালন করি।এর সঙ্গে কসাইরা তাদের যাতে আর জবাই না করতে পারে তার ব্যবস্থাও করি।'

বিবেকানন্দ গম্ভীর মুখে বললেন,' আপনাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই সৎ। সাধুবাদ না জানিয়ে পারা যায় না। কিন্তু এই যে মধ্যভারতে শুনলাম অনাহারে প্রায় নয় লক্ষ মানুষ মারা গেছে, এই দুর্ভিক্ষ নিবারণে আপনারা কত টাকা সাহায্য করেছেন?'

বিবেকানন্দের কথা শুনে গিরধারী আমতা আমতা করে বললেন, 'আজ্ঞে, আমরা দুর্ভিক্ষে সাহায্য করি না। গো-মাতাদের রক্ষা করাই আমাদের পরম ধর্ম।'

শুনে মাথা গরম হয়ে গেল বিবেকানন্দের। তিনি বললেন,' কী বলেন মশাই,গো-মাতাদের রক্ষা করাতেই শুধু আপনাদের ধর্ম! আর প্রায় মরতে বসা মানুষের মুখে একমুঠো অন্ন তুলে দেওয়া বুঝি আপনাদের ধর্ম নয়?'

গিরধারী অজুহাত দিয়ে বললেন, 'নিজের পাপে, নিজের কর্মফলের জন্যই তো মানুষ মরছে!'

স্বামীজী পাল্টা বললেন, 'আর গো-মাতারা? তারাও তো নিজেদের কর্মফলের

জন্যই কসাইয়ের হাতে পড়ে! তবে কী দরকার তাদের বাঁচিয়ে?'

গিরধারী পুরোপুরি মানতে চান না। তিনি বলেন,' স্বামীজী, আপনি যা বলছেন তা একদম ফেলে দেবার নয় তা মানছি, কিন্তু শাস্ত্রে আছে গাভী আমাদের মাতা। এবার কী বলবেন?'

বিবেকানন্দ বুঝলেন অবুঝের সঙ্গে আলোচনা বা তর্ক করে লাভ নেই। শেষে তিনি হেসে রসিকতা করে বললেন,' হ্যাঁ, ঠিকই, গাভী যে আপনাদের মাতা তা আমি বেশ বুঝতে পারছি! তা না হলে এমন সব ছেলে কেন জন্মাবে?'

গিরধারী বিবেকানন্দের রসিকতার অর্থ বুঝলেন ও সুড়সুড় করে মাথা নামিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সিঁথে কেটে গান

স্বামী বিবেকানন্দ সচরাচর সিঁথে মাথার সামনের দিকের মাঝখানে কাটতেন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত সিঁথে কাটতেন মাথার বাঁ দিকে। একদিন স্বামীজীর ইচ্ছে হল মহেন্দ্রর মত সিঁথে কাটতে। তো তিনি মাথার বাঁদিকে সিঁথে কাটলেন। যখন দুজনে মুখোমুখি খাবার টেবিলে বসলেন, তখন মহেন্দ্র দেখলেন স্বামীজী অন্য রকমভাবে অর্থাৎ মাথার বাঁ দিকে সিঁথে কেটেছেন। হেসে উঠলেন মহেন্দ্র! সঙ্গে স্বামীজীও তাদের খাবার ঘরের রাস্তার দিকের জানলার পুরোটাই একটা বড় কাঁচ দিয়ে ঢাকা। অতএব তাঁরা দু'জনেই খেতে খেতে রাস্তার লোকজনদের দেখতে পাচ্ছিলেন। রাস্তার মানুষজনদের দিকে দেখতে দেখতে স্বামীজী একটি মজার গান গেয়ে উঠলেন:

'ছাতি হাতে টুপি মাথায় আসছে যতো ছুঁড়ি।
মুখে মেখেছে তারা ময়দা ঝুড়ি ঝুড়ি।'

এই কৌতুকপূর্ণ গান শুনে মহেন্দ্র হেসে উঠলেন!

গাধার স্বশ্রেণী

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন সকালে গল্পগুজব করছিলেন মিস্টার গুডউইন ও মিস্টার স্টার্ডির সঙ্গে। ধর্মালোচনা নয়,আড্ডার আসরে বিবেকানন্দ রঙ্গরসিকতা করতে বেশি পছন্দ করতেন। কথা প্রসঙ্গে গুডউইন হঠাৎ বলে উঠলেন,' জানেন তো, কোনো মানুষ যখন কোনো গাধাকে প্রহার করে আমার খুব রাগ হয়!'

গুডউইনের কথা শুনে পিঠোপিটি বিবেকানন্দ বলে উঠলেন,' ঠিকই বলেছেন মশাই, গাধাকে মারতে আপনার আসলে স্বশ্রেণীর প্রতি প্রেম উথলে ওঠে, তাইতো আপনার এত রাগ হয়! নয় কি?'

বিবেকানন্দের কথা শুনে মিস্টার স্টার্ডি হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন।

গুডউইনের মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। তিনি আর বসে থাকতে পারলেন না।'আচ্ছা, আমি এখন আসি,একটা জরুরি কাজ আছে—বলেই উঠে দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

পুরুষের সন্তান প্রসব

সেবার স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় গেছেন বিশ্বধর্ম মহা সম্মেলনে যোগ দিতে। ভারতীয় দেখলেই আমেরিকানরা মুখ বেঁকাতেন। ভারতীয়দের সম্পর্কে তাঁদের ধারনাটাও ছিল অন্যরকম। তাঁরা মনে করতেন, ভারতীয়রা বুঝি গোঁড়া, কুসংস্কারাচ্ছন্ন!

একদিন এক বিদেশীর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ আলাপ করছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে বিদেশীটি বিবেকানন্দকে জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা স্বামীজী, শুনেছি ভারতবর্ষে নাকি শিশু জন্মগ্রহণ করলেই তাকে গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়া হয়?'

বিদেশীটির মুখে এইরকম অশিক্ষিত-প্রশ্ন শুনে স্বাভাবতই স্বামী বিবেকানন্দের মাথাগরম হয়ে গেল। তবু তিনি রাগ সংবরণ করে ঠোঁটে কিঞ্চিৎ হাসি লাগিয়ে বললেন,'আমি কিন্তু বেঁচে গিয়েছি।'

বিদেশীটি থামলেন না। আবার মূর্খের মত প্রশ্ন করলেন বিবেকানন্দকে, ' স্বামীজী, আপনাদের দেশে কন্যা সন্তান জন্মালেই নাকি তাকে কুমীরের মুখে ছুঁড়ে দেওয়া হয়?'

এবার রাগের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। তবু বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ মুখে একগাল হাসি নিয়ে বিদেশীকে বললেন,' আপনি ঠিকই শুনেছেন মশাই, সেই জন্যই তো আজকাল ভারতবর্ষে পুরুষরা সন্তান প্রসব করছে।'

এহেন জবাব পেয়ে সেই বিদেশী আর স্বামী বিবেকানন্দের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস পেলেন না। বিদেশী পরাজিত এক ভারতীয়র কাছে!

সংস্কৃত কবিতা

স্বামী বিবেকানন্দ তখন লণ্ডনে। সেই সময় দেশাই নামে এক গুজরাটী যুবক নিয়মিত তাঁর কাছে আসতেন। দেশাই সংস্কৃত কবিতা লিখতেন। সেই কবিতা তিনি শোনাতেন স্বামীজীকে।

প্রথম প্রথম স্বামীজী কিছু বলতেন না। চুপ করে শুনতেন সংস্কৃত কবিতাগুলি।

কিছুদিন পর এক সকালে দেশাই এসেছেন। সঙ্গে সংস্কৃত কবিতা ভরা খাতা। স্বামীজীকে শোনাবেন—এই আশায়।

স্বামীজী দেশাইকে এবার হাসতে হাসতে বললেন, 'দেশাই এসেছো, বোসো।'

দেশাই বসেই খাতা খুলে সংস্কৃত কবিতা পড়তে শুরু করলেন। একটার পর একটা পড়ে যেতে লাগলেন। শেষমেষ বিবেকানন্দ বলে উঠলেন, 'ওহে এবার থামো—আর শোনো একটা কথা—সংস্কৃত কবিতা লেখার জন্য সাতসমুদ্র তের নদী পার হয়ে ভারতবর্ষ থেকে এই লণ্ডনে আসার কোনো দরকার ছিল না। ওতো বাড়িতে বসেই

হতে পারতো। বরং যে কাজ করতে এসেছ এখানে, যাও মন দিয়ে সে কাজ করোগে।'

দেশাই বুঝলেন, কী কারণে স্বামীজী এই স্পষ্ট কথাগুলি বললেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি তখন খাতা গুটিয়ে নিয়ে স্বামীজীকে প্রণাম করে বললেন,' আমার ভুল হয়ে গেছে, আর এরকম হবে না। যে কাজের জন্য আমি লণ্ডনে এসেছি এবার থেকে মন দিয়ে শুধু সেই কাজটাই করবো।'

খুশী হয়ে স্বামীজী দেশাইকে আশীর্বাদ করলেন।

আসলে কবিতা লেখাকে তিনি অপছন্দ করতেন না। কিন্তু যেখানে যেটা সেখানে সেটা যখন যেটা তখন সেটা করাকেই তিনি প্রধান কাজ বলে মনে করতেন।

রুমাল

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। পথে তিনি দেখেন, এক ব্যক্তি নাকের জল ঝাড়ছেন!

স্বামীজী এগিয়ে এসে ব্যক্তিটিকে বললেন, ' আরে মশাই করেন কী! নাকের জল-নোংরা অমন করে ফেলতে নেই, পকেটে দুটো রুমাল রাখবেন। নাক না ঝেড়ে বরং রুমাল দিয়ে নাক মুছে পকেটে রাখবেন। থুতু-কফও যেখানে সেখানে ফেলতে নেই! অন্যের রোগ হতে পারে!

পরামর্শ দিয়ে বিবেকানন্দ হাসতে হাসতে চলে গেলেন। কিন্তু জ্ঞান লাভ করে ব্যক্তিটি পড়লেন চিন্তায়—তবে কি নাকের জল নোংরা মাখানো রুমাল পকেটে রাখতে হবে! কিন্তু স্বয়ং বিবেকানন্দের কথা অগ্রাহ্য করেন কী করে। তাই তিনি নাকের জল রুমাল দিয়ে মুছে পকেটে রেখে হাঁটতে শুরু করলেন। দূর থেকে এ দৃশ্য দেখে মুচকি হাসলেন বিবেকানন্দও।

চীনে কথা

সন্ন্যাস নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ হননি, তখন তিনি ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তখন তিনি চীনেম্যানদের কথা খুব সুন্দর নকল করতে পারতেন। ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সামনে তিনি খুবই মজা করতেন। চীনেরা 'র'-এর স্থানে 'ল' উচ্চারণ করেন। যেমন 'ব্র্যান্ডি'-এর বদলে 'ব্ল্যাণ্ডি' ইত্যাদি।

তিনি এমন মুখভঙ্গী করে নানারকম কৌতুক করে চীনে-কথা নকল করতেন, যা শুনে আড্ডা আসরের প্রত্যেকে না হেসে থাকতে পারতেন না।

তবে এ ছিল নিছক মজা, চীনেম্যানদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।

ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি

স্বামী বিবেকানন্দের শ্রুতিলিপিকার গুডউইনদের সঙ্গে স্বামীজী মাঝে মাঝেই রঙ্গ

রসিকতায় মেতে উঠতেন। এইসব রঙ্গ রসিকতা উপভোগ করতেন লেখক মহেন্দ্রনাথ দত্ত। একদিন স্বামীজীর মনে হল, মহেন্দ্রর দাড়ি কাটিয়ে আনা দরকার। তো তিনি গুডউইনকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'ওহে, একে এক্ষুনি একটা নাপিতের দোকানে নিয়ে গিয়ে এর দাড়ি ছাঁটিয়ে নিয়ে এসো।'

গুডউইন তখন মহেন্দ্রকে নিয়ে গেলেন বঙ্গাটজ নামক এক জার্মান নাপিতের দোকানে। গুডউইনের কথামতো নাপিত মহেন্দ্রর দাড়ি ছুঁচলো করে বা ফ্রেঞ্চকাট ফ্যাশনে কেটে দিল। মহেন্দ্র বাধ্য ছেলের মত এই অত্যাচার সহ্য করে নিলেন, কিছুটা গুডউইনের ধমকের ভয়ে!

মহেন্দ্র যখন দাড়ি নিয়ে স্বামীজীর সামনে এলেন, তখন স্বামীজী হোঃ হোঃ করে হেসে বলে উঠলেন, 'ছ্যাঃ ছ্যাঃ, এতো চুনোগলির ফিরিঙ্গির মত হয়েছে!'

স্বামীজীর কথাশুনে মুচকি হাসলেন গুডউইন। মহেন্দ্র কী আর করেন! ভেঙচি কাটলেন গুডউইনকে!

সাইকেল

স্বামী বিবেকানন্দ সাইকেল চড়া শেখাচ্ছিলেন সারদানন্দকে। সারদানন্দ স্বামী ছিলেন স্থূলকায় পুরুষ। ইচ্ছা ছিলনা, একপ্রকার বিবেকানন্দের চাপে পড়ে সাইকেলে চড়লেন বটে, তবে দুপাশে দুজনকে রাখলেন, যাতে পড়ে না যান!

দূর থেকে এক মালী এ দৃশ্য দেখে হাসছিল। বিবেকানন্দ রসিকতা করে বললেন, 'আমাদের সাইকেলে চড়া দেখে মালী ছোঁড়া যে হাস করছে! তাদের বল্ হাস করছস্ ক্যান্?'

বিবেকানন্দের কথাশুনে নার্ভাস সারদানন্দও হেসে ফেললেন।

প্রধান পণ্ডিত

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন অধ্যাপক ম্যাকস্মুলারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন সারদানন্দ স্বামী।

অধ্যাপক ম্যাকস্মুলারের সঙ্গে তাঁরা কী কথাবর্তা বলেছিলেন সে কথা কাউকে বলেননি ঠিকই, কিন্তু বিবেকানন্দ ম্যাকস্মুলাদের কণ্ঠস্বর নকল করে ঘনিষ্ঠ মানুষদের সামনে কথা বলতেন। অন্যের কথা, কণ্ঠস্বর খুব সহজে নকল করার ক্ষমতা ছিল বিবেকানন্দের। তিনি বলতেন,' ম্যাকস্মুলার ভালো ইংরেজি জানেন, কিন্তু তাঁর উচ্চারণ জার্মানদের মতো খুব ভালো নয়। তবে তিনি ছিলেন ইউরোপের মধ্যে প্রধান পণ্ডিত।'

বিবেকানন্দ মাঝে মাঝেই বলতেন 'নাইশ ম্যান'। স্বামীজীর কণ্ঠে অন্যের নকল কথা ও কণ্ঠস্বর শুনতে তাঁর ঘনিষ্ঠজনরা খুব পছন্দ করতেন ও মজা পেতেন।

আশুতোশ মুখোপাধ্যায়ের রঙ্গ রসিকতা

জন্ম সাল-১৮৬৪
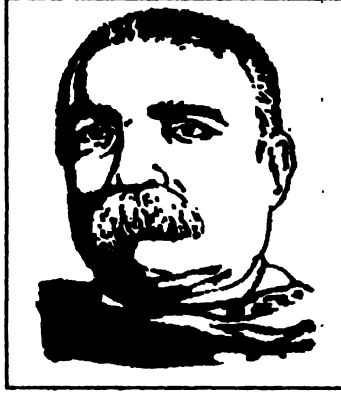
মৃত্যু সাল-১৯২৪

ধামা ধরা

'বাংলার বাঘ' স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যেমন সন্দেশ খেতে ভালোবাসতেন, তেমনই ভালোবাসতেন অন্যদের সঙ্গে রসিকতায় মেতে উঠতে। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রসভারি মানুষটির আড়ালে এক রসিক মানুষকে মাঝেমাঝেই দেখতে পেতেন তাঁর ঘনিষ্ঠরা। গুচ্ছ গোঁফের আড়ালে তিনি ফিক ফিক করে মুচকি হাসতেন।

একবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কৃষ্ণলাল দত্তর কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রিত হয়ে যান স্যার আশুতোষ সহ আরও কয়েকজন। প্রত্যেকেই উপহার তুলে দিয়েছেন কৃষ্ণলালের কন্যার হাতে। তারপর অপেক্ষা, কখন খাবার ডাক আসে। এমন সময় স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশিষ্ট কর্মচারীকে রসিকতা করে বললেন, 'কী হে, তোমরা কি এখানে শুধু মাত্র নিমন্ত্রণ খেতেই এসেছ? যাও কাজকর্ম করো গে এবং সত্যসত্যই ধামা ধরোগে!'

আশুতোষের মুখে এই কথা শুনে প্রত্যেকে হেসে উঠলেন।

তোষ প্রসাদ

একদিন সকালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঘরে বসে একথালা সন্দেশ খাচ্ছিলেন তৃপ্তি সহকারে । সেই সময় তাঁর এক ভক্ত প্রবেশ করলেন। আশুতোষ তাঁকে দেখে বললেন, ' ওহে সন্দেশ খাও।'

ভক্তটি একটি সন্দেশ মুখে পুরে খেতে খেতে কথায় কথায় বললেন, ' স্যার, শুনলাম আপনার সঙ্গে নাকি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মনোমালিন্য হয়েছে? এটা কি ঠিক

কথা?'

আশুতোষ সন্দেশ খেতে খেতেই বললেন, " এ সব কথা কে বলল? আমি আমার ছেলেদের নামের মধ্যে ওঁর 'প্রসাদ' জুড়েছি, উনি তাঁর পুত্রদের নামের মধ্যে আমার 'তোষ' ঢুকিয়েছেন। এতেও মনে হয় দুজনের মনোমালিন্য হয়েছে?"

এই উত্তর শুনে ভক্তটি হেসে ফেললেন ও আর একটি সন্দেশ খেতে শুরু করলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আশুতোষের একটি পুত্রের নাম শ্যামাপ্রসাদ। যিনি জনসঙেঘর' প্রতিষ্ঠাতা।

জুতো বনাম কোট

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একবার ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় চেপে মধুপুর থেকে কলকাতায় ফিরছিলেন। সেই কামরায় ছিলেন এক সাহেব। কোনও নেটিভ সেই কামরায় বসে যাত্রা করেন—এটা সাহেবের পছন্দ ছিল না, তা তিনি হাবে ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

কিন্তু স্যার আশুতোযও বাংলার বাঘ। তিনিও ছেড়ে দেবার পাত্র নন। দুবার বড় হাই তুলে কোন কিছু গ্রাহ্য না করে জুতো জোড়া খুলে তিনি নিজের বার্থে শুয়ে নাক ডেকে ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন ঘুম ভাঙল দেখলেন তাঁর জুতো জোড়া নেই! তিনি বুঝলেন এটা কার কাজ। সাহেব তখন ঘুমোচ্ছিলেন। দেরি না করে আশুতোষ তখন হুক থেকে সাহেবের কোটটি খুলে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন। কিছু পরে ঘুম ভাঙল সাহেবের। দেখলেন, কোটটি নেই।

'কোথায় গেল আমার কোট?' সাহেব রেগে জিগ্যেস করলেন আশুতোষকে। আশুতোষ নম্রভাবে হাসতে হাসতে বললেন, 'মশাই, তার আগে আমি জানতে চাই আমার জুতো কোথায়?'

সাহেব বললেন, 'ওহে নেটিভ, তোমার জুতো বাইরে হাওয়া খেতে গেছে!'

আশুতোষ তৎক্ষনাৎ হেসে উত্তর দিলেন, ' তোমার কোট আমার জুতো খুঁজে আনতে গেছে, বুঝলে সাহেব?'

এক 'নেটিভ' বাঙালির এহেন স্পর্ধা দেখে অবাক হয়ে গেলেন লালমুখো সাহেব।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কখনও কাউকে ভয় করতেন না। তিনি নিজে বাঙালি বলে গর্ব অনুভব করতেন। লাল মুখো ইংরেজ সাহেবদের তিনি দুচোখে সহ্য করতে পারতেন না। বরং ইংরেজরাই তাঁকে সমীহ করে চলতেন।

দীর্ঘ গুম্ফযুক্ত

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল অধ্যাপক দেবদত্ত ভাণ্ডারকর একদিন সকলের সামনে হাসতে হাসতে বললেন, 'জানেন, তক্ষশীলা নগরে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেকটর জেনারেল একখানি নতুন রজতপত্র আবিষ্কার করেছেন। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের শিলালিপিপাঠক তা পাঠ করে বলেন—এটা পুরানের অংশ। ওতে যে ঘটনাটি লেখা আছে তা হল—

" একদা রম্ভা, ঊর্বশী বা মেনকা ইন্দ্রের সভায় নাচ করছিলেন। সেই সভায় দুর্বাসা ও সরস্বতী উপস্থিত ছিলেন। যে অপ্সরা নৃত্য করছিলেন, তাঁর নৃত্যের কিঞ্চিৎ দোষ ঘটায় সরস্বতী তাই দেখে অবজ্ঞায় হেসেছিলেন। তা দেখে দুর্বাসা ক্রুদ্ধ হয়ে সরস্বতীকে শাপ দেন—তুই কলিযুগে গঙ্গাতীরে ভবানীনগরে দীর্ঘগুম্ফযুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করবি। অতএব কলিযুগে গঙ্গাতীরে ভবানীনগরে দীর্ঘ গুম্ফযুক্ত সরস্বতী উপাধিধারী যে পুরুষ কলকাতার বিদ্যাপীঠের সর্বাধিকারী তিনি কমলদলবাসিনী শুভ্রাভা দেবী বীনাপাণির পূর্ণ অবতার।"

এই কাহিনীটি পড়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব মত প্রকাশ করেন-- "যে ঋষি শাপ দিয়েছিলেন তিনি দুর্বাসা নন, ভরদ্বাজ। অভিসম্পাৎ ছিল মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করা, কিন্তু সরস্বতী অভিশপ্ত হয়ে করুণ অনুনয় বিনয় করলে ঋষি তাঁকে বললেন—আচ্ছা, তোমাকে এই বর দিলুম যে অজ্ঞানপূর্ণামর্ত্যলোকে তুমি বিদ্যাবিস্তার করবে। দেবী প্রত্যুত্তরে বলেন—ঠাকুর. আমি স্ত্রী লোক, আমি তা কিরূপে সমর্থ হব? তখন ঋষিবর বলেন—তবে আমার বরে তুমি পুরুষ হবে ও আমারই বংশে জন্মগ্রহন করবে।"

স্যার আশুতোষের এই মজার মন্তব্য শুনে সকলেই হেসে ওঠেন।

রাসভারি আশুতোষকে দেখে সাধারণ মানুষ ভাবতেও পারতেন না তিনি কত বড় রসিক। যাঁরা তাঁর কাছে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরা বুঝেছিলেন ও চিনেছিলেন রসিক আশুতোষকে। তাঁর মন ছিল রঙ্গ রসিকতায় ভরা।

রজনীকান্ত সেনের রঙ্গ রসিকতা

জন্ম সাল-১৮৬৫
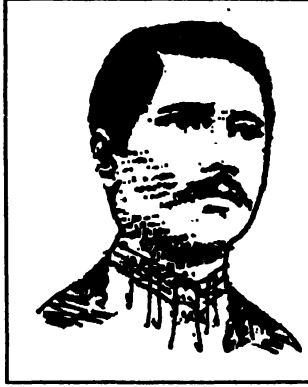
মৃত্যু সাল-১৯১০

চাষীর স্ত্রীর বয়স

বিখ্যাত স্বদেশীগান 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নেরে ভাই'-এর রচয়িতা কবি রজনীকান্ত সেন 'কান্তকবি' নামেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাবগ্রন্থ 'বাণী কল্যাণী'। কবি রজনীকান্ত সেন পেশায় ছিলেন উকিল। উকিলদের আড্ডার আসরে তিনি চমৎকার সব গল্প বলতেন। তাঁর মজার গল্প শুনতে উকিল বন্ধুদের উৎসাহ ছিল দেখার মত। এক আড্ডার আসরে রজনীকান্ত শোনান—

একজন চাষী মক্কেল এসেছে এক উকিলের কাছে। উকিল চাষীকে জিগ্যেস করল, 'বিয়ের সময় কত বয়স ছিল তোমার?'

চাষীটি সবিনয় জানাল ' আজ্ঞে সতের বছর।' উকিলটি আবার জিগ্যেস করল, ' তখন তোমার স্ত্রীর বয়স কত ছিল?'

চাষীটি বলল, 'বারো বছর।' উকিল আবার জানতে চাইল, 'এখন তোমার বয়স কত?' চাষী মাথা চুলকে বলল, ' তা বাবু, ত্রিশ-বত্রিশ বছর তো হবেই।'

উকিল বললেন, ' তোমার স্ত্রীর বয়স তাহলে এখন কত হবে?'

চাষী একটুও চিন্তা না করে বললেন, ' হ্যাঁ, তা প্রায় সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ তো হবেই।'

উকিল অবাক হয়ে গিয়ে বলল, ' সে কী কথা! তোমার স্ত্রী হঠাৎ তোমার থেকে বড় হয়ে গেল কী করে?'

চাষী এবার আমতা আমতা করে বলল, 'আজ্ঞে বাবু, ঐ কথাটাই আমি আজ পর্যন্ত কাউকে বোঝাতে পারলাম না যে, স্ত্রীলোকের বাড় বড় বেশি।'

রজনীকান্তর মুখে এ রকম মজার মজার গল্প শুনে তাঁর অন্য উকিল বন্ধুরা খুব মজা

পেতেন। কবি সব সময় রঙ্গ রসিকতায় মেতে থাকতে ভালবাসতেন।

চাচার দাড়ি

কবি রজনীকান্ত সেন একদিন রাজসাহীর বাড়ির বৈঠকখানায় বসে কবিতা লিখছিলেন। এমন সময় এক গোঁড়া মুসলমান মক্কেল তাঁর কাছে এলেন। বৈঠকখানা ঘরে থাকত একটা ব্রাস, চিরুনি আর একটা আয়না। মুসলমান মক্কেল তাঁর কাগজপত্র এগিয়ে দিলেন রজনীকান্তের দিকে। তা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রজনীকান্ত। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর তিনি দেখলেন, মুসলমান মক্কেলটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে চুল আঁচড়ানোর ব্রাসটি দিয়ে তাঁর মেহেন্দি করা লালচে দাড়ি যত্ন সহকারে আঁচড়াচ্ছেন। দেখে রজনীকান্ত হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথায় একটি দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি মক্কেলটিকে হাসতে হাসতে বললেন, ' চাচা, আপনি যে ব্রাসটি দিয়ে আপনার দাড়ি আঁচড়াচ্ছিলেন, জানেন ওটা কোন জানোয়ারের রোঁয়ায় তৈরী?'

মুসলমান মক্কেল দ্রুত হাত থেকে ব্রাসটি নীচে নামিয়ে রেখে জানতে চান,' কোন জানোয়ারের?' রজনীকান্ত গম্ভীর মুখে বললেন, ' হুঁ হুঁ, যার নাম শুনলে আপনারা কানে আঙুল দেন।'

এই কথা শুনে মুসলমান মক্কেলটি, ' হায় আল্লা! তোবা, তোবা'— ব'লে টান দিয়ে দাড়ি ছিঁড়তে লাগলেন। প্রকাশ্যে নয়, রজনীকান্ত কাণ্ড দেখে মনে মনে হাসতে লাগলেন।

পুত্রবধু ও শাশুড়ি

বিয়ের দু-তিন বছর পরেও কবি রজনীকান্ত সেনের স্ত্রী শাশুড়িকে 'মা' বলে ডাকতেন না। এই জন্য রজনীকান্তর মা ছেলেকে একদিন দুঃখ করে বলেই ফেললেন, ' আমার একমাত্র পুত্রবধু, দুঃখের কথা সেও আমাকে মা বলে না!'

রজনীকান্তর স্ত্রী শাশুড়িকে আপনি, আসুন, বসুন, খান, নেবেন, দিন—এই ভাবে সম্বোধন করতেন।

রজনীকান্ত একান্তে তাঁর স্ত্রীকে অনেক বোঝালেন, ' আমার মা তো তোমারও মা, উনাকে মা বলে ডাকবে, বুঝলে?'

কিন্তু বোঝালেও কোনো ফল হল না। কী করা যায়! কী ভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়! অনেক ভেবে তিনি একটা কৌশল বের করলেন, যাতে জোর করে হুকুমও করতে হবে না বা হিতে বিপরীতও হবে না।

রজনীকান্ত একদিন নৌকো করে ভাঙাবাড়ি থেকে রাজসাহী চলেছেন মা ও স্ত্রীকে

সঙ্গে নিয়ে। হঠাৎ নৌকো কাত হয়ে গেল, 'কবি উল্টে জলে পড়ে গেলেন! হৈ হৈ করে উঠল মাঝিমল্লারা। 'ডুবে গেল' বলে কবিকে খুঁজতে কেউ জলে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু কই! কবিকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তখন কবির স্ত্রী শাশুড়ির পা দুটো ধরে কাঁদতে লাগলেন 'মা আমার সার্বনাশ হয়ে গেল! মা এখন কী হবে! এ কী হল মা!'—এই সব ব'লে।

ঘটনা হল—রজনীকান্ত কিন্তু ডোবেন নি। তিনি জল থেকে অন্যদিক দিয়ে নৌকায় উঠে একপাশে বসে চুপচাপ মজা দেখছিলেন। শেষে গামছা দিয়ে ভিজে শরীর মুছতে মুছতে তাঁর স্ত্রীকে বললেন, ' কী গিন্নি, এবার আর আমার মাকে মা বলে ডাকতে অসুবিধা হবে না তো? বেশ তো দেখলাম মা মা বলে কাঁদছিলে!'

একথা শুনে কবির স্ত্রী লজ্জা পেয়ে গেলেন এবং 'মা' বলে শাশুড়ির পা ধরে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। শাশুড়ি খুশি হয়ে আশীর্বাদ করলেন পুত্রবধূকে। এভাবে দারুণ বুদ্ধি খাটিয়ে সমস্যার সমাধান করলেন কবি রজনীকান্ত।

রোগা গরু মোটা গরু

কবি রজনীকান্ত সেন ছিলেন বিখ্যাত উকিল। কিন্তু তিনি উকিলদের আড্ডায় বসে উকিলদের নিয়েই ঠাট্টা তামাসা করতেন। অন্য উকিলরা তা উপভোগ করতেন। একদিন রজনীকান্ত এক মজার গল্প শোনান—

একজন রাখাল একদিন দুটো গরু নিয়ে মাঠে চলেছে। দুটো গরুর মধ্যে একটা রোগা, আরেকটা মোটা। সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক উকিল। রাখালকে উকিলটি জিগ্যেস করলেন, ' হ্যাঁরে, তোর এই গরুটা এত রোগা আর অন্য গরুটা এত মোটা কেন?'

প্রশ্ন শুনে মাথা চুলকে রাখালটি বলল, ' বাবু, মোটা গরুটা হল উকিল আর রোগা গরুটা হল তার মক্কেল। বুঝলেন?'

রজনীকান্তর মুখে এই ধরনের গল্প শুনতে তাঁর অন্য উকিল বন্ধুরা খুব মজা পেতেন।

অমৃত নিয়ে যান

কবি রজনীকান্ত সেন এক সকালে বসে কবিতা লিখছিলেন। সেই সময় তাঁর বাড়িতে এলেন আর এক কবি রসময় লাহা । রসময় তাঁর সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'ছাইভস্ম' রজনীকান্তকে উপহার দিয়ে বললেন, ' এই নিন, আমার ছাইভস্ম।'

রজনীকান্তর 'অমৃত' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ সবে মাত্র বেরিয়েছে। 'ছাইভস্ম' বইটি নিয়ে রজনীকান্ত তাঁর 'অমৃত' বইটি রসময় লাহাকে উপহার দিয়ে রসিকতা করে

বললেন, ' ছাইভস্ম দিয়ে অমৃত নিয়ে যান।'

আরাম

কবি রজনীকান্ত একবার রোগ শয্যায় শুয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। কবি রসময় লাহা তাঁর 'আরাম' গ্রন্থখানি সেই সময় রজনীকান্তকে উপহার দিয়ে যান। উপহার পেয়ে খুশি হয়ে রজনীকান্ত রসময়কে মজা করে বলেন, ' আমার এই ব্যয়রামে বেশ আরাম দিলেন।'

পঞ্চম পুত্রের নাম

রজনীকান্ত সেন তাঁর উকিল বন্ধুদের নামকরণ নিয়ে একটি মজার গল্প শুনিয়েছিলেন। সেটা হল—এক পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে এলেন একজন ভদ্রলোক। তিনি পুত্রের নামকরণ নিয়ে খুব চিন্তায় পড়েছেন। তাই পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে জানতে চাইলেন, ' আমার প্রথম পুত্রের নাম জগৎপতি, দ্বিতীয় পুত্রের নাম লক্ষ্মীপতি, তৃতীয় পুত্রের নাম শচীপতি, চতুর্থ পুত্রের নাম ধরাপতি। সম্প্রতি আমার আর একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। আপনি বলুন, আমার এই পঞ্চম পুত্রের কী নাম রাখা যায়?' পণ্ডিতমহাশয় গম্ভীর হয়ে শুনে বললেন, 'চিন্ত কিসের? এই ছেলের নাম রাখুন ভগ্নিপতি!, রজনীকান্তর মুখে এরকম মজার গল্প শুনে উকিল বন্ধুরা হোঃহোঃ করে হেসে ওঠেন।

কুলীন বন্ধুর বিবাহ

একবার এক কুলীন বন্ধুর বিবাহে বরযাত্রী হয়ে যান কবি রজনীকান্ত সেন। বন্ধুর এটি ছিল দ্বিতীয় বিবাহ। বিবাহের পরের দিন সকালে বর নববধূকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তখন রজনীকান্তও সঙ্গে ছিলেন। মাঝপথে নববধূ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হলেন। জ্বর প্রায় ১০৩ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠল। বরের মুখে নববধূর ১০৩ ডিগ্রি জ্বরের কথা শুনে রজনীকান্ত রসিকতা করে ছড়া কেঁটে বললেন, 'নববধূর বাড়িতেও এক সতীন, আবার পথেও ১০৩!' এ কথা শুনে রজনীকান্তর বর বন্ধু এই পরিস্থিতিতেও না হেসে পারলেন না।

দিলে খেলে পেলে

রাম ভাদুড়ী মহাশয় একদিন কান্তকবি রজনীকান্তকে বললেন, ' ও রজনী, শুনলাম তুমি নাকি কাল কোন একটা বিয়েবাড়িতে গিয়েছিলে। বিয়েতে যে গেলে, তা দিলে কী? খেলেই বা কী? পেলেই বা কী?' উত্তরে রজনীকান্ত হেসে রসিকতা করে বললেন, 'আজ্ঞে, দৌড় দিলাম, আছাড় খেলাম, ব্যথা পেলাম!' এ কথা শুনে রাম ভাদুড়ী হেসে উঠলেন।

হাঁসের ডিম

রাজশাহীর বাড়িতে রজনীকান্ত একদিন কতগুলি হাঁসের ডিম এনে ঘরের এক কুলুঙ্গিতে রেখে দেন। এবং সেটা কাউকে না জানিয়েই। পরের দিন কবি তাঁর স্ত্রীর কাছে ডিম চাইলেন। স্ত্রী জানতে চাইলেন, ' হ্যাঁ গো, ডিমগুলো কোথায়?'

রজনীকান্ত হেসে উত্তর দিলেন, ' উঁচুতে রেখেছি, যাও পেড়ে আনো।'

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রঙ্গ রসিকতা

জন্ম সাল-১৮৭৬ মৃত্যু সাল-১৯৩৮

বারোটা বাজেনি

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে তখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। একটার পর একটা প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলি। লেখকদের নামের সঙ্গে ও লেখার সঙ্গে সাধারণ মানুষ যতটা পরিচিত ততটা চেহারার সঙ্গে নয়। তাই শরৎচন্দ্র প্রমুখ লেখকরা নিজেদের ইচ্ছেমত বাইরে বের হতেন। পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেলেও সাধারণ লোকেরা বুঝতেও পারতেন না—ইনিই সেই বিখ্যাত সাহিত্যিক!

একদিন শরৎচন্দ্র হাওড়া ব্রিজ পার হচ্ছেন পায়ে হেঁটে। হাঁটছেন, কিন্তু মাথায় ঘুরছে নতুন উপন্যাসের প্লট। স্বভাবতই একটু অন্যমনস্ক। কবি-সাহিত্যিকরা সচরাচর যে রকম হন আরকি। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, কাঁধে ব্যাগ। ব্যাগে নতুন লেখা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। কলকাতার একটি বিখ্যাত পত্রিকা অফিসে যাচ্ছেন। গঙ্গার স্রোত, ফুরফুরে হাওয়া। এমন সময় ঘটল এক কাণ্ড। কী কাণ্ড?

একজন কমবয়সী পকেটমার হঠাৎ হাত বাড়াল তাঁর বুক পকেট থেকে চেনশুদ্ধ ঘড়িটা ছিনিয়ে নেবার জন্য। বুঝতে পেরে শরৎচন্দ্রও সঙ্গে সঙ্গে খপ্ করে ধরে ফেলেন পকেটমারের হাতটা। চালাক পকেটমার ভয় না পেয়ে জিগ্যেস করে,'স্যার, আপনার ঘড়িতে ক'টা বাজে?'

শরৎচন্দ্র তখন পকেটমারের পিঠে সজোরে দুম করে একটা গুমসো কিল মেরে বলেন, ' একটা'।

কিল হজম করে 'উরিব্বাবা!' বলে লাফিয়ে ওঠে পকেটমার, তারপর বলে, ' ভাগ্যিস বারোটা বাজেনি! না হলে আজ আমার দফারফা হয়ে যেত।'

এই বলে সে ছুটে পালাল হাওড়া স্টেশনের দিকে। পকেটমারকে জব্দ করে হাসতে হাসতে আবার হাঁটতে লাগলেন শরৎচন্দ্র।

বেতো ঘোড়া

সাহিত্যিকরা তো আর সবসময় লেখালেখি করেন না। মাঝেমাঝে অন্যকাজেও সময় কাটান। শরৎচন্দ্রও তেমনই মাঝেমাঝে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন, কখনো দাবা খেলতেন। একদিন শরৎচন্দ্র সন্ধেবেলায় তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে দাবা খেলছিলেন। দাবা তাঁর খুব প্রিয় খেলা। খেলতে খেলতে তিনি একটা দারুণ চাল দিয়ে তাঁর বন্ধুর নৌকাটা তুলে নিলেন, বন্ধুটি হেসে বললেন,' ভালোই করেছ বন্ধু, আমার নৌকাটা ফুটো ছিল।'

খেলা জমে উঠেছে। বন্ধুটি এর কিছুক্ষণ পর দারুণ একটা চাল দিয়ে তুলে নিলেন শরৎচন্দ্রের ঘোড়াটি। কিন্তু শরৎচন্দ্র হার না মেনে রসিকতা করে বন্ধুকে বললেন, 'বুঝলে বন্ধু, আপদ গেছে বেশ হয়েছে। আমার ঘোড়াটি বেতো ঘোড়া। বেতো ঘোড়া নিয়ে তো যুদ্ধে জেতা যায় না। কী বলো?'

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে বন্ধুটি দাবার চাল দিতে দিতে হেসে উঠলেন।

জীবনের ভালো-মন্দ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত স্নেহ করতেন শরৎচন্দ্রকে। শরৎচন্দ্র নিয়মিত যেতেন গুরুদেবের কাছে। বিভিন্ন আলাপ আলোচনা করতেন। একদিন রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে হাসতে হাসতে বললেন, ' শরৎ, তোমার জীবন সম্পর্কে লোকের বড় কৌতূহল। আমার জীবনস্মৃতির মত তুমিও তোমার জীবনের কথা লেখো। সেই লেখা পড়ে বাংলার পাঠকসমাজ তোমার জীবন সম্বন্ধে জানতে পারবে। লেখো।'

উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন,' গুরুদেব সেটা বোধহয় সম্ভব নয়। কারণ আমার জীবন তো আপনার মত ভালো নয়। আগে থেকে বুঝতে পারিনি এত বড় হবো, তবে না হয় একটু বুঝে সমঝে ভালো হয়ে চলতাম। তা তো হয়নি। তাই এই জীবনে আমার আর জীবনী লেখা ঠিক হবে না।'

শরৎচন্দ্রের উত্তর শুনে রবীন্দ্রনাথ গোঁফের ফাঁকে মুচকি হাসলেন।

আপনাদের জন্য আমাদের জন্য

মানুষ বিখ্যাত হয়ে গেলে স্তাবক জোটে, চাটুকার জোটে। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তাঁর কাছে নিয়মিত বিভিন্ন লোক আসা-যাওয়া করতেন। শরৎচন্দ্র অবশ্য বিশেষ কয়েকজন ছাড়া বাকিদের বেশি আমল দিতেন না। কিন্তু মুখেও কিছু বলতেন না। একদিন সকালে শরৎচন্দ্র উপন্যাস লিখছিলেন। এমন সময় কয়েকজন কাশতে কাশতে ঢুকলেন শরৎচন্দ্রের ঘরে। লেখা বন্ধ হয়ে গেল শরৎচন্দ্রের। কিন্তু কী করেন। কাউকে তাড়িয়ে দেওয়া তো যায় না। অতিথিদের বসতে বললেন তিনি। অতিথিরা সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা জুড়ে দিলেন। বিভিন্ন কথা উঠছে। শরৎচন্দ্র হুঁ হুঁ করে উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই শরৎচন্দ্রের ভক্ত। স্তাবক বলাই ভাল। উঠল রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ। স্তাবকদের দল শরৎচন্দ্রের প্রশংসা করার পাশাপাশি বলে উঠলেন, ' দেখুন শরৎচন্দ্রবাবু, রবি ঠাকুরের লেখা বড় দুর্বোধ্য। আপনার লেখা বরং আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু রবি ঠাকুরের অধিকাংশ লেখায় আমরা দাঁত ফোটাতে পারি না।'

এতক্ষণ শরৎচন্দ্র চুপচাপ হুঁ হুঁ করে উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিছু আর থাকতে পারলেন না। এবার মুখ খুললেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'মহাশয়েরা, আপনাদের সব কথা শুনলাম। রবীন্দ্রনাথের লেখা সম্পর্কে আপনাদের অভিমতও শুনলাম। আসলে আমার অভিমত হল—আমি যা লিখি তা আপনাদের জন্য, আর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ যা লেখেন তা আমাদের জন্য। এই হল তফাৎ। বুঝলেন?'

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে স্তাবকের দল চুপ করে গেলেন।

কবিতা লেখা ছেড়ে

শরৎচন্দ্র নিয়মিত বিভিন্ন সাহিত্যসভায় যেতেন। একবার কবিশেখর কালিদাস রায় প্রতিষ্ঠিত 'রসচক্র' সাহিত্যসংস্থার সাহিভ্য সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে গেছেন শরৎচন্দ্র। তাঁকে পেয়ে নবীন কবি-সাহিত্যিকরা স্বভাবতই উৎফুল্ল। শরৎচন্দ্র বক্তব্য রাখতে উঠলেন। সবাই চুপ। শরৎচন্দ্র নবীন কবিদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'ভাইসব, তোমরা যারা কবিতা লেখো, তারা কবিতা লেখা ছেড়ে দাও।'

নবীন কবিরা তো অবাক। কী বলছেন শরৎচন্দ্র! কেনই বা এমন বলছেন! উনি নিজে একজন বিখ্যাত লেখক হয়ে এমন কথা কী করে বললেন! সবাই এ ওর মুখ চাইতে শুরু করে দিলেন।

এরপর শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, 'খুব খারাপ লাগছে আমার কথা

শুনে?আসলে একটু ভেবে দেখো—যে বিষয়েই কবিতা লিখতে যাওনা কেন, দেখবে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আগ বাড়িয়ে সব লিখে রেখেছেন। তাই তো আমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে হতাশ হয়ে গল্প লেখা শুরু করলাম। নইলে আমিও তোমাদের মত কবিতা লেখা দিয়েই লেখালিখি শুরু করেছিলাম।'

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে 'রসচক্র' সাহিত্যসভায় হাসির রোল উঠল। রসিক শরৎচন্দ্র যে সাহিত্যসভায় যেতেন, সেখানে প্রত্যেককেই মাতিয়ে তুলতেন।

গল্পের বাড়ি গল্পের পুকুর

শুধু নিজেই লিখতেন না, শরৎচন্দ্র অন্যদের লেখার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। তরুণ সাহিত্যিকরা অনেকেই তাঁর কাছে আসতেন পরামর্শের জন্য। একদিন শরৎচন্দ্রের বাল্যবয়সের এক বন্ধু শরৎচন্দ্রের কাছে একটি গল্প লিখে নিয়ে এসেছেন। শরৎচন্দ্র গল্পটি মন দিয়ে পড়লেন। একটা বাড়ির রঙ বদলানোর কথা আছে গল্পের শেষে। গল্প পড়া শেষ করে শরৎচন্দ্র বললেন, ' গল্পটা মন্দ হয় নি বন্ধু, তবে আমি হলে গল্পের শেষটা একটু বদলে দিতুম।'

' কী বদলাতিস গল্পের শেষে ?'—বন্ধুর প্রশ্ন।

শরৎচন্দ্র বললেন, ' দ্যাখ, আমি হলে শুধু রঙ না বদলে সমস্ত বাড়িটা ধুলিসাৎ করে দিতুম। শুধু তাই নয়, কুলিমজুর লাগিয়ে জমির ভিত খুঁড়ে জমির মাটি কেটে, একটা বড় পুকুর তৈরী করে তার মাঝে শ্বেত পাথরের একটা ঘাট বানিয়ে দিতুম।'

অবাক বন্ধুটি বললেন, 'সে কী রে, অতবড় একটা বাড়ি, সেটাকে ভেঙেচুরে পুকুর তৈরী করতিস ? সেটা হয় নাকি ?'

শরৎচন্দ্র এবার হাসতে হাসতে বললেন,' কেন হবে না বন্ধু, ওই বাড়ি তো তোরও নয়, আমারও নয়। জমিও তোর নয়, আমারও নয়। আমাদের হাতে যখন কলম আছেই তখন সেই কলমের এক খোঁচায় বাড়ি ভাঙতে কতক্ষণ লাগবে? পুকুর কেটে ঘাট তৈরী করতেই বা কতক্ষন লাগবে? কী রে, বল কিছু ?'

বন্ধুটি হেসে বললেন, 'তা বটে!'

তুমি তাই তুমি তাই

কবি কাজী নজরুল ইসলাম শরৎচন্দ্রকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তিনি নিয়মিত যেতেন শরৎচন্দ্রের হাওড়ার বাজে শিবপুরের বাসায়। একদিন নজরুল দু'হাত তুলে গান গাইতে গাইতে ঢুকলেন শরৎচন্দ্রের ঘরে। শরৎচন্দ্র তখন লিখছিলেন। নজরুলকে দেখে তিনি বললেন, ' আরে কাজী যে, কী খবর ?'

নজরুল পান চিবোতে চিবোতে বললেন, ' শরৎদা, একটা জোরদার কবিতা লিখেছি। আপনাকে শোনাতে এলাম।'

শরৎচন্দ্র তামাক টানতে টানতে বললেন 'তা বেশ, পড়ো পড়ো।'

নজরুল 'বিদ্রোহী' কবিতা পড়া শুরু করলেন। নজরুল পড়ছেন, শরৎচন্দ্র মন দিয়ে শুনছেন। নজরুল পড়ছেন, শরৎচন্দ্র শুনছেন। পড়তে পড়তে নজরুল যখন এলেন কবিতার সেই ছত্রে—'আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ', তখন শরৎচন্দ্রও সুর মেলালেন তাঁর সুরে, বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি তাই, তুমি তাই, তুমি সত্যিই বিদ্রোহে উন্মাদ হয়েছ কাজী।'

এরপর কবিতাটা সম্পূর্ণ শুনে শরৎচন্দ্র লেখার প্রশংসা না করে পারলেন না।

ভেলু

'ভেলু' নামের একটি কুকুর ছিল শরৎচন্দ্রের। কুকুরটি ছিল তাঁর খুব প্রিয়, খুব অনুগত। একদিন কুকুরটিকে নিয়ে শরৎচন্দ্র খেলা করছিলেন, এমন সময় এক বৈষ্ণব এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। বৈষ্ণবটি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে জীবপ্রেম, বৈষ্ণবধর্ম, অহিংসা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এই সময় ভেলু নামে কুকুরটি বৈষ্ণবের নীচে নামিয়ে রাখা ঝোলা থেকে জপমালাটা বের করে মুখে পুরে নিয়েছে। তা দেখে ক্ষেপে উঠলেন বৈষ্ণব। দু চোখ তাঁর লাল হয়ে উঠল। তিনি চিৎকার চেঁচামেচি করতে করতে কুকুরের মুখ থেকে জপমালাটা কেড়ে নিলেন। বৈষ্ণবের এহেন আচরণে অসন্তুষ্ট হলেন শরৎচন্দ্র। তাঁর প্রিয় কুকুরের প্রতি বৈষ্ণবের ক্ষোভ প্রকাশ দেখে তিনি চুপ থাকতে পারলেন না। হেসে হেসে তিনি বৈষ্ণবকে ব্যঙ্গ করে বললেন, 'সে কী গোঁসাইবাবা, আপনার জীবপ্রেম দেখছি এখনও কুকুর পর্যন্ত এসে পৌঁছয়নি!'

শরৎচন্দ্রের এই কথায় লজ্জা পেয়ে বৈষ্ণবটি চলে গেলেন।

এই 'ভেলু' কুকুরের মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র খুব কষ্ট পান। ঘটা করে তার শ্রাদ্ধ করেন। শরৎচন্দ্রের ভক্ত অবিনাশ ঘোষাল তাঁর 'বাতায়ন' পত্রিকায় ভেলুর মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করেছিলেন মূলত শরৎচন্দ্রকে খুশি করার জন্য। সমসাময়িক আর একটি বিখ্যাত পত্রিকা 'শনিবারের চিঠি'-এর সম্পাদক সজনীকান্ত দাশ তাঁর পত্রিকায় ছড়া করে লেখেন—

" ভেলুর নেই বিনাশ।
ভেলু হল অবিনাশ।।"

ভেলুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে ছিল।

হিন্দিতে বক্তৃতা

শরৎচন্দ্র ভালো হিন্দি জানতেন না। তাঁর হিন্দিজ্ঞান ছিল অতি সামান্য।

একবার তিনি গেছেন পাটনা শহরে। একটি সাহিত্যসভার প্রধান অতিথি হিসাবে। উদ্যোক্তারা শরৎচন্দ্রকে সংবর্ধনা জানালেন। ওই সভার হোতা এবং শ্রোতা সবাই হিন্দিভাষী। অতএব বক্তব্য রাখতে হলে শরৎচন্দ্রকে হিন্দিতেই বলতে হবে। কী করা যায়!

এদিকে গোদের ওপর বিষফোঁড়া। শরৎচন্দ্রের গলাও গেছে ভেঙে, ঠাণ্ডা লেগে। স্বভাবতই তিনি মুস্কিলে পড়লেন। তবু কিছু বলতেই হবে। শ্রোতারা অধীর আগ্রহে বসে আছেন। শেষমেষ তিনি স্থির করলেন, তাঁর ঠাণ্ডা লেগে গলা ধরে যাওয়ার কথা তিনি হিন্দিতেই জানাবেন। নিজের মনে কথাগুলো হিন্দি অনুবাদ করে নিয়ে আমতা আমতা করে শরৎচন্দ্র বললেন,

'হামারা গর্দান বৈঠ গিয়া ভাই!'

শরৎচন্দ্রের মুখে এই হিন্দি শুনে শ্রোতারা হেসে উঠলেন।

গাধা জন্ম

কথাসহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেড়াতে খুব ভালবাসতেন। একবার তিনি সবান্ধব বেড়াতে গেছেন কাশীতে। পুরো দলকে মাতিয়ে রেখেছেন তিনি। কাশী থেকে তাঁরা একদিন বেড়াতে গেলেন কাশীর বিপরীতে রামনগরে। তাঁরা নৌকায় চেপে রামনগরে গেলেন। নদীপথে ভ্রমণ খুব পছন্দ শরৎচন্দ্রের। রামনগর ঘাটে তাঁরা নদী থেকে নেমে দেখলেন ঘাটের পাশে শ্মাশান। শ্মাশানে একটি মড়া আনা হয়েছে। মড়ার পাশে চরে বেড়াচ্ছে একটি গাধা। এ দৃশ্য দেখে বন্ধুদের শরৎচন্দ্র বললেন, ' বন্ধুগণ, আমার মনে হচ্ছে কাশীর থেকে রামনগরের মাহাত্ম্য বেশি। কারণ এখানে প্রাণ ত্যাগ করলে দ্রুত ফলপ্রাপ্তি হয়।'

শরৎচন্দ্রের হেঁয়ালি বুঝলেন না বন্ধুরা। বন্ধুরা যে তাঁর কথা বুঝতে পারেন নি এ কথা বুঝতে পারলেন শরৎচন্দ্র। তখন তিনি তাঁদের বুঝিয়ে বললেন, ' দেখছো না। কাশীতে মরলে যেখানে শিবলোক প্রাপ্তি হয়, রামনগরে মরলে গাধা জন্ম হয়। দেখো, দেখো, লোকটি মরার সঙ্গে সঙ্গেই গাধা জন্ম লাভ করেছে।'

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে নির্জন শ্মশানেও বন্ধুরা না হেসে পারলেন না।

মহামারী

শুধু সাহিত্যচর্চাই নয়, শরৎচন্দ্র একটু-আধটু বায়োকেমিক ও হোমিওপ্যাথির চর্চাও করতেন। তিনি গ্রামে থাকাকালীন একবার গ্রামে কলেরা মহামারীর আকার নেয়। শরৎচন্দ্র ওষুধপত্র নিয়ে ছুটলেন রোগীদের শুশ্রূষা করতে। কিন্তু সবার কাছে যাওয়া তো তাঁর একার পক্ষে সম্ভব নয়। স্বভাবতই প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয় কলেরায়। নিরুপায় শরৎচন্দ্র মনে কষ্ট পান। কিন্তু কী করবেন! এমন সময় তাঁর বাড়ি থেকে খবর এল— কয়েকজন ভদ্রলোক কলকাতা থেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এ কথা শোনা মাত্র শরৎচন্দ্র ফিরে এলেন বাড়িতে। অতিথিদের উদ্দেশ্যে বললেন,' তোমরা এসেছ বলেই আমি চলে এলাম।'

আসলে গ্রামে ডাক্তারের অভাবে একের পর এক রোগী মহামারীতে মারা যাচ্ছে এটা মন থেকে মেনে নিতে পারছিলেন না শরৎচন্দ্র। গ্রামের এই দুর্দশায় তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন। গ্রামের এই সামাজিক অবস্থাকে ব্যঙ্গ করে তিনি অতিথিদের বললেন, 'চলে এলাম, নাহলে কিছুটা সময় পেলে আরো কয়েকটা রোগী মেরে আসতাম।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শরৎচন্দ্র তাঁর লেখা বিভিন্ন উপন্যাসে গ্রামের দুর্দশা ও সামাজিক অবস্থার কথা লিপিবদ্ধ করেন।

সামতাবেড়ে গ্রামে

হাওড়া জেলার দেউলটি রেলস্টেশন সংলগ্ন পাণিত্রাস সামতাবেড়ে গ্রামে রূপনারায়ণ নদীর ধারে শরৎচন্দ্র বাস করতেন। তাঁর বেশ কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাস তিনি এখানে থাকাকালীন রচনা করেন। এই গ্রামে একবার ম্যালেরিয়া অসুখ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল। সেই সময় শরৎচন্দ্রের এক ভক্ত এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

ভক্তটি শরৎচন্দ্রের কাছে জানতে চাইলেন, 'আপনাদের গ্রামের অবস্থা কী রকম?' ভক্তটির প্রশ্নের উত্তরে শরৎচন্দ্র তাঁর পাশে বসা ষাট বছরের এক বৃদ্ধকে দেখিয়ে বললেন, 'গ্রামের অবস্থা সম্পর্কে অত-শত জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি- আমার পাশে এই যিনি বসে আছেন তিনি এখন গুরুজনদের ভয়ে দাওয়ায় বসে নিশ্চিন্ত মনে তামাকু সেবন করতে পারেন না। প্রতিনিয়ত ওঁর গুরুজনেরা এ পথে যাতায়াত করেন।'

শরৎচন্দ্রের মুখে এ কথা শুনে ভক্তটি বুঝলেন গ্রামের অবস্থা ভাল নয়।

দাঙ্গায় হাজতবাস

শরৎচন্দ্র তখন থাকতেন হাওড়া শহরে। সেই সময় একবার হাওড়া শহরে দাঙ্গা বেঁধে যায় দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে। দাঙ্গার সময় শরৎচন্দ্র ভুল করে রাস্তায় বেরিয়ে ছিলেন কোথাও যাওয়ার জন্য। শরৎচন্দ্রের গালে ক'দিনের না কাটা দাড়ি, মাথায় উস্কোখুস্কো চুল দেখে পুলিশ তাকে দাঙ্গাকারী মনে করেন ও তাঁকে গ্রেফতার করেন। পুরে দেন সোজা লক আপে। শরৎচন্দ্র কোনও প্রতিবাদ করেন না। তিনি ভাবেন, বললেই শুনবে কে! তার থেকে যা হচ্ছে হোক! পরের দিন সকালবেলায় জেলা হাকিম গুরুসদয় দত্তর কোর্টে হাজির করানো হল শরৎচন্দ্রকে। হাকিম জানতে চাইলেন, 'মিজ্ঞা সাহেব, আপনার নাম কী?'

শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

নাম শুনে হতভম্ব হাকিম লজ্জা পেয়ে বলেন, 'আপনিই সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র?'

শরৎচন্দ্র মাথা নাড়েন। হাকিম আবার বলেন, ' ছিঃ ছিঃ পুলিশের ভুলে আপনাকে সারারাত পচতে হল গারদের মধ্যে। খুব কষ্ট হয়েছে নিশ্চই। কিছু মনে করবেন না।'

শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বলেন, 'না, এমন কিছু কষ্ট হয়নি। তবে যদি একটু হুঁকো কলকে পাওয়া যেত, তাহলে রাতটা বেশ আরামে কাটতো।'

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে হাকিমসাহেব হেসে ফেলেন। যে পুলিশ ভুল করে দাঙ্গাকারী মনে করে শরৎচন্দ্রকে গ্রেফতার করেন, তিনি পরে শরৎচন্দ্রকে প্রণাম করে ভুলের জন্য লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চেয়ে যান।

পাদুকা পুরাণ

গুরুদের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছেন শরৎচন্দ্র। ঘরে ঢুকে শরৎচন্দ্র দেখলেন রবীন্দ্রনাথ কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ফরাসে জমিয়ে বসে আছেন। শরৎচন্দ্র আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে গুরুদেবকে প্রণাম করলেন। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, শরৎচন্দ্রের হাতে কাগজে মোড়া কিছু একটা। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে জিগ্যেস করলেন, 'ওহে শরৎ, তোমার হাতে ওটা কী?'

শরৎচন্দ্র হেসে উত্তর দিলেন, 'গুরুদেব, এটা হচ্ছে পাদুকা পুরাণ।'

একপাটি জুতো

শরৎচন্দ্র একবার রেঙ্গুনে কবি নবীনচন্দ্র সেনের বাড়িতে গেছেন অতিথি হিসাবে। নবীনচন্দ্রের বাড়িতে উঠে সামনের বসার ঘরে নবীনচন্দ্রের সঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভাই রেঙ্গুন হাইকোর্টের জজ যতীশরঞ্জন দাশকে বসে থাকতে দেখে শরৎচন্দ্র

হঠাৎ এমন জোরে পিছনের দিকে দৌড় দিলেন যে তাঁর পায়ের একপাটি জুতো খুলে পড়ে গেল। শরৎচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির মানুষ। কোনো বিশেষ গণ্যমান্য পদস্থ লোকের সামনে যেতে তিনি লজ্জা পেতেন। তিনি বলতেন, 'আমি সামান্য লোক, ওঁদের মত মানুষের কাছে যাওয়ার কোনো যোগ্যতাই আমার নেই।'

চটিজুতো বিসর্জন

শরৎচন্দ্র একবার এসেছেন অভিনেতা শিশির ভাদুড়ীর থিয়েটারে। তাঁর নিজের লেখা একটি নাটকের অভিনয় দেখতে। নাট্য-অভিনয় দেখে শরৎচন্দ্র মুগ্ধ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন বন্ধু। তাঁরাও খুশি। নাটকের শেষে বাড়ি ফেরার পালা। এই সময় ঘটলো এক কাণ্ড। শরৎচন্দ্র তাঁর একপাটি চটিজুতো খুঁজে পাচ্ছেন না। সবাই খুঁজলেন, কিন্তু পাওয়া গেল না। শরৎচন্দ্র কী আর করেন! ফেরার সময় বাকি চটিজুতো কাগজে মুড়ে সঙ্গে নিলেন। বন্ধুদের হাসতে হাসতে বললেন, ' ব্যাটা চোর মনে করেছে এই পাটিটাও আমি ফেলে রেখে যাবো, আর ও পরের দিন এসে নিয়ে যাবে। আমি তা হতে দিচ্ছি না।'

পরেরদিন সকালে ঝাড়ুদার হল ঝাঁট দিতে গিয়ে হারানো চটিটা দেখতে পেয়ে শিশির ভাদুড়ীকে ফেরত দেন। শিশির ভাদুড়ীও চটিটা হাতে পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে যান হাওড়ার শিবপুরে শরৎচন্দ্রের বাসায়। শরৎচন্দ্রকে শিশির ভাদুড়ী বললেন, 'শরৎবাবু, আপনার হারানো চটি পাওয়া গেছে, এই নিন।'

শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, ' কী আশ্চর্য ! আমি যে গতকাল আসবার সময় অন্য পাটিটা হাওড়া পুল থেকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে এসেছি। ভালো, এটাও যখন পাওয়া গেল এটাকেও পরে সময় করে একদিন গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে আসতে হবে। জোড়ায় থাকা অভ্যাস। না হলে একজনকে ছেড়ে অন্যজনের মন খারাপ হবে যে!'

শরৎচন্দ্রের রসিকতায় শিশির ভাদুড়ী হেসে ফেললেন।

ব্যাকরণ কৌমুদী পড়া

শরৎচন্দ্র তখন থাকেন হাওড়ার পাণিত্রাস-সামতাবেড়ের বাড়িতে। রূপনারায়ণ নদীর ধারে এই জায়গাটি ছিল তাঁর খুব পছন্দের। একদিন সকালে তিনি সদর দালানে বসে মন দিয়ে 'প্রোগ্রেস অব সায়েন্স' নামে একখানা বই পড়ছিলেন। পড়া বা লেখার সময় কেউ তাঁকে বিরক্ত করলে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন।

এমন সময় বাইরে থেকে ডাক এল, ' শরৎবাবু আছেন ?'

বই থেকে মুখ তুলে শরৎচন্দ্র দেখেন একজন ভদ্রলোক এসেছেন। সঙ্গে এক তাড়া কাগজ, অর্থাৎ পাণ্ডুলিপি। সেটা দেখেই শরৎচন্দ্র বুঝে গেলেন কী উদ্দেশ্যে ভদ্রলোকের আগমন। তবু হাসি মুখে বললেন, ' বলুন, কী চান ?'

ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বললেন, 'একটা গল্প লিখেছি। আপনি যদি সেটা কাইণ্ডলি কারেক্ট করে দেন তাহলে ভাল হয়।'

ভদ্রলোকের মুখে ইংরেজি শব্দ দুটি শুনেই শরৎচন্দ্রের মাথা গরম হয়ে গেল। তবু তিনি মজা করে জিগ্যেস করলেন, 'মহাশয়ের কী করা হয় ?'

ভদ্রলোক বললেন, ' বি-এস-সি পড়ি।'

শরৎচন্দ্র আবার জিগ্যেস করলেন, 'ব্যাকরণ কৌমুদী পড়া কতদিন আগে ছেড়েছেন ?'

ভদ্রলোক মাথা চুলকে বললেন, 'তা প্রায় বছর চারেক আগে।'

শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, 'তাহলেতো এখন আর কিছু করা যাবে না। কৌমুদীর সন্ধি, সমাস, তদ্ধিত আর কৃৎ প্রত্যয়গুলো বেশ ভাল করে পড়ে আসুন, তখন দেখে দেব।'

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে ভদ্রলোক পাণ্ডুলিপি নিয়ে চলে গেলেন। শরৎচন্দ্র আবার মন দিলেন বই পড়ায়।

ভবঘুরে ও রাজলক্ষ্মী

শরৎচন্দ্র ছিলেন একজন আপাদমস্তক ভবঘুরে। নিয়ম মেনে চলা তাঁর পছন্দ হত না। তিনি রেঙ্গুন থেকে শিবপুরে আসার আগে কয়েকবার একটি সুন্দরী রমনীকে নিয়ে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ি যান। তাঁর সঙ্গে থাকতো একটি বাঁশের আড় বাঁশি ও একটি হারমোনিয়াম। এই নিয়ে শরৎচন্দ্র খুব মজা করতেন। বন্ধু-আত্মীয়রা তাঁর রঙ্গ রসিকতা মন দিয়ে শুনতেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সুন্দরী রমনীই পরে রাজলক্ষ্মী বা পিয়ারী বাই হন। ' শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র এঁর কথাই লেখেন। যে চরিত্রটি খুবই জনপ্রিয় হয়।

মঠের বেয়াড়া নিয়ম

শরৎচন্দ্র একবার রেঙ্গুনে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ওরফে শশী মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে যান। কথাবার্তার মধ্যে শরৎচন্দ্র স্বামীজীর কাছে জানতে চান, 'মহারাজ, আপনাদের এখানে সন্ন্যাসী হবার কী নিয়ম ?'

স্বামীজী উত্তরে বলেন, 'মঠের সন্ন্যাসী হতে গেলে প্রথম তিন বছর শিক্ষানবীশ

থাকতে হয়, তারপর তিন বছর ব্রহ্মচর্য। এই ছয় বছর পরে মঠাধ্যক্ষ বিবেচনা করে দেখবেন, আপনি সন্ন্যাসগ্রহণের উপযুক্ত কি না।'

শরৎচন্দ্র শুনে বলেন, 'বড়ই বেয়াড়া নিয়ম। ছ'বছর এ্যাপ্রেনটিস? ছ'বছর মেডিকেল কলেজে পড়লে ডাক্তার হওয়া যায়। আপনাদের নিয়ম বড়ই বেয়াড়া।'

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে স্বামীজী হাসতে হাসতে বলেন, 'ডাক্তার হলে অন্যের রোগের চিকিৎসা হয়। সন্ন্যাসী হলে ভবরোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।'

এ কথা শুনে শরৎচন্দ্র হেসে উঠলেন।*

পুরাতন লাঠি

কবিশেখর কালিদাস রায়ের আমন্ত্রণে শরৎচন্দ্র মাঝেমাঝেই রবিবার সন্ধ্যায় 'রসচক্র'-এর সাহিত্যসভায় যোগ দিতেন। তাঁর হাতে থাকতো একটা অত্যন্ত পুরাতন শ্রীহীন লাঠি। অনেকেই রসিকতা করে তাঁকে বলতেন, ' শরৎবাবু, এবার এই লাঠিটা ফেলে দিয়ে একটা ভদ্রগোছের লাঠি ব্যবহার করুন দিকি।'

উত্তরে হাসতে হাসতে শরৎচন্দ্র বলতেন, 'আমিও তো বুড়ো হয়েছি, শ্রীহীন হয়েছি, পুরাতন হয়েছি, আমাকেও বুঝি তোমরা এবার ফেলে দেবে? জানো, এই লাঠি আমার বন্ধু। এতে আমি যে কত সাপ মেরেছি তার ইয়ত্তা নেই। এই লাঠিকে আমি কী করে ফেলবো? এ আমার পরম সুহৃদ।'

শরৎচন্দ্রের এই কথা শুনে রসচক্রের প্রত্যেকেই মজা পেতেন।

মামা না জ্যাঠা

শরৎচন্দ্র একদিন বন্ধু-আত্মীয়দের সঙ্গে সদর ঘরে গল্পগুজব করছেন। কথার মাঝে সুখটান দিচ্ছেন গড়গড়ায়। হঠাৎ তিনি রাধারানী দেবীকে হাসতে হাসতে বললেন, 'হ্যাঁরে শোন, নরেন তো আমাকে শরৎদা বলে, তুই বলিস বড়দা। তোদের সন্তানরা আমাকে কী বলে ডাকবে ভেবে দেখেছিস? মামা না জ্যাঠা?'

রাধারানী দেবী মুচকি হেসে বললেন, 'আমার সম্পর্কে মামা বলবে বইকি।'

তখন রাধারানীর স্বামী নরেন্দ্র বললেন, 'শরৎদা, গুরুদেব ছাড়া আর সব সাহিত্যিককেই আমি মামা বলতে শেখাবো।'

শরৎচন্দ্র একথা শুনে বললেন, 'আমাকেও মামা বলাতে চাও?'

নরেন্দ্র বললেন, 'মামা না জ্যাঠা—এ প্রস্তাব তো আপনি নিজেই তুললেন।'

শরৎচন্দ্র তখন হাসতে হাসতে বললেন, 'ওটা তোমার বন্ধু জাতের জন্য রেখে দাও হে।'

একথা শুনে রাধারানী ও নরেন্দ্র হেসে উঠলেন।

সভাপতি

শরৎচন্দ্র কোনো সাহিত্যসভায় গিয়ে গম্ভীরমুখে বসে থাকতে পারতেন না। ভক্তবৃন্দের আমন্ত্রণে তাঁকে প্রায়ই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে হত। তিনি মঞ্চের ওপর ফরাসে শ্রেষ্ঠ আসনে বসে হয় এদিক সেদিক তাকাচ্ছেন, নাহলে হাঁটুর ওপর হাতের আঙুলগুলো বা পা নাচাচ্ছেন। কখনো বা ফুলদানি হাতে তুলে নিয়ে বলছেন,

'বা ঃ, কী চমৎকার! কত দাম এই ফুলদানিটার?'

অনেকে তাঁকে ইশারা করে এরকম করতে নিষেধ করতেন। পরে তিনি তাঁদের বলতেন, 'আমি গেঁয়ো মুখ্যু মানুষ, এসব তো দেখিনি।'

আসলে এ রকম আচরণ করে তিনি মজা পেতেন। সঙ্গীরা তাঁকে সামলানোর চেষ্টা করছেন দেখে তিনি খুশি হতেন। কেন তিনি এমন করতেন? তিনি বলতেন, 'এই সব সভা সমিতিতে কত মানুষ আসে, কেউ কিছুক্ষণ গম্ভীর মুখে ভদ্রভাবে বসে বড়ো বড়ো কথা বলে, কেউ ভাবালু চোখে শোনে। দু তরফই ভাব দেখায় যেন তারা কত বড় বিদগ্ধ, সত্যদ্রষ্টা, আলোচ্য বিষয়ের কাণ্ডারী। কিন্তু মোদ্দা কথা হল, জীবনের সঙ্গে মনের গভীরে এই সব ভঙ্গীর হয়তো কোন যোগ নেই। সব লোক দেখানো। এই লোকদেখানো আচরণ আমার একদম পছন্দ নয়। আমি যেমন, সবার সামনে তেমন ভাবেই থাকতে চাই। চাই সহজ সরল ভাবে থাকতে। এটাই আমার জীবন দর্শন।'

শরৎচন্দ্রের এ হেন কথা সকলে উপভোগ করতেন।

বিপরীতগামী ট্রেন

শরৎচন্দ্র যখন পেগুতে উকিল মিঃ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ছিলেন তখন পেগু একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অফিসে দু-তিন মাস অস্থায়ীভাবে চাকুরি করেন। এই সময় তিনি মাঝে মাঝে যাতায়াত করতেন রেঙ্গুনে। তিনি ছিলেন আপাদমস্তক ভবঘুরে। সবসময় তাঁর মধ্যে একটা উদাসভাব দেখা যেত। একবার তিনি পেগু থেকে রেঙ্গুন যাবেন। ব্যাগপত্র নিয়ে তিনি এসেছেন স্টেশনে। স্টেশনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুটো ট্রেন। তিনি ভুল করে বিপরীতগামী ট্রেনে উঠে পড়লেন, রেঙ্গুন যাবার ট্রেনে না উঠে। ট্রেন ছেড়ে দিল। তাঁর খেয়াল নেই। তিন ঘণ্টা পর নেওলবিন স্টেশন দেখে তাঁর চমক ভাঙল! এ কী, কোথায় এলাম! এই ট্রেন তো রেঙ্গুন যাবে না! তখন তিনি সেই স্টেশনে নেমে গেলেন এবং অনেক রাতে পেগুতেই ফিরে গেলেন। এই ঘটনার কথা

পরে তিনি শোনান বন্ধুদের। ‘ কেন এমন ভুল হল?’—বন্ধুদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলতেন, ‘ আর বোলো না, একটা উপন্যাসের প্লট তৈরী করতে গিয়েই ফ্যাসাদ ঘটেছে।’

এ কথা শুনে বন্ধুরা হেসে উঠতেন।

কেমন ঠকালাম

শরৎচন্দ্র তাঁর ভাগ্না-ভাগ্নীদের সঙ্গে খুব মজা করতেন। একবার তিনি তাঁর স্নেহের ভাগ্নী পারুললতাকে মজা করে বলেন, ‘এই পারু, তুই এখানে বসে আছিস, ওদিকে আশালতা আমাকে খুব বড়ো একটা মাছের মুড়ো খেতে দিয়েছে। যা গিয়ে দেখে আয়।’ একথা শুনে দৌড় লাগাল পারুললতা, গিয়ে দেখল সব মিথ্যা, মাছের মুড়ো নেই! ফিরে এসে বড় মামা শরৎচন্দ্রকে একথা বলতে তিনি হেসে উঠে বললেন, ‘ কী রে পারু, কেমন ঠকালাম!’

ঘড়ি

শরৎচন্দ্র একবার হোয়াইট এ ওয়ে লেডেল কোম্পানীর সেলে তিন টাকা পনের আনায় একটি হাত ঘড়ি কিনেছিলেন। কেনার পর ঘড়িটা দুবার মেরামত করতে হয়। তৃতীয়বার ঘড়িটি খারাপ হলে তিনি একগ্লাস কেরোসিন তেলে ঘড়িটি ডুবিয়ে রাখেন। আশ্চর্য! ঘড়িটি এর ফলে ঠিক হয়ে যায়। এর পর থেকে যখনই কারো ঘড়ি খারাপ হওয়ার কথা শুনতেন তখনই তাঁদের ঘড়িটি কেরোসিন তেলে ডুবিয়ে রাখার পরামর্শ দিতেন। তবে কেউ তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কেরোসিনে ঘড়ি ডুবিয়ে উপকৃত হয়েছেন কিনা তা তিনি জানতে পারেন নি।

মজার আয়না

শরৎচন্দ্র একবার সবান্ধব নিমন্ত্রিত হয়ে গেছেন চন্দননগরের হরিহর শেঠের বাড়িতে। হরিহর ছিলেন ধনী, সদাশয়, মহানুভব ব্যক্তি। তাঁর বাড়ি ঠিক যেন রাজপ্রাসাদ। ঘরে দামী আসবাবপত্র, ঘর সাজানোর জিনিস। অতিথিরা ঘুরে দেখছেন। একটি হল ঘরে বিপরীতমুখী দুটি দেওয়ালে দুটি বিশাল আয়না লাগানো। তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্র মজা করে বললেন, ‘ বাবা! কত বড় আয়না! আমার সামনে দিক ও পিছনের দিক এক সঙ্গে দেখা যাচ্ছে ! বেশ মজা তো! ভাগ্যিস এসেছিলুম এখানে। তাই এরকম মজার আয়না দেখতে পেলুম ।’

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ না হেসে পারলেন না।

জ্যোতিষী বলেছেন

একবার শরৎচন্দ্র গেছেন রেঙ্গুনে গভর্নমেন্ট হাউসে। সঙ্গে ছিলেন লাটপ্রাসাদের কন্ট্রোলার। কন্ট্রোলারকে শরৎচন্দ্র বিশেষ স্নেহ করতেন। শরৎচন্দ্র বলরুমে প্রবেশ করে বিলিতি ঢঙে একটু নেচে নিলেন। তারপর উপরে শয়নকক্ষে প্রবেশ করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন শয়ন শয্যায় কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দিয়ে বললেন, 'ওহে লাটপ্রাসাদের কন্ট্রোলার, তুমিই এখন এখানকার লাট হে। কিছুদিন আগে এক জ্যোতিষী গণনা করে আমাকে বলেন, ভবিষ্যতে আমার ধন, মান, যশ, খ্যাতির পাশাপাশি রাজদ্বারে খুব সম্মান হবে। আজ তো দেখছি তোমার জন্য লাটের বিছানায় শোয়াও হয়ে গেল।'

কন্ট্রোলার তখন জিগ্যেস করেন শরৎচন্দ্রকে, 'জ্যোতিষী আর কী কী বলেছে আপনাকে?'

শরৎচন্দ্র বলেন, ' জ্যোতিষী আরও বলেছে—আমার দুটি বিয়ে হবে। কিন্তু দুঃখের কথা আজ পর্যন্ত একটি প্রজাপতিও আমার গায়ে উড়ে এসে বসল না।'

এ কথা শুনে কন্ট্রোলার হেসে উঠলেন।

থামতে জানেন

শরৎচন্দ্র ছিলেন একজন সংগীতপ্রেমী। তাঁর সংগীতপ্রেমের কথা কারো অজানা ছিল না। কাছে পিঠে কোথাও গানের আসর বসলে তাঁর নিমন্ত্রণ হতো। একবার দিলীপকুমার রায়ের কলকাতার বাড়িতে আয়োজন করা হয়েছে সংগীত সম্মেলন। সেই আসরে গান গাওয়ার কথা বিখ্যাত সংগীতশিল্পী আবদুল করিম সাহেবের। দিলীপকুমার অনেক ঘনিষ্ঠ জনদের নিমন্ত্রণ করলেন সংগীত সম্মেলনে গান শুনতে আসার জন্য। নিমন্ত্রিতদের তালিকায় রয়েছেন শরৎচন্দ্রও। দিলীপকুমার সংগীত সম্মেলনের দিন সকালে নিজেই এলেন শরৎচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করতে। শরৎচন্দ্র তখন লিখছিলেন। দিলীপকুমারকে দেখে লেখা থামিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, ' কী খবর?'

দিলীপকুমার বললেন, ' আজ আমাদের বাড়িতে একটা সংগীত সম্মেলন হবে। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক আবদুল করিম সাহেব আসছেন গান গাইতে। সেই আসরে আপনার নিমন্ত্রণ। আপনাকে যেতেই হবে।'

একথা শুনে শরৎচন্দ্র গম্ভীর মুখে বললেন, ' যেতে পারি, তবে তোমাকে একটা ভরসা দিতে হবে।'

দিলীপকুমার বললেন, ' বলুন কিসের ভরসা?'

শরৎচন্দ্র বললেন, ' শুনেছি আবদুল করিম সাহেবের ওস্তাদী গান নাকি চমৎকার। খুবই ভাল গান করেন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার একটাই প্রশ্ন, উনি থামতে জানেন তো?'

শরৎচন্দ্রের এ হেন রসিকতায় দিলীপকুমার হেসে ফেললেন।

নাম বিভ্রাট

তখন সাহিত্য ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের খুব নাম। ' শ্রীকান্ত' ' দেবদাস' প্রভৃতি বই হট কেক। সেই সময় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে আর এক লেখকের আবির্ভাব হয়। এই শরৎচন্দ্র 'চাঁদমুখ' 'হিরের ফুল' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা এবং 'গল্পলহরী' পত্রিকার সম্পাদক। স্বভাবতই দুই শরৎচন্দ্রের মধ্যে নাম বিভ্রাট দেখা যায়। তবে পাঠকদের বুঝে নিতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। এই সময়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা তাঁর এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে। বহুদিন পর দুজনের দেখা। শরৎচন্দ্র বন্ধুকে বলেন, 'কী হে চিনতে পারছ না বুঝি? আমার নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

বন্ধুটিও রসিক, তিনি মজা করে বললেন, ' আজকাল বাংলার সাহিত্য আকাশে তো দু'জন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উদয় হয়েছে। আপনি কোন জন?

বন্ধুর রসিকতা বুঝলেন রসিক শরৎচন্দ্র। তিনি হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, 'চরিত্রহীন।'

উত্তর শুনে বন্ধুটি হেসে ফেললেন।

আফিং এবং মিষ্টি

শরৎচন্দ্র একদিন লেখা দিতে এসেছেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার অফিসে। সেই সময় অফিসে ছিলেন না পত্রিকার সত্ত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায় কিংবা তাঁর ছোট ভাই সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র লেখার পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে নানারকম গল্প করছেন অফিসের কর্মচারীদের সঙ্গে। কথা বলতে বলতে বিকেল হয়ে গেল। আফিং খাওয়ার সময় হয়েছে শরৎচন্দ্রের। তিনি পকেট থেকে আফিং-এর কৌটো বের করে একটা আফিং-এর পাকানো বড়ি মুখে পুরে দিলেন। কাজ ফেলে কর্মচারীরা শরৎচন্দ্রের আফিং খাওয়া দেখতে লাগলেন। তা দেখে শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, ' আমার আফিং খাওয়া দেখে বুঝি সবার খুব লোভ হচ্ছে?' তারপর তিনি একজনকে বললেন, ' আপনি যদি একটু আফিং খান তাহলে আমার মত সাহিত্যিক হয়ে যাবেন। '

এই ভাবে বুঝিয়ে শরৎচন্দ্র অফিসসুদ্ধ সকলকেই আফিং খাইয়ে দিলেন। সাহিত্যিক হবার আশায় অফিসের সকলকেই আফিং-এর নেশায় বুঁদ! এই দেখে

শরৎচন্দ্র বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে একটা চিঠি লিখে দারোয়ানের হাত দিয়ে তখনই পাঠিয়ে দিলেন। তিনি লিখলেন:—

'ভায়া, আফিংয়ের রূপের মোহে, আর কেউ কেউ আফিং ধরে আমার মত সাহিত্যিক হবার লোভে, আপনার অফিসসুদ্ধ সমস্ত কর্মচারীই আমার কাছ থেকে জোর করে আফিং কেড়ে নিয়ে খেয়ে বসে আছে। এখন তারা আফিংয়ের নেশায় ঝিমুচ্ছে। এখন যদি না তাদের মিষ্টি খাওয়ার ব্যবস্থা করেন, ঝিমুনি কাটবে না। তা হলে কি হবে বুঝতে পারছেন? আপনার হাতে এখুনি পুলিশের হাতকড়া পড়বে। অতএব পত্রপাঠ কিছু মিষ্টি পাঠিয়ে দিন।'

চিঠি পড়ে হরিদাস চট্টোপাধ্যায় বুঝতে পারলেন শরৎচন্দ্রের আসল উদ্দেশ্য। মনে মনে হাসলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই দারোয়ানের হাতে দশটাকা পাঠিয়ে দিলেন। শরৎচন্দ্র সেই দশটাকা হাতে পেয়ে দোকান থেকে মিষ্টি আনিয়ে আফিং-এর নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা কর্মচারীদের খাওয়ালেন এবং নিজে খেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, ' বুঝলেন তো আফিং-এর কী ক্ষমতা!'

খদ্দর

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন প্রাদেশিক কংগ্রেসকমিটির সদস্য। একবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির অফিসে কংগ্রেসের এক বিরাট সভা বসে। সেই সভায় হাজির অনিলবরণ রায়, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ। কংগ্রেসকর্মীরা মনে করতেন চরকা কাঠা ও খদ্দর পরা প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীর অবশ্য কর্তব্য। অনিলবরণ রায় খুব মোটা আর খাটো বহরের আর লম্বাতেও ছোট এমন খদ্দরের কাপড় পরতেন। এই পোশাক তাঁকে আলাদা করে চিনিয়ে দিত। তাঁর কাপড়ের বহর উঠে থাকত হাঁটুর ওপরে। অনেকেই তাঁর পোশাক নকল করতেন। অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মী হুবহু তাঁর মত না হলেও খুব মোটা খদ্দরের কাপড় পরতেন।

তবে এর বিপরীত ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু। তিনি মিহি খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি পরতেন। ব্যবহার করতেন সৌখিন মিহি চাদর। শরৎচন্দ্র বসু ছিলেন সুপুরুষ। লম্বা চওড়া দশাসই পুরুষ মানুষ। তাঁর ধুতির বহর লুটিয়ে পড়ত পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত। তেমনই লম্বা ঝুল ছিল পাঞ্জাবির। মুগার পাড় থাকত চাদরে। সেই সভায় অনিলবরণ রায় ও শরৎচন্দ্র বসু পাশাপাসি বসে। এমন সময় এক কংগ্রেস কর্মী শরৎচন্দ্র বসুকে রসিকতা করে বললেন, ' আপনার এই মিহি খদ্দরটি কোথায় তৈরী হয়েছে?'

প্রশ্ন শুনে শরৎচন্দ্র বসু মুখ গম্ভীর করে বললেন, ' এটা ভাগলপুরে তৈরী।'

সভায় আগত সকলে বুঝলেন পরিস্থিতি অন্য দিকে ঘুরে যাচ্ছে। অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে চলেছে দেখে সভায় উপস্থিত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলে উঠলেন,

'আমাদের এখানে সবরকমই আছে। একটু বৈচিত্র থাকলে মন্দ কি? অনিলবরণ রায় মহাশয় হচ্ছে, খদ্দরের মাদার টিংচার, অন্যদিকে শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় হচ্ছেন টু হানড্রেড ডাইলুশেন।'

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে সভায় উপস্থিত কংগ্রেস কর্মীরা না হেসে পারলেন না। অপ্রীতিকর পরিস্থিতির হাত থেকে সভা রক্ষা পেল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি শরৎচন্দ্র হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। তাঁর ওযুধের গুণে কংগ্রেসের সভা পণ্ড হওয়ার হাত থেকে এ যাত্রায় বেঁচে গেল।

ভাত

প্রখ্যাত নাট্যকার-কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মভূমি কৃষ্ণনগর। ১৩৪১ সালের ১০ আশ্বিন, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণনগরে গেছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নদীয়া শাখার বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপকুমার ছিলেন শরৎচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন। কৃষ্ণনগরে শরৎচন্দ্র দিলীপকুমারকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। কৃষ্ণনগরে যাবেন, অথচ দ্বিজেন্দ্রলালের পৈতৃক বাসভবনে যাবেন না, তা হয়? দ্বিজেন্দ্রলালের দাদা সুরেন্দ্রলাল রায় সেই সময় কৃষ্ণনগরে পৈতৃক বাসভবনে বসবাস করছিলেন। শরৎচন্দ্র দিলীপকুমারের সঙ্গে গেলেন দ্বিজেন্দ্রলালের পৈতৃক বাসভবনে। দিলীপকুমার তাঁর জ্যাঠামশাই-এর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আলাপ করিয়ে দিলেন। পরিচয় পর্ব শেষ হলে শরৎচন্দ্র সুরেন্দ্রলালকে হাতজোড় করে নমস্কার করে বললেন, 'আপনি বিখ্যাত কবি দ্বিজেন্দ্রলালের দাদা, তাই আপনিও উনার মত প্রাতঃস্মরণীয়। আপনাকে দেখেও পুণ্য হয়। তা আপনি ভাত খেয়েছেন?'

শরৎচন্দ্রের মুখে হঠাৎ ভাত খাওয়ার কথা শুনে অবাক সুরেন্দ্রলাল। বিস্ময়ের ভাব কাটিয়ে জানতে চাইলেন, 'হঠাৎ ভাত খাওয়ার প্রসঙ্গ কেন?'

শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, 'জানিনা মশাই, এখানে রাস্তার ধারে একটা ঘরে আছি, তা ঘরে বসেই শুনছি রাস্তা দিয়ে যত লোক যাতায়াত করছে, পরিচিতদের দেখলেই জিগ্যেস করছে, ভাত খেয়েছেন? আমি ভাবলুম এটা বুঝি এখানকার রীতি। তাই বললুম।'

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে মুচকি হাসলেন সুরেন্দ্রলাল ও দিলীপকুমার। এরপর শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে আরও বললেন, 'কী কারণে এই ধরনের প্রশ্ন এখানে করা হয় তা আমি অবশ্য পরে জেনেছি। এখানে বড্ড ম্যালেরিয়া হয়। এখানকার লোকেরা খালি জ্বরে ভোগে। তাই ভাত খেতে পাওয়াটা এদের কাছে একটা মস্ত বড় ব্যাপার। তাই

বোধহয় পরিচিতজনদের দেখলেই একে অন্যকে জিগ্যেস করে, ভাত খেয়েছেন তো? অর্থাৎ সুস্থ আছেন কিনা !'

শরৎচন্দ্রের কথা শেষ হতেই এবার সুরেন্দ্রলাল ও দিলীপকুমার হো ঃ হো ঃ করে হেসে উঠলেন।

জলধর কথা

'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সাহিত্যিক জলধর সেন। ১৩৪১ সালে তাঁর ৭৫ তম জন্মদিনে দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়। এই উপলক্ষে ঐ সময় 'জলধর কথা' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পুস্তিকায় লেখেন বাংলার বিখ্যাত লেখক-লেখিকারা। ব্রজমোহন দাসের ওপর পড়েছিল এই পুস্তিকা সম্পাদনার ভার।

জলধর সেনকে নিয়ে পুস্তিকা, সেখানে শরৎচন্দ্রের লেখা থাকবে না তা হয় ! শরৎচন্দ্র ছিলেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার লেখক। জলধর সেনের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট সুসম্পর্ক ছিল। 'জলধর কথা' পুস্তিকার জন্য শরৎচন্দ্রের লেখা অবশ্যই চাই। তাই ব্রজমোহন কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ছুটলেন শরৎচন্দ্রের হাওড়ার সামতাবেড়ের বাসায়। শরৎচন্দ্র ব্রজমোহনকে দেখে অবাক হলেন এবং জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার?'

ব্রজমোহন পুস্তিকায় লেখার জন্য অনুরোধ করলেন শরৎচন্দ্রকে। শরৎচন্দ্র হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তোমরা কার কথা বলছ? জলধরদা কথা? তিনি তো মারা গেছেন! তোমরা জাননা?'

ব্রজমোহন অবাক, বললেন, 'সে কী! আমরা তো কাল রাতে তাঁর কাছে নটা পর্যন্ত ছিলাম! কখন এমন হল?'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'তোমরা চলে আসার পরেই জলধরদার শরীর খারাপ হয়। তারপর ভোরে হার্টফেল! জলধরদার বয়েস হয়েছিল। তাছাড়া ব্লাডপ্রেসারও ছিল।'

ব্রজমোহন বললেন, 'আমরা শুনিনি। আপনি খবর পেলেন কী ভাবে?'

শরৎচন্দ্রর বললেন, 'উনার বাড়ি থেকে সকালে টেলিগ্রাম এসেছিল। আমার শরীরটাও ক'দিন ভাল যাচ্ছে না। না হলে একবার শেষ দেখা দেখে আসতাম।'

জলধর সেনের মৃত্যু সংবাদ শুনে বিমর্ষ হয়ে পড়লেন ব্রজমোহন ও তাঁর বন্ধুরা। এমন সময় কাজের লোক চা-জলখাবার নিয়ে এলে শরৎচন্দ্র বললেন, 'নাও হে, খেয়ে নাও। ভয় পেওনা, আমি লেখা দেব তোমাদের পুস্তিকায়।'

ব্রজমোহন বললেন, 'তবে যে বললেন জলধরবাবু মারা গেছেন।'

শরৎচন্দ্র এবার হাসতে হাসতে বললেন, 'না-না, জলধরদা মরেননি, তোমাদের

এমনি বলে দেখছিলাম, তোমরা কী বলো! নাও, তাড়াতাড়ি চা-জলখাবার খেয়ে নাও। হ্যাঁ, লেখাটা আমি তাড়াতাড়ি লিখে দেব।'

এ কথা শুনে স্বাভাবিক হলেন ব্রজমোহন ও তাঁর বন্ধুরা।

গুরুদেবের ক্ষতি

১৩৪৪ সালে 'বিচিত্রা' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য ধর্ম' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তৎকালীন পাঠক সমাজে প্রবন্ধটি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। এমনই এক আলাপ আলোচনা চলতে থাকে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার অফিসে। রয়েছেন কয়েকজন সাহিত্যিক ও কর্মীরা। আলোচনার বিষয় রবীন্দ্রনাথের 'সহিত্যধর্ম' প্রবন্ধ। আলোচনা যখন জমে উঠেছে তখন এলেন শরৎচন্দ্র, বললেন, 'কী আলোচনা হচ্ছে?' কথা বলতে বলতে শরৎচন্দ্রও ডুবে গেলেন আলোচনায়। এক সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে বললেন, ' শরৎদা, গুরুদেব যাঁদের সম্পর্কে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, আপনিও মনে হয় তাঁদের মধ্যে একজন। লেখাটিতে গুরুদেব যে সব অভিযোগ করেছেন সেগুলো দেখেছেন তো?'

শরৎচন্দ্র শুনে বললেন, 'গুরুদেব এই বলে আমার কী ক্ষতি করবেন? আমি নিজের অজান্তে তাঁর যা ক্ষতি করে বসে আছি তার তুলনায় এটা কিছুই না।'

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে বিস্মিত সকলেই। তাঁরা জানতে চাইলেন, ' আপনি গুরুদেবের ক্ষতি করেছেন, শরৎদা?'

শরৎচন্দ্র মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন, ' হ্যাঁ, ক্ষতি করেছি তো।'

প্রত্যেকে জানতে চাইলেন, ' কী ক্ষতি করেছেন?'

সকলে চাপ দিতে শরৎচন্দ্র বললেন, ' কী ক্ষতি শুনতে চাও? গুরুদেবের সঙ্গে গিরিজা বসুর আলাপ করিয়ে দিয়েছি। গিরিজা কেমন আড্ডাবাজ তা তো তোমরা জানই। তার ওপর তিনি কবিতাও লেখেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় এখন তিনি দু'বেলা গুরুদেবের কাছে যাতায়াত শুরু করবেন, কবিতা শোনাবেন, গল্প করবেন। গুরুদেব মুখে কিছুই বলবেন না, কেউ দেখা করতে এলে তিনি না বলতে পারবেন না। গিরিজা অনবরত গুরুদেবের কাছে যাবে আর তার ফলেলেখার ক্ষতি হবে রবীন্দ্রনাথের। আর এক লাইনও লিখতে হবে না গুরুদেবকে। গিরিজার জ্বালাতনে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠবেন। এটা ক্ষতি নয়?'

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে প্রত্যেকেই হো ঃ হো ঃ করে হেসে উঠলেন। শরৎচন্দ্র শেষে হেসে বললেন, 'গুরুদেব আমার যে ক্ষতি করেছেন তার তুলনায় বরং আমিই বেশি ক্ষতি করেছি গুরুদেবের।'

অরক্ষণীয়ার উপসংহার

শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত রচনা ' অরক্ষণীয়া' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। শেষ অংশ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য এলে অংশটি পড়ে দেখেন পত্রিকার অন্যতম সত্ত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। তিনি শরৎচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন। অংশটি পড়ে হরিদাস শরৎচন্দ্রকে শেষ অংশটা একটু অন্যরকম ভাবে লিখতে নির্দেশ দেন। হরিদাসের নির্দেশ পছন্দ হয় শরৎচন্দ্রের। তিনি উপসংহারটি পরিবর্তন করে দেন। পত্রিকায় সম্পূর্ণ প্রকাশের পর 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড সন্স' থেকে লেখাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এটা হরিদাস চট্টোপাধ্যায়দেরই প্রতিষ্ঠান।

' অরক্ষণীয়া' গ্রন্থাকারে প্রকাশের কিছুদিন পরে মফস্বলের একটি ক্লাব থেকে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে একটি চিঠি আসে। তাতে লেখা ঃ—

'অরক্ষণীয়া'র উপসংহার নিয়ে আমাদের মধ্যে এক দলের মত—জ্ঞানদাকে শ্মাশান থেকে নিয়ে যাবার পর অতুল তাকে বিয়ে করবে, শরৎবাবু এই ইঙ্গিত দিয়েছেন। অপর দল বলছে—না, তা কখনই নয়। আপনি যদি দয়া করে শরৎবাবুর কাছ থেকে তাঁর নিজের অভিমতটি জেনে দেন তো বড় ভাল হয়!'

হরিদাস এই পত্রের কথা শোনালেন শরৎচন্দ্রকে। শরৎচন্দ্র সব শুনে হাসতে হাসতে বললেন, ' আপনার কথা শুনেই তো এই বিপদ হল! আমি তো বেশ জ্ঞানদাকে জলে ডুবিয়ে মেরেছিলুম। তাতে অতুল বাঁচতো কালো মেয়ের হাত থেকে, আর বাঁচতো লেখক এবং প্রকাশক। এখন কী জবাব দেব? এমন আরো চিঠি এলেই গেলুম!'

শরৎচন্দ্র এরপর বললেন, ' ওরা জানতে চেয়েছে শ্মশান থেকে যাবার পর অতুল আর জ্ঞানদার কী হল—এই তো? আচ্ছা, আপনি লিখে দিন— শরৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়েছেন, জ্ঞানদা বা অতুল কারো সঙ্গে শরৎবাবুর দেখা হয়নি, তাই তিনি বলতে পারবেন না।'

শরৎচন্দ্রের এই মজার উত্তর শুনে হরিদাস হো ঃ হো ঃ করে হেসে উঠে বললেন, 'শরৎবাবু, আপনি পারেনও বটে!'

চরকা না যুদ্ধ

শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু কংগ্রেসের চরকা ও খদ্দরের ব্যাপারে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন না যে, চরকা কাটলেই স্বরাজ ত্বরান্বিত হবে। তবু কংগ্রেস চরকা কাটার প্রোগ্রাম নিয়েছিল বলেই তিনি চরকা কাটা শিখেছিলেন ও খদ্দর পরতেন। শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের হাওড়া জেলা কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন।

একবার কলকাতায় এসেছেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি তখনকার অন্যতম জাতীয়তাবাদী দৈনিক 'সার্ভেন্ট'-এর কার্যালয় দেখতে যান কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে। দলে ছিলেন শরৎচন্দ্রও। 'সার্ভেন্ট'-এর সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় উঠেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বাড়িতে। সেখান থেকেই যান 'সার্ভেন্ট' কার্যালয়ে। সেখানে গিয়ে গান্ধীজী সকলকে নিয়ে চরকা কাটতে চাইলেন। সেই মত চরকা আনা হল। শরৎচন্দ্র সহ অনেকেই গান্ধীজীর সঙ্গে চরকা কাটতে বসলেন। শরৎচন্দ্র চরকা কাটায় দক্ষ ছিলেন। তাঁর সুতো মিহি হচ্ছিল। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সুতো হচ্ছিল মোটা। তা দেখে গান্ধীজী রসিকতা করে বললেন, 'আরে! বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি যে চরকায় দড়ি কাটছেন!'

যদিও গন্ধীজী জানতে শরৎচন্দ্র চরকায় অবিশ্বাসী তবু তিনি শরৎচন্দ্রকে জিগ্যেস করলেন, ' আপনি চরকায় বিশ্বাস করেন?'

শরৎচন্দ্র বললেন, ' না, বিশ্বাস করি না।'

গান্ধীজী বললেন, ' তবু আপনি ভাল সুতো কাটছেন চরকায়।'

শরৎচন্দ্র বললেন, ' আমি আপনাকে ভালবাসি বলেই চরকায় সুতো কাটা শিখেছি। না হলে এতে আমার বিশ্বাস নেই।'

গান্ধীজী জানতে চাইলেন, ' আপনি কি বিশ্বাস করেন না চরকা কাটা স্বাধীনতার পক্ষে সহায়ক?'

শরৎচন্দ্র উত্তরে বললেন, 'না, আমি বিশ্বাস করি না চরকা কাটা স্বাধীনতার পক্ষে সহায়ক। আমি মনে করি স্বাধীনতা আসবে এক মাত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়েই।'

একথা শুনে গান্ধীজী চুপ করে গিয়ে চরকা কাটায় মন দিলেন।

দু টাঁকায় বন্ধু বিচ্ছেদ

শরৎচন্দ্র একবার দিল্লি কংগ্রেসে যোগ দিতে যান। ফেরার পথে দিল্লি থেকে যান বৃন্দাবনে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কাশীর 'উত্তরা' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও দিলীপকুমার রায়। দু জনকেই শরৎচন্দ্র বিশেষ পছন্দ করতেন। শরৎচন্দ্রের মেজভাই প্রভাসচন্দ্র যৌবনেই যোগ দেন রামকৃষ্ণ মিশনে। সন্ন্যাসী হবার পর তাঁর নাম হয় স্বামী বেদানন্দ। তিনি ঐ সময় বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন। শরৎচন্দ্র ওঠেন তাঁর মেজ ভাইয়ের আশ্রমে। সঙ্গে দুজন সঙ্গী। তাঁরা একদিন বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ড তীর্থস্থান দেখতে যান। তিনজন পাণ্ডা তাঁদের কুণ্ড দেখিয়ে ফেরার সময় তাঁদের টাঙ্গা ঘিরে 'এক আনা দিজিয়ে, দু আনা দিজিয়ে, তিন আনা দিজিয়ে' বলে বিরক্ত করতে

লাগল।

দিলীপকুমার ও সুরেশচন্দ্র ঠিক করতে পারলেন না পাণ্ডাদের কত দেওয়া যায়। তখন শরৎচন্দ্র পকেট থেকে দ'টাকা বের করে ছুঁড়ে দিলেন। কারো হাতে দিলেন না। পাণ্ডারা তখন ঐ টাকা নেবার জন্য হুড়োহুড়ি ফেলে দিল। আরোহীরা এই সুযোগে টাঙ্গা নিয়ে ছুটে চলল। দিলীপকুমার শরৎচন্দ্রকে বললেন, 'একটু সময়ের কুণ্ড দেখানোর জন্য ওদের দু'টাকা দিয়ে দিলেন?'

শরৎচন্দ্র উত্তরে হেসে বললেন, ' ঐ টাকা নিয়ে ওরা হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দিয়েছে। চিরকালের মত ওদের মধ্যে বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলুম।'

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে দিলীপকুমার ও সুরেশচন্দ্র হেসে উঠলেন। টাঙ্গা ছুটে চলল বৃন্দাবনের পথে।

দাড়ি বিভ্রাট

শরৎচন্দ্র খুব সুন্দর বানিয়ে গল্প বলতে পারতেন। রসচক্রের আড্ডায় তিনি মাঝে মাঝেই এরকম গল্প শোনাতেন। একবার তিনি এমনই এক মজার গল্প শোনান। সেটা হল—

রবীন্দ্রনাথের এক বিশিষ্ট বন্ধুর পাকা দাড়ি ছিল। তিনি বিলাতে গেলে অনেকেই তাঁকে রবীন্দ্রনাথ বলে ভুল করেন। রবীন্দ্রনাথের কানে এই কথা যায়। একবার তিনি বন্ধুটিকে ডেকে পাঠান। বন্ধুটি এলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেন, আপনি বিলাতে গেলে অনেকে আপনাকে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন তা আপনার দাড়ির জন্য। তাই লোকের যাতে আর না ভুল হয় তার জন্য বরং আপনি দাড়িটা কমিয়ে ফেলুন। বন্ধুটি বলেন আমার এত সাধের দাড়ি, কী করে কামাই! রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পরামর্শ দিয়ে বলেন, দাড়ি না কেটে তাহলে দাড়িতে মেহেন্দি করুন।

একথা শুনে বন্ধুটি রেগে গিয়ে বলেন, আমি মুসলমান নাকি, যে দাড়িতে মেহেন্দি করবো!

বেগতিক বুঝে রবীন্দ্রনাথ বন্ধুটির সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিলেন।

শরৎচন্দ্রর এই গল্প শুনে আসরের প্রত্যেকেই মজা পেতেন। আর একবার শরৎচন্দ্র কংগ্রেসকর্মী হেমন্তকুমার সরকারের কাছে একটি দাড়ি বিভ্রাটের গল্প শোনান। তিনি বলেন, হাওড়া শহরে একবার হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হয়। তখন আমি দাড়ি রাখতাম। ম্যাজিস্ট্রেট সেই সময় আমাকে মুসলমান মনে করে অনেকের সঙ্গে তলব করেন। শেষে আমি বলি, হুঁজুর, হাওড়া শহরে কি মুসলমানের অভাব? এই ব্রাহ্মণ সন্তানকে নিয়ে কেন অযথা টানাটানি করেন?

এরপর ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে চিনতে পেরে ছেড়ে দেন। আমি ঘরে ফিরেই দাড়ি

কামিয়ে ফেলি।

শরৎচন্দ্র একই কথাকে বিভিন্ন জনের কাছে বানিয়ে বানিয়ে বিভিন্ন রকম করে বলতেন। শরৎচন্দ্র ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের কাছে একটা গল্প শোনান। সেই গল্পেও দাড়ি বিভ্রাট। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে আসার পর অনেকদিন পর্যন্ত দাড়ি রেখেছিলেন। তারপর কেটে ফেলেন। কেন কেটে ফেলেন? সেটাই হল গল্প। তিনি বলেন, তখন আমি হাওড়ার বাজে শিবপুরে থাকি। সেখান থেকে যাই দিদির গ্রামে, নিছক বেড়াতে। ফেরার পথে ট্রেনে আমার পাশেই বসেছিল এক মুসলমান। সে আমার দাড়ি দেখে আমাকে মুসলমান মনে করে আমাকে এক খিলি পান খাওয়াতে আসে। এই ঘটনার পর আমি বাড়ি ফিরেই দাড়ি কমিয়ে ফেলি।

হিন্দু-মুসলমান বিবাদ

তখন হিন্দু-মুসলমান মিলন নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছে কংগ্রেস। শরৎচন্দ্র সেই সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে বললেন, ' আপনারা এত চেষ্টা করছেন, তবু হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথ খুঁজে পাচ্ছেন না! আমি একটা উপায় বাতলে দিচ্ছি, দেখুন চেষ্টা করে!'

দেশবন্ধু বললেন, ' কী উপায় ?'

শরৎচন্দ্র বললেন, ' যে সব এলাকায় মুসলমান বেশি সেখানে একটা ইংরেজি স্কুল খুলে দিন। ইংরেজির ছাব্বিশটা অক্ষর এবং বানান সমস্যা এসে মুসলমানদের এমন কাবু করবে যে, আর হাতে লাঠি তুলবে না, আপনি লাঠি খসে পড়বে এবং বার্লি খাওয়া নাড়িতে আর গরু হজম হবে না। তখন আপনি গো-বধ বন্ধ হবে। গো-বধ বন্ধ হলেই হিন্দু-মুসলমান বিবাদ মিটে যাবে।'

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে দেশবন্ধু না হেসে পারলেন না। তবে মজা করলেও শরৎচন্দ্র প্রকৃত অর্থে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ নিয়ে যথেষ্টই চিন্তিত ছিলেন।

মচ্ছরচচন্দ্র

শরৎচন্দ্র তখন ভাগলপুরে। একজন পিওন একটা চিঠি নিয়ে অনেক জায়গায় ঘুরে তাঁর কাছে এসে জিগ্যেস করলেন, ' বাবু, এখানে মচ্ছরচচন্দ্রবাবু বলে কেউ থাকেন?'

শরৎচন্দ্র বললেন, ' কই চিঠিটা একবার দেখি।'

শরৎচন্দ্র খামটা দেখে বললেন, ' এ আমার চিঠি।'

নাম লেখা—শ্রী মচ্ছরচচন্দ্র শর্মা।

পাশে বসা এক বন্ধু চিঠি দেখে শরৎচন্দ্রকে হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমার নাম মচ্ছরচচন্দ্র হল কী করে?'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'রসিকতা করেছে। নামটা সন্ধি করে দিয়েছে—শ্রীমৎ শরৎচন্দ্র

শর্মা । দাঁড়াও রসিকতার প্রত্যুত্তর দিচ্ছি।'

এই বলা মাত্র শরৎচন্দ্র বন্ধুকে একটি পাথর আনতে বললেন। পাথর নিয়ে এলেন বন্ধুটি। শরৎচন্দ্র পাথরটি ভাল করে প্যাক করে একটি চিঠি লিখে চিঠিটি প্যাকের ভেতর পুরে দিলেন। এরপর ডাকঘরে গিয়ে ভি পি করে প্যাকটি একজনের নামে পাঠিয়ে দিলেন। আসলে এটা পাঠানো হল শরৎচন্দ্রের এক বন্ধুর কাছে, যিনি শৎরচন্দ্রকে রসিকতা করে ঐ চিঠি লিখেছেন। শরৎচন্দ্র চিঠি পড়েই চিনতে পেরেছিলেন বন্ধুকে। প্যাক হাতে পেয়ে বন্ধুটি দেখেন সঙ্গে এক চিঠি। তাতে লেখা ' তোমার কুশল জেনে আমার মনের পাথরভার নামিয়ে দিলুম।'

বন্ধুদের সঙ্গে শরৎচন্দ্র সর্বদাই এ রকম রসিকতায় মেতে থাকতেন।

ট্রামে অচল টাকা

শরৎচন্দ্র একবার উপেন গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে ট্রামে করে চলেছেন।

কন্ডাক্টর এলে উপেন পকেট থেকে এক টাকা বের করে দেন। কন্ডাক্টর টাকা নিয়ে না দেখে ব্যাগে পুরে টিকিট কাটতে যাবেন, এমন সময় শরৎচন্দ্র উপেনের কানে ফিস ফিস করে বললেন, 'সেই টাকাটা না?'

কন্ডাক্টরকে শুনিয়েই একথা বললেন শরৎচন্দ্র। কন্ডাক্টর ভাবলেন, এরা বুঝি অচল টাকা চালিয়েছে। সেই টাকা ব্যাগে অন্য টাকার সঙ্গে মিশে গেছে। অনেক নাড়াচাড়া করেও খুঁজে পাওয়া গেল না। কন্ডাক্টর তখন বললেন, ' অচল টাকা চালালে তো? আমারই লোকসান যাবে!'

উপেন ও শরৎচন্দ্র তখন হেসে ফেললেন। নামার সময় শরৎচন্দ্র কন্ডাক্টরকে বললেন, ' অচল পয়সা দিইনি, একটু মজা করলাম। কিছু মনে করবেন না।'

এবার মুখে হাসি ফুটলো কন্ডাক্টরের।

পুরোহিত ক্লাস

শরৎচন্দ্র মুঙ্গেরে গেছেন তাঁর নিজের ভাই-এর বিয়ে উপলক্ষে। কিন্তু ভুলে গেছেন পুরোহিত নিয়ে যেতে। কী করা যায়! পুরোহিত ছাড়া বিয়ে তো হবে না! শরৎচন্দ্রের এক বিশিষ্ট সাহিত্যিক বন্ধু তাঁর গৃহপুরোহিতকে ভার দিলেন বিবাহ অনুষ্ঠানের। পুরোহিত আসায় সুশৃঙ্খলভাবে বিবাহের কাজ মিটে গেল। নিশ্চিন্ত মনে শরৎচন্দ্র পুরোহিতের কাছে জানতে চাইলেন, 'পুরোহিতমশাই, আপনার দক্ষিণা কত?'

শরৎচন্দ্র তাঁর যজমানের পরিচিত বলে পুরোহিত দক্ষিণার কথা উল্লেখ করতে না পেরে শুধু বললেন, ' আপনার যা ইচ্ছে তাই দিন।'

শরৎচন্দ্র তখন পুরেহিতকে জিগ্যেস করলেন, ' সে তো বুঝলাম, তা আপনি কোন ক্লাসের?'

এমন কথা শুনে স্বভাবতই অবাক পুরোহিত। এর আগে কেউ তাঁকে এমন প্রশ্ন করেন নি। পুরোহিত শরৎচন্দ্রকে জিগ্যেস করলেন, ' কোন ক্লাসের কথার অর্থ কী?' শরৎচন্দ্র এবার হাসতে হাসতে বললেন, ' দেখুন, পুরোহিতদের অনেক ক্লাস, যেমন ঘটক ক্লাস, বাজার সরকার ক্লাস, মাস্টার ক্লাস ইত্যাদি।'

একথা শুনে পুরোহিত হেসে ফেললেন এবং বললেন, ' না না, আমি ওসব নয়, আমি শুধুই পুরোহিত ক্লাস।'

পুরোহিতের কথা শুনে শরৎচন্দ্র হাসলেন এবং পুরোহিতকে আশাতীত দক্ষিণা দিলেন। দক্ষিণা হাতে পেয়ে পুরোহিত নব দম্পতিকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

সাপের মাথায় মণি

একদিন শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও সুরেন গঙ্গোপাধ্যায়—তিন মামা-ভাগ্নে ভবানীপুরের জগুবাবু বাজারের ধারে এক ভাবে রাস্তার এক গর্তের দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁদের এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে অনেকের কৌতূহল হল। এক ব্যক্তি শেষমেষ জিগ্যেস করে বসলেন, ' কী হয়েছে এখানে? কী আছে এই গর্তে?'

নিরুত্তর তিনজন। কোনো কথারই উত্তর দিলেন না। শুধু আগের মত গর্তের দিকে তাকিয়ে থাকলেন এবং নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, ' দ্যাখ, এবার যেন লাল আভা দেখা দিচ্ছে না!'

তিনজনকে দেখে আরও কয়েকজন জড়ো হলেন সেইখানে। তাঁরা জানতে চাইলেন, ' মশাই, কী হয়েছে? কী ব্যাপার?'

শরৎচন্দ্র এবার গম্ভীর মুখে সুরেনকে বললেন, ' দ্যাখ, নীলচে আভা!'

সুরেন বললেন, 'এই তো এবার আসমানি রঙ, এই দ্যাখ, এবার কেমন কমলালেবুর রঙ ছড়াচ্ছে!'

তখন বিজ্ঞের মত উপেন্দ্র বললেন, 'এই চুপ চুপ, আস্তে, না হলে পালিয়ে যাবে!'

আশেপাশের লোকজন কিছুই বুঝছেন না। তাঁরা জানতে চাইলেন, ' কী পালাবে? কী পালাবে?'

প্রশ্ন শুনে তিনজন একসঙ্গে উত্তর দিলেন, ' সাপ! সাপ!'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিন জন ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলেন। উপেন্দ্র তখন একটু সাহস দেখিয়ে উঁকি মেরে বলে উঠলেন, 'এই, আলোগুলো ওর মাথার মণির, কেমন সুন্দর আভা ছড়াচ্ছে দেখছিস না, কখনো লাল, কখনো নীল, কখনো আসমানি, কখনো কমলা।'

কথা শেষ হতে না হতেই শরৎচন্দ্র বলে উঠলেন, 'ঐ দ্যাখ, আবার আলো ছড়াচ্ছে! এবার একেবারে পান্নার মতো সবুজ ! দ্যাখ, দ্যাখ!'

একথা শুনে রঙ দেখার জন্য অনেক মানুষ মুখ বাড়াতে লাগলেন। ক্রমে ভিড় বাড়তে লাগল। সেই ফাঁকে শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্র এবং সুরেন চুপি চুপি সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। এই ঘটনা সকালের।

বিকেলে তিনজন বেড়াতে বেড়িয়ে সেইখানে এসে দেখেন সেই গর্তের সামনে জনতার ভিড়!

এমন ভিড় যে রাস্তায় চলার উপায় নেই। গাড়িঘোড়া সব বন্ধ। সে এক হৈ হৈ ব্যাপার।

তিনজন ভিড়ের কাছে গিয়ে একজনকে জিগ্যেস করলেন, 'দাদা, এখানে এত ভিড় কেন? কী হয়েছে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'কী আশ্চর্য কাণ্ড! গর্তের ভেতরে একটা সাপ! তার মাথার মণি জ্বলছে! কখনো লাল, কখনো নীল, কখনো কমলা। আমি অবশ্য ওই সব রঙ দেখিনি, সবুজ দেখেছি! যান, গিয়ে দেখুন! তবে যা ভিড়, এগোতে পারবেন না, তবু একবার চেষ্টা করে দেখুন, যান, যান!'

হাসি পাচ্ছে, কিন্তু হাসা চলবে না, অতিকষ্টে তিনজন হাসি চাপলেন। কোথায় সাপ! কোথায় মণি! তাঁরা তো কেবল বদমায়েসি করেই সকালে এমন খবর ছড়িয়েছেন। তবে এখন, এই জনতার ভিড়ে তা স্বীকার করা যাবে না। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। বরং যা হচ্ছে হোক। একটু দূরে গিয়ে তিনজন আর হাসি চাপতে পারলেন না।

ছেলেবেলায় শরৎচন্দ্র উপেন্দ্র ও সুরেনকে সঙ্গে নিয়ে এরকম অনেক মজার কাণ্ড ঘটিয়েছেন।

দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের রঙ্গ রসিকতা

জন্ম সাল-১৮৮২

মৃত্যুসাল-১৯৬৯

ট্যাক্সি

রসিক সাহিত্যিক ছিলেন দাদাঠাকুর। তাঁর প্রকৃত নাম শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। কিন্তু দাদাঠাকুর নামেই তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি 'বিদূষক' পত্রিকার সম্পাদক-প্রকাশক। শুধু তাই নয়, তিনি রাস্তায় ঘুরে ঘুরে নিজেই পত্রিকা বিক্রি করতেন। অন্যদিকে তিনি ছিলেন প্রত্যুৎপন্নমতি। সময় সুযোগ পেলেই তিনি বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতায় মেতে উঠতেন।

দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের ভক্তের অভাব ছিল না। কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নি নির্মলচন্দ্র তাঁর খুব বড় ভক্ত ছিলেন। দাদাঠাকুর ঘুরে ঘুরে পত্রিকা বিক্রি করেন দেখে নির্মলচন্দ্র একদিন তাঁকে বলেন, 'আপনি বিদূষক বিক্রি করার পর প্রতিদিন বিকেল পাঁচটার সময় আমার বাড়িতে বৈকালিক জলযোগ সারবেন।'

সেই কথামত দাদাঠাকুর বিকাল পাঁচটায় জলযোগ সেরে আবার পত্রিকা বিক্রি করতে বের হতেন।

একদিন নির্মলচন্দ্রের বাড়িতে দাদাঠাকুরের নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ হল। নির্মলচন্দ্রের মা-র একটি ব্রত উপলক্ষে এই নিমন্ত্রণ। নির্মলচন্দ্র দাদাঠাকুরকে তৃপ্তি করে খাওয়ালেন। খাওয়ার শেষে হাত মুখ ধুয়ে দাদাঠাকুর নির্মলচন্দ্রের মা-কে বললেন, ' বেশ খেলাম, এবার আসি, অনেক রাত হলো, আমাকে অনেকটা পথ যেতে হবে।'

নির্মলচন্দ্রের মা তখন নির্মলচন্দ্রকে বললেন, ' বাবা নির্মল, দেখিস, পণ্ডিতমশাই যেন পায়ে হেঁটে বাড়ি না যান, উনাকে পাথেয় দিস।'

মায়ের নির্দেশমত নির্মলচন্দ্র দাদাঠাকুরকে ওয়েলিংটন থেকে বাগমারি পর্যন্ত তিন টাকা ট্যাক্সিভাড়া দিয়ে বললেন, 'পণ্ডিতমশাই, এত রাতে আপনাকে আর পায়ে হেঁটে যেতে হবে না, একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেবেন।'

দাদাঠাকুর টাকাটা নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজে রেখে প্রতিদিনের অভ্যাসমত পায়ে হেঁটেই ফিরলেন। পরের দিন গজেনদার আড্ডার আসরে এলে নির্মলচন্দ্রের সামনেই দাদাঠাকুর রসিকতা করে গতরাতের উপরি উপার্জনের-কথা সকলের সামনে বললেন। নির্মলচন্দ্র অবশ্য সে দিন কিছু বললেন না।

এর কিছু দিন পরে নির্মলচন্দ্রের বাড়িতে আবার নৈশভোজের নিমন্ত্রণ হল দাদাঠাকুরের। খাওয়া দাওয়ার শেষে বাড়ি ফেরার সময় আগের দিনের মত নির্মলচন্দ্র দাদাঠাকুরকে আবার তিন টাকা দিলেন এবং চাকরকে ডেকে বললেন, ' ওরে, দাদাঠাকুরের জন্য একটা ট্যাক্সি ডেকে দে তো, উনি বাড়ি ফিরবেন।'

কথা মত চাকর ট্যাক্সি ডেকে দিলেন। একপ্রকার বাধ্য হয়েই হাসতে হাসতে দাদাঠাকুর ট্যাক্সিতে উঠলেন। পরের দিন গজেনদার আড্ডার আসরে নির্মলচন্দ্র সকলের সামনে হাসতে হাসতে দাদাঠাকুরকে জব্দ করার কথা বললেন। দাদাঠাকুর সব শুনে মুচকি হেসে বললেন, ' আপনি ভাবছেন গতরাতে আমাকে জব্দ করেছেন! ভাবছেন আমাকে ট্যাক্সিতে পুরে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়েছেন! মোটেই না। কারণ আমি বাড়ি পর্যন্ত পুরো পথ ট্যাক্সিতে যাইনি। মেডিকেল কলেজের সামনে নেমে আটআনা ভাড়া দিয়ে ট্যাক্সিওলাকে বিদেয় করছি। এবার অঙ্ক কষে দেখুন আপনি কত পারসেন্ট আমাকে ঠকিয়েছেন আর কত পারসেন্ট নিজে ঠকেছেন।'

এ কথা শুনে নির্মলচন্দ্র বললেন, ' দাদাঠাকুর, সত্যিই আপনি ধন্য, কই পায়ের ধুলো দিন একটু।'

অন্য শ্রোতারা আর না হেসে থাকতে পারেন?

গজেন ঘোষের আড্ডায়

দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত যখন কলকাতার বাগমারিতে এসেছেন, তখন 'বিদূষক' পত্রিকাটি তিনি নিজেই শহরের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতেন। এই পয়সায় তিনি সংসার চালাতেন। সারাদিন পত্রিকা বিক্রির পর বিকেলে যেতেন নির্মলচন্দ্রের বাড়িতে বৈকালিক জলযোগ সারতে, তারপর আবার কাগজ বিক্রি।

সন্ধ্যায় যেতেন আটত্রিশ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বৈঠকখানায় গজেনদার আড্ডায়। সেই আড্ডার আসরে আসতেন সেই সময়ের অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিক। দাদাঠাকুর গজেন ঘোষের স্ত্রীকে 'বিদূষক' পত্রিকা বিক্রির খুচরো পয়সাগুলি দিতেন, তার বদলে নিতেন টাকা আদুলি সিকি। গজেন ঘোষের স্ত্রী নিয়মিত দাদাঠাকুরকে লুচি তরকারি,মিষ্টি, চা ইত্যাদি যত্ন করে খাওয়াতেন। পেট ভর্তি থাকলে দাদাঠাকুর শুধু চা খেতেন। কিন্তু যেদিন খুব খিদে পেত সেদিন 'আহ্লাদে আটখানা, আহ্লাদে আটখানা' ব'লে গান গাইতে গাইতে ঢুকতেন। আসরের কেউ ব্যাপারটা না বুঝলেও গজেন ঘোষের স্ত্রী ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারতেন যে আজ দাদাঠাকুর আটখানা লুচি চাইছেন! তিনি তখন সেই মত খাবার পরিবেশন করে খাওয়াতেন দাদাঠাকুরকে। পেট ভরে খাওয়া দাওয়া সেরে ঢেকুর তুলতে তুলতে আসরে এসে বসতেন দাদাঠাকুর। তারপর বেশ কিছুক্ষণ রঙ্গ রসিকতায় মাতিয়ে তুলতেন সকলকে।

গৃহকর্তা গজেন ঘোষ দাদাঠাকুরকে বিশেষ পছন্দ করতেন।

কেন পণ্ডিত

এক আড্ডার আসরে একজন ব্যক্তি রসিকতা করে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতকে জিগ্যেস করলেন, ' দাদাঠাকুর, আপনার উপাধিটা কী করে পণ্ডিত হলো?'

প্রশ্ন শুনে মুচকি হেসে রসিক দাদাঠাকুর উত্তরে বললেন, 'কেন হবে না বলো, কোনও বস্তু যখন খণ্ড খণ্ড হয় তখন তাকে বলে খণ্ডিত, তেমনি আমি যখন যেখানে যাই সেখানকার সব কাজ পণ্ড করে দিই—তাই আমি পণ্ডিত।'

এ রকম মজার উত্তর পেয়ে প্রশ্নকর্তা সহ আসরের সকলে হেসে উঠলেন।

গণেশের শুঁড়

শরৎকালে দুর্গাপুজোর সময় একবার দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের পুত্রর অসুখ হয়। স্বভাবতই দাদাঠাকুর চিন্তিত। তাঁর স্ত্রী পুজোর দিন সকালে প্রতিমা দর্শন করে এসে দাদাঠাকুরকে বললেন, ' ছেলের অসুখের জন্য মায়ের কাছে গিয়ে মানত করে এলাম। মাকে অনেক করে বলে এলান— মা, আমার ছেলেকে ভাল করে দাও, সামনের বছর তোমাকে ভোগ দেব।'

স্ত্রীর এ কথা শুনে দাদাঠাকুর বললেন, ' ঠাকুরের কাছে গিয়ে মানত করার কী আছে? ছেলে ভাল হলে এমনিই হবে, তার জন্য ভাল চিকিৎসার প্রয়োজন। তা তো

করানো হচ্ছেই। তাছাড়া দুর্গা কী-ই বা করবেন! যিনি নিজের ছেলে গণেশের শুঁড় ভাল করতে পারেন না, তিনি তোমার ছেলেকে সারিয়ে তুলবেন কী ভাবে?'

অবশ্য এই কথা তাঁর স্ত্রীর মনঃপুত হল না। দাদাঠাকুর ছিলেন স্পষ্টবক্তা।

রাস-ঝুলন

একদিন সকালে দাদাঠাকুর নলিনীকান্ত সরকারের বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'বুঝলে হে নলিনী, তোমাদের এই কলকাতা এক অদ্ভুত শহর।'

নলিনী বললেন, 'কেন, অমন কথা বলছেন কেন? এই শহরের আবার কী হল?'

দাদাঠাকুর বললেন, ' কী আবার হবে? পাঁজিতে লেখা আছে বছরে একদিন ঝুলন, একদিন রাস। কিন্তু তোমাদের এই কলকাতা শহরে দেখছি নিত্য ঝুলন, নিত্য রাস!'

নলিনী শুনে বললেন, ' সে কী! কোথায় দেখলেন নিত্য ঝুলন, নিত্য রাস?'

দাদাঠাকুর তখন বললেন, 'কেন হে, তোমাদের বাসে-ট্রামেই তো নিত্য ঝুলন, নিত্য রাস!'

একথা শুনে নলিনী হেসে উঠলেন।

নলিনী পণ্ডিতের সম্পত্তি

একদিন রাতে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ও নলিনীকান্ত সরকার পাশাপাশি শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। গভীর রাতে হঠাৎ দাদাঠাকুর ঘুম ভেঙে উঠে ঘুমন্ত নলিনীকান্তকে জাগিয়ে বললেন, ' ও নলিনী, একটা বড় জিনিস আবিষ্কার করেছি হে, ওঠো ওঠো, এটা ঘুমোবার সময় নয়!'

ডাক শুনে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে নলিনী জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার?'

দাদাঠাকুর বললেন, ' সুখবর! সাহিত্য পরিষদের চির সদস্য সাহিত্যিক নলিনী পণ্ডিতের সব সম্পত্তি তো আমার আর তোমার! হ্যাঁ, আমাদের দুজনের।'

নলিনী বললেন, ' কী রকম শুনি?'

দাদাঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, ' তুমি নলিনী আর আমি পণ্ডিত। দুজন মিলে নলিনী পণ্ডিত। নয় কি?'

এ কথা শুনে নলিনীকান্ত গভীর রাতেও হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন।

গরুর ছানা

নলিনীকান্ত সরকারের মেয়ের জন্মদিনে অন্যান্যদের সঙ্গে নিমন্ত্রিত দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতও। সকলের সঙ্গে খেতে বসেছেন দাদাঠাকুর। সুস্বাদু বিভিন্ন পদ। তৃপ্তি করে খাচ্ছেন। একজন পরিবেশক দাদাঠাকুরের পাতে ছানার ডালনা দিয়ে গেলেন। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নলিনীকান্ত বললেন, 'দাদাঠাকুর, গরুর ছানার ডালনা আর একটু নেবেন নাকি?'

সঙ্গে সঙ্গে দাদাঠাকুর বললেন, ' দাও ভাই, গরুর ছানার অকেশনেই তো এসেছি।'

এ কথা শুনে নলিনীকান্ত ও অন্যরা হেসে উঠলেন।

পয়সার গরম

দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত শীতকালে একটি সাহিত্যসভায় আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। সভার অন্য অতিথিরা অনেকেই দামী শাল ও জমকালো পোশাক গায়ে দিয়ে এসেছেন। শীতের রাতে কনকনে ঠাণ্ডা! দাদাঠাকুরের তাতে কোনো হেলদোল নেই। তিনি এসেছেন খালি গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে। যেমন ভাবে সব জায়গায় যান, সেই ভাবেই। দাদাঠাকুরের এই পোশাক দেখে একজন পরিচিত ব্যক্তি বললেন, ' আপনি এই শীতের রাত্রে অন্তত একটা গরম কাপড় জড়িয়ে আসতে পারতেন। শীত করছে না আপনার? আমরা তো এত পোশাক পরেও ঠাণ্ডায় কাঁপছি।'

এবার দাদাঠাকুরের উত্তর দেবার পালা। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, ' শীত করবে কেন? পয়সায় গরম হয়ে আছি।'

এই বলে তিনি ধুতির ট্যাঁক থেকে অনেক পয়সা বের করে দেখালেন। ব্যক্তিটি আর কিছু বলতে পারলেন না। পাল্টাপালটি উত্তর দিতে দাদাঠাকুর ছিলেন ভীষণ পটু। দাদাঠাকুর যেন আধুনিক যুগের বিদূষক গোপাল ভাঁড়!

এ ডেড স্কুল

দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত অল্পবয়সে যখন স্কুলে পড়তেন তখন এক মজার কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন। কী কাণ্ড?

একদিন তাদের গ্রামের স্কুলে বিদ্যালয় পরিদর্শক বা স্কুল ইন্সপেকটর আসা উপলক্ষে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। একদিকে রান্না হচ্ছে, অন্য দিকে খাবার আয়োজন। সে এক হৈ হৈ কাণ্ড। ছাত্ররা খেতে বসেছে, শিক্ষকরা খাদ্য পরিবেশন

করছেন। সবকিছু তদারক করছেন প্রধান শিক্ষক। খেতে বসে ছোট্ট শরৎচন্দ্র পণ্ডিত এ সব কাণ্ড দেখে এক বন্ধুকে ফিসফিস করে বললেন, 'দ্যাখ দ্যাখ, স্কুলের পিতৃশ্রাদ্ধ হচ্ছে!'

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক শিক্ষকের কানে গেল কথাটা। তিনি রেগে গিয়ে বললেন, ' ওকে কী বললি?'

মিথ্যা বললেন না শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। সব শুনে রেগে গিয়ে সেই শিক্ষক বললেন, 'জানিস না এটা এডেড স্কুল?'

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত বললেন, ' হ্যাঁ স্যার, এটা এ ডেড স্কুল।'

এই কথা শুনে ভীষণ রেগে গেলেন সেই শিক্ষক এবং বললেন, ' তুই বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থাক, এই তোর শাস্তি।'

দমবার পাত্র নন শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। তিনি বললেন, ' স্যার ইন্সপেকটর এসে যদি জানতে চান কেন আমি বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে তখন কিন্তু আমি সত্যি কথাই বলব।'

এ কথা শুনে মুস্কিলে পড়ে গেলেন শিক্ষক ও বসতে বললেন শরৎচন্দ্র পণ্ডিতকে।

কাণ্ড দেখে ছাত্রদের মুখে মুচকি হাসি।

ঠাকুর ও পণ্ডিত

এক পরিচিত ভদ্রলোক একদিন দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতকে জিগ্যেস করলেন, 'মশাই, আপনি রবি ঠাকুরকে দেখেছেন?'

প্রশ্নের উত্তরে হাসতে হাসতে দাদাঠাকুর বললেন, ' না দেখিনি, তবে দেখা হলে আমি বলতুম, আপনি যেমন ঠাকুর, আমিও তেমন পণ্ডিত।'

এ কথা শুনে সেই ভদ্রলোক হেসে উঠলেন।

দানী দেখলেই

সাহিত্যিক দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত একদিন হাতিবাগান মোড়ে দাঁড়িয়ে তাঁর সম্পাদিত ও প্রকাশিত পত্রিকা 'বিদূষক' বিক্রি করছেন। এমন সময় তাঁর সঙ্গে দেখা এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি একজন নাট্যপ্রেমী। ভদ্রলোক দাদাঠাকুরকে নিয়ে গেলেন আর্ট থিয়েটারের ম্যানেজার অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের ঘরে। সেই ঘরে অপরেশবাবু সঙ্গে তখন আড্ডা দিচ্ছেন জীবনবাবু, দীনুবাবু, প্রবোধ গুহ ও তিনকড়ি চক্রবর্তী। দীনুবাবু দাদাঠাকুরকে আসতে দেখে হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, 'আজকাল চোখে ভাল দেখছি না। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।'

প্রতি নমস্কার জানিয়ে দাদাঠাকুর হাসতে হাসতে দীনুবাবুর পাশে গিয়ে বসলেও ও গল্প জুড়ে দিলেন। তাই দেখে তিনকড়ি চক্রবর্তী হাসতে হাসতে বললেন, 'ও পণ্ডিতমশাই, আমাদের দিকেও এখটু কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।'

দাদাঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, 'গরীব ব্রহ্মণে দানী দেখলেই তাঁর কাছে যাই। আপনার তিনটে কড়ি একমাত্র বামুনের হুঁকোয় লাগনো ছাড়া আর কোনো কাজে লাগত না।'

দাদাঠাকুরের কথা শুনে আড্ডার আসরের সকলেই হোঃ হোঃ হেসে উঠলেন।

নির্বাচনের ফলাফল

বহরমপুর পৌরসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের দুই পরিচিত ব্যক্তি রমনীমোহন ও নীলমণি ভট্টাচার্য। অনেকেই দাদাঠাকুরের কাছে জানতে চাইলেন, 'ভোটে কে জিতবে?'

দাদাঠাকুরের উত্তর, 'রমনী জিতবে, নীলমণি হেরে যাবে।'

ভোটের শেষে ফলাফল যখন বের হল তখন দেখা গেল দাদাঠাকুরের কথাই ঠিক। রমনীমোহনই জিতেছেন।

সবাই দাদাঠাকুরের কাছে জানতে চাইলেন, 'আশ্চর্য! কী করে আগে থেকে জানলেন ভোটের ফলাফল কী হবে?'

দাদাঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, 'ও তো আমি আগেই জানতাম। নীলমণি (Nil money) কখনও রমনীর (Raw money-র) সঙ্গে পারে?' এ কথা শুনে সবাই হেসে ওঠেন।

পেটের মধ্যে রায়ট

দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ছিলেন মধ্যবিত্ত নিপাট বাঙালি। অত্যন্ত সাদামাঠা জীবনযাপন করতেন। আড়ম্বর বা বড়লোকিয়ানা তাঁর ধাতে সইতে না। এমনকি বড়লোকের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েও তিনি স্বাভাবিক থাকতে পারতেন না। বড়লোকের নিমন্ত্রণে তিনি প্রাণ খুঁজে পেতেন না। তিনি মেকি বড়লোকের ওপর হাড়ে চটা ছিলেন। একবার তিনি এক বড়লোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে পরের দিন সকালে ছাপাখানায় পত্রিকার কাজ করতে এসে ঢেকুর তুলে নলিনীকান্ত সরকারকে বললেন, 'ওহে নলিনী, একটু তামাক সাজ দেখি, শরীরটা ভাল নেই।'

নলিনী জানতে চাইলেন, 'কেন, কী হল?'

দাদাঠাকুর বললেন, ' বুঝলে না, কালকের ঐ ব্রাহ্মণ ভোজনের জের, সারারাত পেট্রিয়ট হয়ে ছটফট করেছি বিছানায় পড়ে।'

নলিনী অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কী বললেন? পেট্রিয়ট হয়ে! সেটা আবার কী?'

দাদাঠাকুর উত্তর দিলেন, ' পেটের মধ্যে রায়ট বাধে বলেই তো লোকে পেট্রিয়ট হয়। আসলে লুচি, মাছ, মাংস, পোলাও, মিষ্টি সব পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ায়, সেই সব অপরিচিতদের দেখে, যারা পেটের স্থায়ী বাসিন্দা, ডাল-ভাত-চচ্চড়িরা একসঙ্গে ' হু আর ইউ, হু অর ইউ' বলে চিৎকার করে রায়ট বাঁধিয়ে দিল। সারারাত পেটের মধ্যে কী হট্টগোল! আমি তো সহ্যই করতে পারিনি। কষ্ট পেয়েছি। তোমার কাছে যখন এলুম তখন একবার ঢেকুরের মধ্য দিয়ে ' হু আর ইউ' বলে হাঁক ছাড়ল। শুনতে পেলে না?' একথা শুনে নলিনীকান্ত হেসে উঠলেন।

লক্ষ্য ও আদর্শ

লালগোলার মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় একবার দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করেন। মহারাজা বিখ্যাত ছিলেন দানশীলতার জন্য। দাদাঠাকুর লালগোলায় গেলেন মহারাজার আমন্ত্রণে। মহারাজা দাদাঠাকুরকে বিশেষভাবে খাতির যত্ন করলেন। দু'জনে নানা বিষয়ে কথাবর্তা বলতে লাগলেন। মহারাজা দাদাঠাকুরের লেখা পত্রিকার পাতায় পড়তেন ও দাদাঠাকুরকে বিশেষ পছন্দ করতেন। দাদাঠাকুরও সম্মান করতেন মহারাজাকে। দু'জনের কথাবার্তার মধ্যে কথা প্রসঙ্গে মহারাজা দাদাঠাকুরকে বললেন, 'পণ্ডিতমশাই, আপনি তো "জঙ্গিপুর সংবাদ" সাপ্তাহিক পত্রিকাটি চালাচ্ছেন, এই বিষয়ে আপনার যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও আছে। একটা কথা আপনার কাছে জানতে চাই, আপনার কাগজের চেয়ে বড় আকারের কাগজ, যাতে রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লেখা থাকবে, এই রকম একটা সাপ্তাহিক কাগজ বের করতে হলে গোড়ায় কী রকম মূলধন দরকার হতে পারে বলতে পারবেন?'

মহারাজার কথা শুনে দাদাঠাকুর ভাবলেন, মহারাজা হয়তো একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করবেন ঠিক করেছেন, তাই এই কথা জানতে চাইছেন। তখন দাদাঠাকুর বললেন, ' মূলধনের পরিমান হঠাৎ করে এখনই ঠিক বলা কঠিন। তবে নিজস্ব ছাপাখানা যদি থাকে তাহলে আনুমানিক পঁচিশ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে এই কাজে নামা যেতে পারে।'

একথা শুনে মহারাজা দাদাঠাকুরকে বললেন, ' তা বেশ। এবার শুনুন, যে উদ্দেশ্যে আমি আপনাকে ডেকে এনেছি, আমি বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছি কী করে আপনার "জঙ্গিপুর সংবাদ" কাগজখানাকে আরো উন্নত করা যায়। আসলে এই পরামর্শের জন্যই মূলত আপনার সাক্ষাতের প্রয়োজন ছিল। পণ্ডিতমশাই, আমি আপনাকে পঁচিশ হাজার টাকা দিচ্ছি। আপনি আপনার কাগজখানাকে আরও উন্নত আরও বড় করুন। না না, এ টাকা ঋণ নয়।'

মহারাজার এই প্রস্তাব শুনে কিছুক্ষণ চুপ থেকে দাদাঠাকুর মহারাজাকে বিনীতভাবে বললেন, 'মহারাজ, আপনার এই অনুগ্রহ চিরদিন আমার স্মরণে থাকবে। কিন্তু আমারও যে কিছু বক্তব্য আছে। আমি মনে করি প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে একটা লক্ষ্য থাকা উচিত। আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য মানুষের একটা আদর্শকে অবলম্বন করা উচিত। সুতরাং আমার জীবনেও একটা লক্ষ্য ও আদর্শ আছে। আমার লক্ষ্য বড়লোক হওয়া এবং আপনার মত বড়লোক হওয়া। কারণ আমাদের জঙ্গিপুর মহকুমায় আপনিই সবচেয়ে বড়লোক। সেই জন্য আপনিই আমার আদর্শ। আমার প্রধান লক্ষ্য একদিন লালগোলার মহারাজের মত বড়লোক হব। মহারাজ, ভেবে দেখুন, আপনারাই কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে আমার এই লক্ষ্যে পৌঁছনো কি উচিত কাজ হবে?'

দাদাঠাকুরের কথা শুনে মহারাজা মাথা নেড়ে বললেন, ' তা বটে, আপনি ঠিকই বলেছেন।'

এরপর দাদাঠাকুর মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে নিজের ছাপাখানায় ফিরে এলেন। দাদাঠাকুর অন্যের দান গ্রহণ করা পছন্দ করতেন না। তাঁর কাছে আত্মসম্মান ছিল সবচেয়ে বড়ো। তাই তিনি কোনো বিষয়েই কারোর কাছে মাথা হেঁট করেননি। নিজের যতটুকু সামর্থ, তাই নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন।

জেরার মুখে

বিপ্লবী নলিনীকান্ত সরকার একসময় বেশ কিছুদিন দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের কাছে আত্মগোপন করে ছিলেন। নলিনীকান্ত দাদাঠাকুরের কাছে ছাপাখানা ও 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় কাজ করার পাশাপাশি লুকিয়ে থাকা পলাতক বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। বেশ কয়েকজন বিপ্লবীও মাঝেমাঝেই ছাপাখানায় আসতেন নলিনীকান্তর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। একদিন এক কনস্টেবল এসে নলিনীকান্তকে জানালেন, ' আপনাকে ইনস্পেকটরবাবু ডাকছেন।'

ইনস্পেকটর প্রভাতচন্দ্র দত্তর সঙ্গে নলিনীকান্তর রীতিমত ঘনিষ্ঠতা ছিল। প্রভাতচন্দ্র ছিলেন দাদাঠাকুরের বিশেষ বন্ধু। নলিনীকান্ত যে একজন বিপ্লবী এ কথা প্রভাতচন্দ্র আগে অবশ্য জানতেন না। তবে জানা মাত্রই প্রভাতচন্দ্র ডেকে পাঠালেন নলিনীকান্তকে। নলিনীকান্ত থানায় যেতেই ইনস্পেকটর প্রভাতচন্দ্র তাঁকে দু'জন গোয়েন্দার সামনে বসিয়ে দিলেন। গোয়েন্দাদের কাছে গোপনসূত্রে খবর এসেছিল পলাতক বিপ্লবী গোপেশচন্দ্র রায় ছাপাখানায় এসে নলিনীকান্তর সঙ্গে দেখা করেন। সেইমত জেরা শুরু হল। কিন্তু গোয়েন্দারা কোনোভাবেই নলিনীকান্তর কাছ থেকে একটা কথাও বের করতে পারলেন না। তাঁরা নলিনীকে ছেড়ে দিলেন। এবার ডাক পড়ল দাদাঠাকুরের। পরনে ধুতি, গায়ে চাদর জড়িয়ে থানায় এসে দাদাঠাকুর বন্ধু প্রভাতচন্দ্রকে বললেন,' ইনস্পেকটর বাবু, আমি এসে গেছি, কী দরকার বলুন।'

প্রভাতচন্দ্র দাদাঠাকুরকেও গোয়েন্দাদের জেরার মুখে বসিয়ে দিলেন।

একজন গোয়েন্দা দাদাঠাকুরকে জিগ্যেস করলেন, ' নলিনীকান্ত সরকার নামে কেউ আপনার প্রেসে কাজ করে?'

দাদাঠাকুর উত্তর দিলেন, ' হ্যাঁ, কাজ করে।'

গোয়েন্দারা প্রশ্ন করেন, ' কেমন লোক সে?'

দাদাঠাকুর বললেন, ' এ তো অনর্থক প্রশ্ন! খারাপ লোক জেনে কেউ কি কাউকে নিজের কাছে রাখে?'

গোয়েন্দারা বললেন, ' না না, সে ধরনের খারাপের কথা বলছি না। জানতে চাইছি, সে কি স্বদেশী?'

দাদাঠাকুর জোর দিয়ে বললেন, ' আলবাৎ স্বদেশী!'

গোয়েন্দারা কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন, ' বটে! তা আপনি কী করে জানলেন ও স্বদেশী?'

দাদাঠাকুর বললেন, ' ও স্বদেশী তো বটেই। ওর বাড়ি তো আমাদের একই মহকুমার নিমতিতা গ্রামে।'

গোয়েন্দারা অসন্তুষ্ঠ হয়ে বললেন, 'না না, আপনাকে সেই স্বদেশীর কথা জিগ্যেস করছি না। এই যে এখন দেশে স্বদেশী আন্দোলন হচ্ছে, সেই সব দলের সঙ্গে ওর কোনো যোগাযোগ আছে কি না জানেন?'

দাদাঠাকুর বললেন, 'তাই বলুন, আপনারা স্বদেশী আন্দোলনের কথা বলছেন। তা হ্যাঁ, নলিনী ও দলে আছে এটা আমি জানি।'

গোয়েন্দারা প্রশ্ন করলেন, ঠিক জানেন? আপনি এটা কেমন করে জানলেন?'

দাদাঠাকুর উত্তর দিলেন, ' এ কথা তো সবাই জানে। ও স্বদেশী গান করে। এই তো কিছুদিন আগে দামোদর নদীর বন্যায় যখন বর্ধমান ভেসে গেল তখন ও স্বদেশী গান গেয়ে টাকা তুলে সেখানে পাঠিয়ে দিল। হ্যাঁ, আর একটা কথা, শুনেছি কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গেও ওর যোগাযোগ আছে।'

গোয়েন্দারা এবার ক্ষেপে গিয়ে বললেন, ' না না, সে স্বদেশীর কথা জানতে চাইছি না। সে বিপ্লবী দলের লোক কিনা জানেন? যারা ইংরেজের রাজত্ব উচ্ছেদের জন্য খুন, জখম, ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে, আন্দোলন করছে, সংগ্রাম করছে, নলিনী সে সব দলে আছে কি না জানেন?'

দাদাঠাকুর এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন, ' ও, বিপ্লবীদের কথা বলছেন? সে কথা তো আগেই বলতে পারতেন। তা হ্যাঁ নলিনী বিপ্লবীতো বটেই।'

গোয়েন্দারা জিগ্যেস করলেন, ' কী করে জানলেন?'

দাদাঠাকুর বললেন, ' আমাদের দেশে একটা কথা চালু আছে— চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। ওর এক মাসতুতো ভাই বিপ্লবী শুনেছি, সেহেতু নলিনীও বিপ্লবী।'

এবার গোয়েন্দারা জানতে চাইলেন, ' আপনার প্রেসে নলিনীর পরিচিত অথচ আপনার অপরিচিত এমন কোনো লোক আসে?'

দাদাঠাকুর বললেন, ' আসে বৈকি! অবিশ্যি অবিশ্যি আসে। আলবাৎ আসে।' গোয়েন্দারা জানতে চাইলেন, ' কেন আসে জানেন?'

দাদাঠাকুর বললেন, ' কখনো নলিনীর পরিচিত আমার অপরিচিত, কখনো আমার পরিচিত নলিনীর অপরিচিত, কখনো উভয়ের পরিচিত বা অপরিচিতরা প্রেসে আসে কেউ বিয়ের, অন্নপ্রাশনের, শ্রাদ্ধের কার্ড ছাপাতে, কেউ চেক দাখিলা ছাপবার জন্য। কত লোকই তো প্রতিদিন প্রেসে আসে। সবাইকে মনে রাখা যায়?'

দাদাঠাকুরকে কিছুতেই বোঝাতে না পেরে গোয়েন্দারা গোপেশচন্দ্রের বর্ণনা দিয়ে জিগ্যেস করলেন, ' বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স, চোখে চশমা, গায়ের রঙ কালো, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি এ রকম চেহারার কেউ নলিনীর সঙ্গে দেখা করতে আপনার প্রেসে আসে?'

দাদাঠাকুর বললেন, ' হ্যাঁ, আসে তো।'

গোয়েন্দারা জিগ্যেস করলেন, ' কী নাম তার?'

দাদাঠাকুর বললেন, ' আজ্ঞে সুনীল। আমাদের সুনীল মোক্তার। সবেমাত্র ডাক্তারি পাশ করেছে। আপনারা যে রকম বর্ণনা দিলেন, ঠিক সেরকম দেখতে সুনীল মোক্তারকে। ও মাঝে মাঝেই আসে, এসে নলিনীর সঙ্গে গল্পগুজব করে।'

গোয়েন্দারা যা জানতে চাইছিলেন, তা জানতে না পেরে হতাশ হয়ে দাদাঠাকুরকে

ছেড়ে দিলেন। ছাড়া পেয়ে দাদাঠাকুর বন্ধু প্রতাপচন্দ্রকে বললেন, 'ইনস্পেকটরবাবু, আসি তাহলে।'

থানা থেকে বের হয়ে দাদাঠাকুর মনে মনে গোয়েন্দাদের উদ্দেশ্যে বললেন— বাপু, তোমরা চলো ডালে ডালে, আমি চলি পাতায় পাতায়। আমার পেট থেকে কথা বের করবে এমন ক্ষমতা তোমাদের নেই হে!

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দাদাঠাকুর ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন করতেন। নলিনীকান্ত তাই নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে দীর্ঘদিন দাদাঠাকুরের কাছে ছিলেন।

চরিত্রহীন ও বিদূষক

'বিদূষক' পত্রিকার সম্পাদক দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ও সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একবার একই সাহিত্যসভায় আমন্ত্রিত। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। ' পল্লীসমাজ' ' দেবদাস' 'শ্রীকান্ত' প্রভৃতি উপন্যাস লেখার জন্য তাঁর দারুণ খ্যাতি। সেই সবে মাত্র বেরিয়েছে 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি। সেই উপন্যাসটি নিয়েও পাঠকমহল মেতে উঠেছে। বইটি রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

সভায় প্রথমে এলেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র। তাঁকে কাছে পেয়ে উদ্যোক্তারা খুশিতে ডগমগ। এর কিছুক্ষণ পরে এলেন দাদাঠাকুর। উপস্থিত দুই আমন্ত্রিতর একই নাম। তফাৎ করার জন্য দাদাঠাকুরকে দেখে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, ' এসো, এসো হে বিদূষক শরৎচন্দ্র।'

ব্যাপারটা উপলব্ধি করলেন রসিক দাদাঠাকুর। গোঁফের আড়ালে হাসলেন। তারপর কিছু না বলে একভাবে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের দিকে। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, ' কী দেখছ হে বিদূষক শরৎচন্দ্র?'

দাদাঠাকুর এবার রসিকতা করে বললেন, ' আজ্ঞে, দেখছি চরিত্রহীন শরৎচন্দ্রকে।' এই উত্তর শুনে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র ও সভার অন্যরা হেসে ফেললেন।

এম এল এ

এক বন্ধু দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতকে জিগ্যেস করেন, ' এম এল এ-দের সম্পর্কে আপনার কী অভিমত?'

উত্তরে দাদাঠাকুর বলেন, পরের কাছ থেকে ভাতা-ভাড়া মেলে। এ মেলে ও মেলে বলেই তো উনারা দেশের নেতা, অর্থাৎ দেতা নেহি।'

একথা শুনে প্রশ্নকর্তা বন্ধুটি না হেসে পারলেন না।

খোদা ও দেবতা

একবার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে রীতিমত খেপিয়ে তুলেছিলেন দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। একটি সাহিত্যসভায় দাদাঠাকুর নজরুলকে বলেন, ' জানো তো, আমাদের খোদা, তোমাদের খোদার খোদা।'

নজরুল একথা শুনে বলেন, ' ধর্মতুলে কী উল্টোপাল্টা কথা বলছেন আপনি?'

দাদাঠাকুর বলেন, 'ঠিকই বলছি। যা সত্যি তাই বলছি। আমাদের, অর্থাৎ হিন্দুদের খোদা, তোমাদের, অর্থাৎ মুসলমানদের খোদার খোদা। বুঝলে?'

নজরুল রেগে গিয়ে বলেন, ' দাদাঠাকুর, সাবধানে কথা বলবেন বলে দিচ্ছি। ভাল করছেন না। খুব অন্যায় করছেন।

নজরুল রেগে লাল দেখে দাদাঠাকুর ওঁকে ধরে বসিয়ে দিয়ে বলেন, ' তোমাদের খোদা অর্থাৎ আল্লা তো একমেবাদ্বিতীয়ম। তিনি তো ত্রিভুবনের কর্তা। আমরাও মানি সেই সৃষ্টিকর্তা এক ঈশ্বরকে। এছাড়াও আমাদের কিছু ছোট-বড় দেবতা আছে, জানো তো? সেইরকম এক দেবতা মানে দেবী হলেন মা গঙ্গা। এই দেবীকে কী খুদে বা খনন করে তৈরী করা যায়, বলো? এ হল সেই মহান খোদারই খোদা। বুঝলে?'

নজরুল এতক্ষণে বুঝলেন দাদাঠাকুর রসিকতা করছেন, তাই তিনি হেসে উঠলেন ও নিজের মুখে একটা পান পুরে দিয়ে বললেন, ' আচ্ছা বেশ। মেনে নিলুম।'

ড্র রেখেছিলুম

দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ছিলেন এক জীবন রসিক। তিনি তাঁর প্রখর রসবোধকে চরম শোকের মুহূর্তেও বিসর্জন দেননি। তাঁর প্রিয় পুত্র যখন ৬৪ দিন রোগ ভোগের পর মারা গেল তখনও তিনি অন্যের কাছে কান্নায় ভেঙে পড়েন নি। মনের কষ্ট মনেই রেখে তিনি কথামত গিয়েছিলেন 'কল্লোল' পত্রিকার দপ্তরে। সেখানে পুত্রের মৃত্যু প্রসঙ্গে নিজের স্বভাব সুলভ সরস ভঙ্গিতে মন্তব্য করেন, ' ৬৪ দিন অনেক কষ্টে ড্র রেখেছিলুম। কিন্তু আজ গোল দিয়ে গেল।'

প্রি পোজিসন

দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত বড়োলোকদের উপর ছিলেন হাড়ে হাড়ে চটা। নিজে সাদামাটা জীবনযাপন করতেন। লোক দেখানো মেকি হাবভাব তিনি পছন্দ করতেন

না। একদিন তাঁর ছাপাখানায় আলোচনা হচ্ছে বড়লোকদের সম্বন্ধে। কথা প্রসঙ্গে মোটরকারবিহারী বড়লোকদের সম্বন্ধে দাদাঠাকুর মন্তব্য করলেন, 'ওরা কর্তাও নয়, কারকও নয়, ওদের ডেফিনেশন বা সংজ্ঞা হচ্ছে— বড়লোক ইজ অ্যান অবজেক্টিভ কেস, গবর্নড বাই দি প্রিপোজিশন ড্রাইভার।'

ছাপাখানায় ছিলেন নলিনীকান্ত সরকার। তিনি জিগ্যেস করলেন, 'দাদা তা তো বুঝলাম, কিন্তু একটা প্রশ্ন ড্রাইভার প্রিপোজিশান হল কী করে?'

দাদাঠাকুর হেসে বললেন, ' বোকা কোথাকার, বুঝলেনা? বড়লোকেরা গাড়ির কোথায় বসে? পিছনের সিটে তো! তাহলে ড্রাইভারের পজিশনই তো আগে হলো! ড্রাইভারই তো তাহলে প্রিপোজিশান। নয় কি?'

এ কথা শুনে নলিনী সহ ছাপাখায়ায় উপস্থিত অন্যরা হেসে উঠলেন।

একবার এক বড়লোক দাদাঠাকুরকে বলেন, 'আপনি খালি পায়ে ঘুরে বেড়ান কেন?' উত্তরে দাদাঠাকুর বলেন, ' বাগদাদের রাজাও তো খালিপা (অর্থাৎ খালিফা) । আমি খালিপা হলে দোষ কোথায়?'

সংস্কৃত ব্যাকরণ

একদিন সকালে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মনের সুখে তামাক খাচ্ছেন। নলিনীকান্ত সরকার তাঁকে দেখে বললেন, 'দাদা, তামাকই যখন খাচ্ছেন তখন একটু আরাম করেই না হয় খান। হুঁকো ছেড়ে দিন। এবার একটা গড়গড়া কিনুন।'

তামাক খেতে খেতেই দাদাঠাকুর বললেন, ' না ভাই , ও নল-দময়ন্তী লীলা খেলার মধ্যে আমি যাবো না।'

অবাক নলিনী জিগ্যেস করলেন, ' দাদা এর মধ্যে আপনি নল দময়ন্তীর লীলা খেলা কোথায় দেখলেন শুনি?'

দাদাঠাকুর এবার হেসে উত্তর দিলেন, ' মুখ্যু কোথাকার, কিছুই জানে না। সংস্কৃত ব্যাকরণে তো জ্ঞান নেই, নল-দময়ন্তী জানবে কী করে? বুঝে দেখ, গড়গড়ায় নল আছে। সংস্কৃত জানলে দময়ন্তীও দেখতে পেতে। গড়গড়ার নলে টান দেওয়া মানেই হল দময়তি, দময়তঃ, দময়ন্তী। এটা হল দক্ষ ধাতু। বুঝলে?' নলিনী বললেন, ' তাই বুঝি?'

দেখবার জিনিস

দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের স্ত্রীর একটি পা বাতে পঙ্গু। একবার দাদাঠাকুর স্ত্রীকে

কলকাতায় নিয়ে এলে নলিনীকান্ত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে বলেন, ' বৌদি, কলকাতায় যখন এসেছেন এখানকার দেখবার জিনিসগুলো আপনাকে একদিন দেখিয়ে আনি চলুন। কত কী আছে—চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, বায়োস্কোপ, থিয়েটার—আপনার খুব ভাল লাগবে।'

দাদাঠাকুরের স্ত্রী একথা শুনে হতাশাব্যঞ্জক সুরে বললেন, 'ভাই, আমার কী সে ভাগ্য হবে! আমি যে খোঁড়া মানুষ!'

একথা শুনে কাছে বসে থাকা দাদাঠাকুর তামাক খেতে খেতে বললেন, ' বুঝলে নলিনী, এটা তোমার বৌদির লেম একস্‌কিউজ।'

এ কথা শুনে নলিনীকান্ত হেসে উঠলেন।

গো শকট

তখন মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যন রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন। এই বোর্ডের সভার আগের দিনে বৈকুণ্ঠ জানতে পারলেন, উদ্যোগীরা দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করতে ভুলে গেছেন। কী করা যায়! সামনে এত কাজ! এত ব্যস্ততার মধ্যেও বৈকুণ্ঠ স্বয়ং রঘুনাথগঞ্জে ছাপাখানায় এসে দাদাঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করে গেলেন। কীভাবে যাবেন দাদাঠাকুর? তাঁর যাবার জন্য গোশকটের ব্যবস্থা করা হল।

পরের দিন নলিনীকান্ত সরকারকে সঙ্গে নিয়ে দাদাঠাকুর গরুর গাড়িতে চেপে যাত্রা করলেন। গ্রামের এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। স্বাভাবতই তাঁদের প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেতে হচ্ছিল। তবে দু'জনেই বেশ উপভোগ করছিলেন। দু'পাশে সবুজ ধানক্ষেত, মাঝখানে মেঠো পথ ধরে গরুর গাড়িতেঁ চেপে যাওয়া। একটু অন্যরকম ব্যাপার। ঝাঁকুনি প্রসঙ্গে দাদাঠাকুর নলিনীকে মজা করে বললেন, ' ও নলিনী, এরা যে শেক্ দি বট্‌ল্ বিফোর ইউজ করলে দেখছি।' এ কথা শুনে নলিনী হেসে উঠলেন।

ব্যাঙ্কের কথায়

একপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ব্যাঙ্ক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দাদাঠাকুর বললেন, 'ব্যাঙ্কে আমার অ্যাকাউন্ট খোলাই তো আছে।'

পরিচিত ব্যক্তি জানতে চাইলেন, 'দাদা, কোন ব্যাঙ্কের?'

উত্তরে দাদাঠাকুর বললেন, 'রিভার ব্যাঙ্কে। এই ব্যাঙ্কে কারেণ্ট অ্যাকাউণ্ট করা সোজা নয়। ফ্লোটিং অ্যাকাউণ্ট, সিঙ্কিং ফাণ্ড সব কিছুই আছে এই ব্যাঙ্কে।'

এ কথা শুনে পরিচিত ব্যক্তিটি হেসে ফেললেন।

শ্রমিক আশ্রমিক

দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত একপার্ট এডভার্টাইজিং-এর কানাইবাবুর ঘরে নিয়মিত আসতেন। দু'জনের মধ্যে মাঝে মাঝে কবিতার লড়াই লেগে যেত। দাদাঠাকুরের সঙ্গে কানাইবাবু পেরে উঠতেন না।

দাদাঠাকুর সেকালের বিখ্যাত কবি রামশর্মার পুত্র রামেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষকে বিশেষ পছন্দ করতেন। একদিন রামেন্দ্রকৃষ্ণর এক পরিচিতের সঙ্গে দেখা হলে দাদাঠাকুর জানতে চান, ' রামু (অর্থাৎ রামেন্দ্রকৃষ্ণ) কোথায় জানিস?'

পরিচিত ব্যক্তি উত্তর দেন, ' উনি তো আশ্রমে আছেন।'

এ কথা শুনে দাদাঠাকুর বলেন, ' তাই নাকি? বেশ আছে। তবে একটা কথা জেনে রাখ যারা শ্রম করে খায় তারা হল শ্রমিক আর যারা বিনাশ্রমে খায় তারা আশ্রমিক। এই কথাটা রামুকে জানিয়ে দিস, বলবি, আমি বলেছি।'

ট্যাঁকে টাকা

দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ট্যাঁকে বা চাদরের খোঁটে পয়সা রাখতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বলেন, 'আপনি আয়রণ চেস্টে টাকা পয়সা রাখেন না কেন?'

উত্তরে দাদাঠাকুর বলেন, 'বুঝলে না, যাদের চেষ্ট আয়রণের মত, তারাই আয়রণ চেষ্টে টাকা রাখে। '

এ কথা শুনে ব্যক্তিটি হেসে ফেললেন।

বিধানসভা ও স্বাধীনতা

এক ব্যক্তি বিধানসভা সম্পর্কে দাদাঠাকুরের মত জানতে চাইলে তিনি মজা করে বলেন, ' মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের খোস মেজাজের সভা বলেই তাকে বিধানসভা বলে।'

স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি বলেন, ' আমরা কোথায় স্বাধীনতা পেয়েছি? এটা স্বাধীনতা না স্বাদ-হীনতা?'

নিজের জন্মদিন পালন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি হলাম এক জন্ম দীন! তার আবার জন্মদিন!'

দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত স্পষ্ট কথার মানুষ ছিলেন।

পদস্থ

একবার দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত বেতার কেন্দ্রের এক পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়ে যান। তাঁর পরণে ধুতি ও গায়ে চাদর। চিরপরিচিত পোশাক। তাঁকে এইভাবে আসতে দেখে এক কর্মকতা তাঁর কাছে হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, 'দাদাঠাকুর, আপনি আমাদের কাছে যেভাবে খুশি আসুন, তাতে অসুবিধে নেই। কিন্তু এঁরা সব পদস্থ ব্যক্তি। এঁদের সামনে এইভাবে এলে এঁরা কী ভাবলেন বলুন তো?'

দাদাঠাকুর শুনে বললেন, ' বটে! তা এঁরা আবার পদস্থ কোথায় হে? এঁরা তো সবাই দেখছি জুতোস্থ! পদস্থ বলতে তো শুধুই দেখছি আমি!'

এ কথা শুনে সেই কর্মকতা চুপ করে গেলেন।

মৃত্যু শয্যায়

তখন দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মৃত্যুশয্যায়। মৃতুশয্যায় শুয়েও তিনি স্বাভবসুলভ রসিকতা করতে ছাড়েন নি। তাঁর চিকিৎসা করতেন পারিবারিক চিবি ৎসক ডাঃ মণি চট্টোপাধ্যায়। ডাক্তারবাবুকে আসতে দেখে একজন বললেন, 'দাদাঠাকুর, মণি ডাক্তার এসেছেন।'

উত্তরে দাদাঠাকুর মজা করে বললেন, ' নো মোর মণি নিডেড।'

এ কথা শুনে মণি ডাক্তার হেসে ফেলে বললেন, 'দাদাঠাকুর, কই জিভটা একবার দেখান।'

নিউজ

দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত বেতার পল্লীমঙ্গলের আসরে একবার অনুষ্ঠান করতে গেছেন। তাঁর বলা শেষ হয়েছে। কিন্তু পরের অনুষ্ঠান শুরু হতে দু'মিনিট বাকি। কী করা যায়! বেতার ঘোষক ইশারায় তাঁকে দু'টো আঙুল দেখিয়ে জানিয়ে দিলেন আরো দু'মিনিট বাকি। বেতার ঘোষকের ইশারা বুঝে দাদাঠাকুর বলতে শুরু করলেন, 'এরপর আপনারা খবর শুনবেন। খবরের ইংরেজি NEWS। এই NEWS কথার অর্থ হল— N মানে North. E মানে East .W মানে West. S মানে South। অর্থাৎ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সব দিকের খবর পাওয়া যায় বলে এর নাম, NEWS' দু'মিনিট শেষ।

দাদাঠাকুরের উপস্থিত বুদ্ধি দেখে অবাক বেতার ঘোষক সহ অন্যরা।

ইংরেজি পোয়েট্রি

মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট এডিকের সংবর্ধনা সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। তাঁর পরনে চির পরিচিত ধুতি-চাদর। দাদাঠাকুরকে দেখে একজন সাহেবিপনা ধনী ব্যক্তি বলে উঠলেন, 'এই ডার্টি লোকটা কে?'

দাদাঠাকুরের কানে গেল কথাটা। মুখে কিছু বললেন না। মনে মনে ভাবলেন, একে টিট করতেই হবে। এবার বক্তৃতা দেবার পালা। প্রথমেই ডাক পড়ল দাদাঠাকুরের। এই সুযোগে অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। উঠেই তিনি জানতে চাইলেন, 'বন্ধুগণ, বাংলায় বলব না ইংরেজিতে?'

সকলে বললেন, 'ইংরেজি, ইংরেজি।'

দাদাঠাকুর বললেন, 'কী বলব প্রোজ না পোয়েট্রি?'

সকলে বললেন, 'পোয়েট্রি।'

দাদাঠাকুর শুরু করলেন ইংরেজি পোয়েট্রি ঃ—

"টু অ্যাপিয়ার বিফোর এ পার্টি
ইনস্টেড অফ প্রপার্টি
ইন এ ড্রেস সো ডার্টি
আই হ্যাভ গট পভার্টি
দোজ হু হ্যাভ প্রপার্টি
ইফ ইউ ট্রাই এক্সপার্টি
মে থিঙ্ক ইট সামথিং অড
ইউ মে চার্জ মাই গড"

দাদাঠাকুরের মুখে ইংরেজি পোয়েট্রি শুনে সেই সাহেবিপনা ধনী ব্যক্তির থোঁতা মুখ ভোঁতা! একেবারে চক্ষু চড়কগাছ! এরপর ব্যক্তিটি আর সভায় বসে থাকতে পারলেন না। তাঁকে উঠে যেতে দেখে মুচকি হাসলেন দাদাঠাকুর।

সার্টিফিকেট প্রত্যাখ্যান

সিউড়ির লাটসাহেব রোনাল্ড্‌সের সংবর্ধনা সভায় আসার জন্য দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করলেন ব্রতচারীর প্রবর্তক গুরুসদয় দত্ত। লাটসাহেবের পার্সোনাল সেক্রেটারি গুরলে গেটে দাঁড়িয়ে নিমন্ত্রণের কার্ড পরীক্ষা করে অতিথিদের ঢুকতে দিচ্ছেন। পায়ে জুতো নেই, পরণে ধুতি-চাদর, এই ভাবে দাদাঠাকুর এলেন। হাতে নিমন্ত্রণের কার্ড। গুরলে ভাবলেন, এমন লোক কী করে নিমন্ত্রিত হল! তাই কার্ড

দেখেও তাঁকে আটকে দিলেন। লাটসাহেবের কানে গেল কথাটা। তিনি খবর পাঠান— অবিলম্বে দাদাঠাকুরকে সভায় ঢুকতে দেওয়া হোক।

সভায় দাদাঠাকুর স্বভাব সুলভ ভাবে অনেক সরস কথা বলে সকলকে মুগ্ধ করে দেন। গুরলে অবাক! মনে মনে ভাবলেন, এমন মানুষকে আমি গেটে আটকে দিচ্ছিলাম! তিনি দাদাঠাকুরের কাছে এসে বললেন, ' লাটসাহেব আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে সার্টিফিকেট দিতে চান।'

দাদাঠাকুর রসিকতা করে বললেন, ' যদি আমি কোথাও চুরি করি তবে কি ঐ সার্টিফিকেট দেখিয়ে ছাড়া পাব?'

গুরলে বললেন, ' না, তা হবে না।'

দাদাঠাকুর সার্টিফিকেট প্রত্যাখ্যান করে বললেন, ' আমার সার্টিফিকেট দরকার নেই।'

ঠাকুর ও কুকুর

প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী বিমলভূষণের সঙ্গে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের দেখা হতে বিমলভূষণ জিগ্যেস করলেন, ' দাদাঠাকুর, বলুন কেমন আছেন? চলেছেন কোথায়?' দাদাঠাকুর রসিকতা করে বলেন, 'ভায়া, ঠাকুরের একটা 'কু'। আর কুকুরের দুটো 'কু'। মনে রাখবেন দুটোই কিন্তু পথে পথে ঘোরে। এবার বুঝুন কেমন আছি।'

একথা শুনে বিমলভূষণ হেসে ফেললেন।

কায়েতের কুকুর

গোয়াবাগানে সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বাড়ির দোতলায় লাইব্রেরি ঘর। হেমেন্দ্রপ্রসাদ সেই ঘরে বসে কাজ করেন। লোকজন এলে সেই ঘরেই কথাবার্তা বলেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদের বাড়িতে কুকুর আছে। কেউ এলেই কুকুরটা ডাকাডাকি করে। দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত হেমেন্দ্রপ্রসাদের বাড়ির নিচে এসে হাঁক পাড়তেই কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এসে দাদাঠাকুরকে সামান্য কামড়ে দিল।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ তাড়াতাড়ি ওষুধপত্র দিয়ে দাদাঠাকুরের পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। দাদাঠাকুর রসিকতা করে হেমেন্দ্রপ্রসাদকে বললেন, ' লোকজন এলে তোমার কুকুর কামড়ে দেবে বলে তুমি কি সর্বদা ওষুধপত্র নিয়ে তৈরী থাকো?'

হেমেন্দ্রপ্রসাদ বললেন, ' না তা নয়, সকলকে কামড়ায় না। এই তো কয়েকজন একটু আগে এল, ওদের কামড়ায়নি। আমার এই কুকুর ভদ্রলোক চেনে।'

দাদাঠাকুর রসিকতা করে বললেন, ' না না, তা নয়। আসলে কায়েতের কুকুর তো, বামুনের পা পেয়ে লোভ সামলাতে পারেনি।'

এ কথা শুনে হেমেন্দ্রপ্রসাদ হেসে উঠলেন।

কন্যাদায়

এক সেরেস্তাদারের সঙ্গে দেখা করতে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত একবার আদালতে গেছেন। তাঁকে আদালতে আসতে দেখেই উকিল, মুহুরি, মোক্তাররা এগিয়ে এসে বললেন, ' ঠাকুরমশাই, আপনার কেস আমি এক্ষুনি করে দিচ্ছি, আসুন।'

ভিড়ের চাপে দাদাঠাকুর এগোতেই পারেন না। তখন বুদ্ধিখাটিয়ে বলেন, ' আমি কন্যাদায়গ্রস্ত গরীব ব্রহ্মণ। কিছু সাহায্যের জন্য এসেছি আপনাদের কাছে।'

এ কথা শুনে ভিড় ফাঁকা । রাস্তা পরিস্কার। দাদাঠাকুর সোজা চলে গেলেন সেরেস্তাদারের কাছে।

পণ্ডিত প্রেস

দাদাঠাকুর **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত 'জঙ্গিপুর সংবাদ'** ও 'বিদূষক' নামে দুটি সাময়িকপত্র সম্পদনা করতেন। তাঁর নিজের ছাপাখানা ছিল। তার নাম 'পণ্ডিত প্রেস'। নিজের প্রেস সম্পর্কে দাদাঠাকুর বলতেন, ''আমার ছাপাখানা হালফ্যাশানি ছাপাখানা নয়। আমার ছাপাখানায় আমিই প্রোপাইটার , আমি কম্বোজিটার, আমি প্রুফরিডার, আমিই ইঙ্ক ম্যান। কেবল প্রেসম্যান আমি নই— সেটি ম্যান নয়, উওম্যান, অর্থাৎ আমার অর্ধাঙ্গিনী। ছাপানোর কাজে ব্রাহ্মনী আমাকে সাহায্য করেন। ঘরের মাঝে আমার টাইপ রাখার কেস। মাটির মেঝেতে ঠিক কাঠের কেসের মতোই সারিসারি গর্তকরে সাজিয়ে, সেই সব ফোঁকরে এক একটি ছোট ছোট মাটির ভাঁড় বসিয়ে তার মধ্যে টাইপ রেখেছি।''

পরে তিনি উন্নতধরনের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। একবার একটু পুরনো অথচ পত্রিকা ছাপার উপযুক্ত একটি মেশিনের সন্ধানে দাদাঠাকুর কলকাতায় আসেন। মেশিন খুঁজতে খুঁজতে তিনি একটি কোম্পানীর অফিসে ঢুকে পড়েন। দেখেন, কর্মকর্তাটি এক সাহেব! দাদাঠাকুর তাঁকে সাহেবি কেতা মতো 'গুডমনিং' বলে সম্বোধন করেন। দাদাঠাকুরের পরণে ধুতি, খালি গা, খালি পা, কোঁচার কাপড় কোমরে বেড় দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা, এক হাতে টিনের চোঙার মতো একটা বাক্স, অন্য হাতে একটি কলিকাশীর্ষ হুক্কা, বগলে ছাতা। এমন লোকের মুখে 'গুড মর্নিং' শুনে সাহেব অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'আর ইউ কামিং ফ্রম এ জঙ্গল?' (অর্থাৎ, তুমি কি জঙ্গল থেকে আসছ ?)

দাদাঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিতে বললেন, 'ইউ আর রাইট, আই অ্যাম কামিং ফ্রম এ জঙ্গল।' (আপনি ঠিক বলেছেন, আমি একটি জঙ্গল থেকে আসছি।)

গ্রামের মানুষের মুখে ইংরেজি শুনে অবাক সাহেব জানতে চাইলেন, ' তুমি কী করো?'

দাদাঠাকুর বললেন, 'আমি একখানা জংলী কাগজের জংলী এডিটর।'

দাদাঠাকুরের কথায় চমৎকৃত হয়ে সাহেব একশ টাকা দিয়ে তাঁকে একটি ছাপাখানা কিনে দিলেন। দাদাঠাকুর তাঁর 'বিদূষক' পত্রিকার মলাটে লিখতেন—

'ধামাধরা উদারপন্থী দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র'। নিজেকে সম্পাদক পরিচয় না দিয়ে লিখতেন --" সেবাইত— শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত ।"

মুর্শিদাবাদের জেমোকান্দীতে একটি অনুষ্ঠানে দাদাঠাকুরের সঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দেখা হয়। শাস্ত্রীমশাই দাদাঠাকুর সম্পর্কে পরে লেখেন—" জেমোকান্দীতে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হইল—তাঁহার নাম সোজাসুজি শরৎ পণ্ডিত— বিদূষকের এডিটর, তিনি মুখে মুখে পদ্য লেখেন,তাঁর কাগজও পদ্যে।...ইনি খুব তেজস্বী ব্রাহ্মণ, বেশ মিষ্টি করিয়া সকলকে হক কথা শুনাইয়া দেন। বেচারার জাঁকজমক কিছুই নাই—সদানন্দ পুরুষ।"

শাস্ত্রীমশাই আরো বলেন—তিনি একধারে এডিটর, প্রুফরিডার, কম্পোজিটার, ডেসপ্যাচার—তিনি কেবল সাবসক্রাইবার নন। সেকালে ভাঁড়ের কথা শুনেছিলুম, তিনি সেই ভাঁড়।

দাদাঠাকুর পরে কলকাতায় এলেও তাঁর জন্মস্থান মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর শহরের থেকে এক মাইল দূরের সেই অজ পাড়াগাঁকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি। তাঁর জন্ম ১৩ বৈশাখ, ১২৮৮। দাদাঠাকুরের একটি বিখ্যাত ছড়া 'বেটা বেচা'। ছড়াটা হল—"জাত বুঝি যায় নাকো কুভোজ্য ভোজনে। / পুরাইছ পোড়া পেট বেটা বেচে ওজনে। / ছেলের বিবাহ দিয়ে নিয়ে যাবে কন্যায়। / তার সনে টাকা চাও এটা তবে কোন্ ন্যায়! / গহনা করিছ দাবী নগদ চাহিয়া ঢের। / বেচিলে বেটার মাংস কত টাকা প্রতি সের? / হওনা বামুন তুমি কায়েত কি বৈদ্য। / অধম কশাই চেয়ে মশাই যে সদ্য।"

সুভাষচন্দ্র বসুর রঙ্গ রসিকতা

জন্ম সাল-১৮৯৬

মৃত্যু সাল-??

নিমন্ত্রণ

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তখন ফরওয়ার্ড ব্লকদলের নেতা। সেই সময় তাঁর হাজার ব্যস্ততা। সেই সময় তিনি কলকাতা শহরের এক ব্যক্তিকে কথা দিয়েছিলেন—তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণে যাবেন। তখন ফরওয়ার্ডব্লক-এর দপ্তর ছিল বৃটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিটে, যার বর্তমান নাম আবদুল হামিদ স্ট্রিট। সেই দপ্তরে কাজ করছিলেন সত্যরঞ্জন বক্সী ও কিরণ শংকর রায়। সুভাষচন্দ্র তাঁদের বললেন, ' শোনো হে, আমি এখন বজবজে যাচ্ছি, একটা মিটিং-এ, ফিরে এসে এক জায়গায় ইটিং-এ অর্থাৎ একটা নেমন্তন্ন বাড়িতে যাবো। যতই হোক, তাঁদের কথা দিয়েছি যে।'

মিটিং সেরে সুভাষচন্দ্রর ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল! প্রায় গভীর রাত! কিন্তু কী করা যায়! তাঁদের কথা দিয়েছেন! নিমন্ত্রণ রক্ষা না করলে যে খারাপ দেখায়! তো সেই গভীর রাতেই সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়েই সুভাষচন্দ্র চললেন নিমন্ত্রণ বাড়ির উদ্দেশ্যে। রাত তখন প্রায় একটা কি দুটো! সেই বাড়ির সামনে এসে সুভাষচন্দ্র দেখলেন, সদরদরজা, এমনকি বাড়ির জানলাগুলো সব বন্ধ। চতুর্দিক শুনশান। উৎসব বাড়িতে রাতের নিঝুমতা নেমে এসেছে! এসে তো ফেরা যায় না! কী করা যায়! সুভাষচন্দ্র তখন দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ নাড়ার পর ভেতর থেকে সাড়া এলো— 'এত রাতে কে কড়া নাড়ে?'

সুভাষচন্দ্র উত্তর দিলেন,' আমি সুভাষচন্দ্র। আপনারা আমাকে নিমন্ত্রণ

করেছিলেন। আমি কথা দিয়েছিলাম, আসবো। তাই এত রাত হওয়া সত্ত্বেও এসেছি।'

সুভাষচন্দ্র এসেছেন! সদরদরজা খুলে গেল। শশব্যাস্ত হয়ে উঠলেন বাড়ির সবাই। গৃহকর্তা বললেন,' এত রাত্রে?'

সুভাষচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, ' তাতে কী হয়েছে? ব্যস্ততার কোনো কারণ নেই। খাবার দাবার ফুরিয়ে গেছে তো কী হয়েছে, কষা মাংস আর ঘি ময়দা তো আছে। লুচি ভেজে দিন, কষা মাংস দিয়ে আমরা জমিয়ে খেয়ে নেব।'

এ কথা শোনা মাত্র উৎসব বাড়িতে রান্নার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। শেষমেষ খাওয়া দাওয়া যখন শেষ হল, তখন প্রায় ভোর হয় হয়! খাওয়া তো শেষ হল। সুভাষচন্দ্র জুড়ে দিলেন খোশ-গল্প! ওঠার আর নাম নেই। গৃহকর্তাও মজে গেছেন গল্পে। তা দেখে সুভাষচন্দ্রর সঙ্গীরা একে অপরের মুখ চেয়ে অবশেষে সুভাষচন্দ্রকে বলে ফেললেন, 'ভোর হয়ে গেছে, এবার বাড়ি ফেরা যাক।'

একথা শুনে সুভাষচন্দ্র হাসতে হাসতে মজা করে বললেন, 'ওহে সত্যরঞ্জন, কিরণশংকর, এক্ষুনি ওঠার কথা কেন? আর একটু বসে গেলেই তো বেশ হয়, ভোরের চা-টা খেয়েই না হয় এখান থেকে বেরোনো যাবে!'

সুভাষচন্দ্রর কথা শুনে গৃহকর্তা সহ উপস্থিত প্রত্যেকেই হেসে উঠলেন!

বিবাহের পাত্র

একবার জামসেদপুরের টাটা আয়রণ ও স্টিল কোম্পানীর শ্রমিকরা কোনো এক কারণে ধর্মঘট করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র তখন সেই সব শ্রমিকদের দুঃখের কাহিনী লিখতেন, সময় সময় আলোচনা করতেন দলের ছেলেদের সঙ্গে। শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশার কথা ভেবে তিনি কষ্ট পেতেন।

একদিন সকালে তিনি দলের ছেলেদের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলছেন। এমন সময় বাড়ির বারান্দায় হাজির দীন হীন জীর্ন বেশধারী মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক। তাকে অভাবী বলেই মনে হল সুভাষচন্দ্রের।

সুভাষচন্দ্র জিগ্যেস করলেন সেই ব্যক্তিকে, 'কী দরকার আপনার?'

ব্যক্তিটি হাতজোড় করে বললেন, ' আমার অবিবাহিতা কন্যার জন্য একটি সুপাত্র দেখে দিন। আপনার তো অনেক ছেলের সঙ্গে জানাশোনা। সবাই আপনার কথাও শোনে। দেখুন না যদি কাউকে রাজী করানো যায়—তাহলে আমি কন্যাদায় থেকে মুক্ত হই। আমার এমন সামর্থ নেই যে জাঁকজমক করে মেয়েদের বিয়ে দিতে পারি। আপনি আমাকে এ যাত্রায় রক্ষা করুন।'

সুভাষচন্দ্র সব শুনে বললেন, ' সবই তো বুঝলাম, আমি যে সব ছেলেদের চিনি তারা কেউ বিবাহে ইচ্ছুক নয়, আমার কথাতেও না।'

ভদ্রলোকটি তখন শেষ ইচ্ছাটি প্রকাশ করলেন সুভাষচন্দ্রর কাছে, 'যদি আপনি আমার কন্যাকে বিবাহ্ করেন—'

ব্যক্তিটির এই প্রস্তাব শুনে ঘরসুদ্ধ লোক স্তম্ভিত! সবার কৌতূহল—কী বলবেন সুভাষচন্দ্র এর উত্তরে?

সুভাষচন্দ্র হাসতে হাসতে ব্যক্তিটিকে বললেন, ' বিবাহে আমার একটু অসুবিধা আছে। কারণ আমি বাইরে খুব কমই থাকি, বেশিরভাগ সময় আমাকে জেলের ভেতর থাকতে হয়।'

সুভাষচন্দ্রর কথা শুনে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

একশো নম্বর

প্রটেস্টান্ট মিশনারী স্কুলে পড়া বাংলা-সংস্কৃত না জানা সুভাষচন্দ্র যখন কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন,তখন সেখানকার পণ্ডিত বিশ্বনাথ কাব্যতীর্থ সুভাষচন্দ্রকে ব্যঙ্গ করে বলেন, 'বাংলা-সংস্কৃত জান না, পাশ করবে কী করে?'

সুভাষচন্দ্র উত্তরে বলেছিলেন, ' শিখে নেব।'

তা শুনে পণ্ডিত বাঁকা হাসি হেসেছিলেন! বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশে দেখা গেল সুভাষ প্রথম হয়েছে ও সংস্কৃতে পেয়েছে একশোয় একশো! একশো নম্বর দেখে প্রধান শিক্ষক পণ্ডিতকে জিগ্যেস করেন, 'আপনি সুভাষকে সংস্কৃতে একশোয় একশো দিয়েছেন কেন?'

পণ্ডিত উত্তরে বলেন, 'কী করবো বলুন, একশোয় তো আর দুশো নম্বর দেওয়া যায় না।'

সুভাষচন্দ্র ছিলেন মেধাবী ছাত্র। অল্প দিনে সংস্কৃত পড়েই তিনি সকলকে অবাক করে দেন।

ন্যাপকিনের ব্যবহার

সুভাষচন্দ্র একবার খেতে গেছেন এক হোটেলে। নিজের পছন্দমত খাবার খেয়ে তিনি তৃপ্ত। এবার দাম দেবার পালা। হোটেলের বয় খাবারের বিল দিয়ে গেল সুভাষচন্দ্রকে। বিল দেখে তো সুভাষের চক্ষু চড়কগাছ! তিনি দেখলেন বিলে খাবারের সঙ্গে ন্যাপকিনের দামও ধরা আছে। সুভাষচন্দ্র হোটেলের বয়টিকে ডেকে বললেন, 'ওহে, আমি ইউরোপের এত হোটেলে খেয়েছি, কোথাও তো ন্যাপকিনের বিল করে না। তাছাড়া আমি তো ন্যাপকিন ব্যবহার করিনি। কেন এর দাম দেব?'

সুভাষচন্দ্রের কথা শুনে বয়টি মাথা চুলকে বলল, ' স্যার, আমাদের হোটেলের এটাই রীতি। ন্যাপকিনের দাম দিতে হবে।'

বয়ের কথা শুনে সুভাষচন্দ্র বললেন, 'বটে! তা এটার দামই যদি দিতে হয় তাহলে এটার ব্যবহারও হোক!'

বলা মাত্র সুভাষচন্দ্র টেবিলে পা তুলে ন্যাপকিন দিয়ে নিজের জুতো জোড়া মুছে নিলেন!

এ দৃশ্য দেখে হোটেলের বয় ও হোটেলের মালিক একেবারে থ!

একটি পদ

একবার সুভাষচন্দ্র বারিশালে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সত্যরঞ্জন বক্সী সহ আরো কয়েকজন। সুভাষচন্দ্র এসেছেন শুনে সেখানকার বহু বাড়ির মহিলারা এসে তাঁদের নিমন্ত্রণ করেন খাবার জন্য। কিন্তু সমস্যা হল—সুভাষচন্দ্ররা থাকবেন একদিনই। একদিন এতঘরে নেমন্তন্ন রক্ষা করা সম্ভব নয়। কী করা যায়! সুভাষচন্দ্র একটু ভেবে বললেন, 'ঠিক আছে, সবার বাড়িতে এক দিনে যাওয়া সম্ভব নয় ঠিকই, বরং যিনি যে পদটি ভালো রাঁধেন সেটি আমাদের দিয়ে যান, আমরা আনন্দের সঙ্গে খাবো।'

কথামত তাই স্থির হল। কিন্তু প্রত্যেক মহিলাই নিজের সেরা পদের সঙ্গে অন্য পদও রান্না করে আনলেন। আসলে একটি পদ তো দেওয়া যায় না। সে এক এলাহি কাণ্ড! এত খাবার! সত্যরঞ্জন সহ অন্যরা একটু খেয়েই কাহিল হয়ে পড়লেন। কিন্তু খাদ্য রসিক সুভাষচন্দ্র তৃপ্তির সঙ্গে প্রতিটি পদ তারিয়ে তারিয়ে খেলেন।

সুভাষচন্দ্রকে খাওয়াতে পেরে মহিলারাও সন্তুষ্ট হয়ে খুশি মনে বাড়ি ফিরলেন।

ডিম বিভ্রাট

সুভাষচন্দ্র একবার লণ্ডনে একটি হোটেলে খেতে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীসুনীল বসু, শ্রী বি.এন.সরকার, শ্রী সতীশ বসু, শ্রী সুনীল দে, শ্রী রমেন দত্ত, শ্রী মোহিতলাল ঘোষ প্রমুখ। মোহিতলাল বাড়ি থেকে ডিম সেদ্ধ করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ডিমের খোলা ছাড়িয়ে সবার সামনে ডিমটি খাচ্ছিলেন। এ দৃশ্য দেখেন হোটেলের বাটলার। তিনি খাবার বিল দেবার সময় ডিমসেদ্ধর দামও ধরে নেন। বিলে ডিমের দাম দেখে রেগে গিয়ে মোহিতলাল বাটলারকে বলেন, 'দিজ আর মাই ওন এগজ্' হাউ কুড ইউ মেক বিল ফর দিস?' অর্থাৎ—এগুলো আমার নিজের ডিম, এরজন্য আপনি কেন বিল করেছেন।

মোহিতলালের একথা শুনে রসিকতা করে সুভাষচন্দ্র বলে উঠলেন, 'হাউ কুড ইউ হ্যাব ইওর ওন এগজ্?' অর্থাৎ—এগুলো কি করে তোমার ডিম হলো?

সুভাষচন্দ্রের কথা শুনে প্রত্যেকে হেসে উঠলেন।

এক লক্ষ টাকা

সুভাষচন্দ্র তখন কংগ্রেসে। সেই সময় একবার কংগ্রেসের ফাণ্ডে অর্থের টানাটানি চলছিল। একদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও বাসন্তী দেবী সুভাষচন্দ্রের কাছে একটি বিবাহের প্রস্তাব এনে বলেন, ' সুভাষ, একটি বড়োলোকের মেয়েকে যদি তুমি বিবাহ করো তাহলে কংগ্রেসের কাজে এক লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে।'

এই কথা শুনে সুভাষচন্দ্র রসিকতা করে বলেন, 'বিবাহ করলে এক লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে ঠিক কথা। কিন্তু আমাকে আর পাওয়া যাবে না। এখন আপনারাই ভেবে দেখুন কোনটা নেবেন—এক লক্ষ টাকা না আমাকে!'

সুভাষচন্দ্রের কথা শুনে চিত্তরঞ্জন ও বাসন্তীদেবী হেসে উঠলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে নিজের গুরু মনে করতেন।

এলগিন রোডের বাড়িতে

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন অত্যন্ত রসিক মানুষ। নিজে দেশের একজন নামকরা রাজনৈতিক নেতা হলেও সময় পেলেই ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতায় মেতে উঠতেন।

সুভাষচন্দ্র যখন কলকাতার ৩৮/২, এলগিন রোডের বাড়িতে একান্নবর্তী পারিবারিক জীবনযাপন করতেন, সেই সময় তিনি ছোট খুড়তুতো ভাই-বোন-ভাইপো-ভাইঝি-ভাগ্না-ভাগ্নীদের নিয়ে সহজ সরল শিশুর মতো হাসি-মস্করা করতেন। কী করতেন নেতাজী?

সুভাষচন্দ্রর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে শোনাতেন, রাঙাকাকাবাবু সুভাষচন্দ্র আমাদের পেটে আঙুল খোঁচা দিয়ে সুড়সুড়ি দিতেন এবং এমন মজার ভঙ্গী করে বলতেন 'কেঁচো খুড়ুম'—অর্থাৎ পেটের কেঁচো খুঁড়ে বের করছেন যে, আমরা ছোটরা না হেসে পারতাম না। তিনিও আমাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে হাসতেন।

কাছের মানুষজনের কাছে সুভাষচন্দ্র ছিলেন এক কথায় মজার মানুষ।

বড়া

সুভাষচন্দ্র কটক ওড়িয়া বাজারে বর্তমান জানকীনাথ বসু রোডে এক বড়াওয়ালীর কাছ থেকে নিয়মিত বড়া ভাজিয়ে খেতেন ও তাঁর বৌদিদের খাওয়াতেন। ১৯৪০ সালে বড় সংকটের সময় ফরওয়ার্ডব্লকের সভা করতে গিয়ে অত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সেই বড়াওয়ালীর কাছ থেকে বড়া খেয়ে আসেন। সুভাষচন্দ্র ছিলেন খাদ্যরসিক। কোনো

নিমন্ত্রণ বাড়িতে গেলে আগে সুস্বাদু খাদ্যগুলো খেয়ে নিয়ে ভাইপো-ভাইঝি-ভাগ্না-ভাগ্নীদের বলতেন, 'দেখিস, আজেবাজে খাবার খেয়ে পেট ভরাস না। আমি যেগুলো বলছি সেগুলো খাবি।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উপরোক্ত বড়াওয়ালী যেহেতু নেতাজীকে মাতৃস্নেহে বড়া ভেজে খাওতেন সেজন্য নেতাজীর জন্মদিনে তাঁকে বিশেষ সম্মান জানানো হতো। নেতাজী এই মহিলাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। তাই কটকে গেলেই চলে যেতেন তাঁর হাতের ভাজা বড়া খেতে।

গৃহ ভৃত্য

সুভাষচন্দ্র ছিলেন সৌখিন মানুষ। বিশেষত পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে। পোশাক পরিচ্ছদ হবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, একটু ছেঁড়া থাকলে তিনি বিশেষ ভ্রুক্ষেপ করতেন না।

কোঁচানো কাপড় তিনি বিশেষ পছন্দ করতেন। তবে জামা-কাপড়ের কোনো হিসাব তিনি ঠিকমত রাখতেন না। অনেক সময় দুঃস্থ মানুষজনদের তিনি নিজের নতুন জামা কাপড় বিলিয়ে দিতেন। এই ভাবে অনেক সময় এমন পরিস্থিতি হতো যে, বিশেষ কাজে বের হবার সময় তার নিজেরই পরনের জামা পাওয়া যাচ্ছে না। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটতো। এলগিন রোডের বাড়িতে তাঁর কাজের লোক ছিল জগদেও নামক এক ব্যক্তি। সে বহু পুরনো কাজের লোক। সুভাষচন্দ্রর কাপড় কুঁচোনো ও গুছোনোর দায়িত্ব ছিল তারই। এই কাজ করতে গিয়ে সে দেখত সংখ্যায় জামা-কাপড় কম! তখন সে বুঝত, নিশ্চই বাবু দান করেছেন! তখন সে রসিকতা করে সুভাষচন্দ্রকে বলত,

'রাষ্ট্রপতি (অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র) তো রোজগার করেন না। তবে রাষ্ট্রপতিকে এত জামাকাপড় কে দেবে?'

সুভাষচন্দ্র তাঁর বাড়ির বহুপুরাতন এই ভৃত্যকে খুব ভালবাসতেন। তাই তার এ হেন রসিকতায় বিশেষ মজা পেতেন ও মুচকি মুচকি হাসতেন।

ভৃত্য জগদেও বুঝতো, বাবুকে যতই বলি, দান করা তিনি কোনো মতেই ছাড়তে পারবেন না।

প্রভু-ভৃত্যের এইরকম রসিকতার সম্পর্ক খুব একটা দেখা যায় না।

কাজী নজরুল ইসলামের রঙ্গ রসিকতা

জন্ম সাল-১৮৯৯

মৃত্যু সাল-১৯৭৬

বিড়ালে কামড়াবে

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সেবার সিরাজগঞ্জে নিখিল বঙ্গ মুসলিম যুব সম্মেলনে সভাপতি হয়ে গেছেন। উৎসবের আয়োজনে দারুণ খুশি কাজী সাহেব। বিশেষত ভোজনের ব্যাপারে। কবি সকলের সঙ্গে খেতে বসেছেন যমুনা নদীর তীরে একটি সুন্দর বাংলোতে। বিভিন্ন পদের সুস্বাদু খাবার! একটার পর একটা খাচ্ছেন কবি। এরপর এলো গরমাগরম ইলিশ মাছ ভাজা। মুখ বুজে কবি তৃপ্তি করে দু'টুকরো ইলিশমাছ ভাজা খেয়ে ফেললেন। পরিবেশক তখন কবির পাতে আরো কয়েকটি ইলিশমাছ ভাজা দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কবি স্বয়ং তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন,

'আরে ভাই করছো কী! শেষকালে আমাকে যে বিড়ালে কামড়াবে!'

কবির কথার অর্থ উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ কেউই ধরতে পারলেন না। গিয়াসউদ্দীন সাহেব তখন জিগ্যেস করলেন, ' কাজী সাহেব এর মানে কী?'

নজরুল তখন হাসতে হাসতে রসিকতা করে বললেন, 'আরে ভাই, বুঝতে পারছেন না? ইল্‌শে মাছ—যে মাছের গন্ধ মুখে লালা ঝরায়! যে মাছ বিড়ালকে মাতাল করে তোলে! সেই মাছ বেশী খেলে আর রক্ষে আছে? সারা দেহ থেকে গন্ধ ছুটবে যে! আর সেই গন্ধ পেয়ে বিড়াল তেড়ে আসবে! ভাবুন কী কেলেঙ্কারি কাণ্ড হবে তখন!'

নজরুলের কথা শুনে উপস্থিত সকলেই খাওয়া ভুলে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন। আসলে নজরুল সময় সুযোগ পেলেই রঙ্গ রসিকতায় মেতে উঠতেন।

বেলুচিস্তান

একটি নিমন্ত্রণ বাড়িতে গেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। বেশ বড়সড় ভোজের আসর! অনেক গন্যমান্য লোকজনও এসেছেন। সকলের সঙ্গে খেতে বসেছেন কবি। গৃহকর্তা হাসি মুখে খোঁজ নিয়ে যাচ্ছেন, 'রান্না কেমন? আর কিছু লাগবে? পাঠিয়ে দেব?'

নজরুল বললেন, 'খুব তৃপ্তি করে খাচ্ছি।'

খাওয়ার প্রায় শেষের দিকে একজন পরিবেশনকারী লুচির ঝুড়িটা হাতে নিয়ে নজরুলের কাছে এসে বললেন 'আপনাকে আর লুচি দেব?'

শুনে নজরুল রসিকতা করে বললেন, 'না-না আর লুচি লাগবে না। আমি তো বেলুচিস্তানের লোক।'

নজরুলের কথা শুনে পরিবেশনকারী ও অন্যরা হেসে উঠলেন।

গির্জা থেকে

কাজী নজরুল কবিতা রচনার পাশাপাশি গান রচনা করতেন এবং গান শেখাতেন। অনেক ছাত্র-ছাত্রী তাঁর কাছে গানের তালিম নিতে আসত। একদিন এক ভদ্রমহিলা এলেন নজরুলের কাছে গান শিখতে। নজরুল তাঁকে জিগ্যেস করলেন, ' আপনি এতদিন কার কাছে গান শিখতেন?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'গিরিজাশংকর চক্রবর্তীর কাছে।'

গিরিজাশংকর তখনকার দিনের একজন বিখ্যাত গায়ক। নজরুল ভদ্রমহিলার মুখে গিরিজার নাম শুনে হেসে ফেললেন, তারপর মুখে এক খিলি পান দিয়ে জিভের ডগায় চুন লাগিয়ে বললেন,'তা গির্জা (অর্থাৎ গিরিজা) থেকে একেবারে মসজিদে চলে এলেন যে?'

ভদ্রমহিলা ও অন্য ছাত্র-ছাত্রীরা নজরুলের রসিকতায় না হেসে পারলেন না।

তুমি টিকটিকি

কাজী নজরুল নিয়মিত যেতেন বেগম সুফিয়া কামালদের বাড়িতে। সুফিয়াকে তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন। সুফিয়া কবিকে ডাকতেন দাদু বলে। নজরুল তখন কলমে আগুন ঝরাচ্ছেন, কবিতায় কামান দাগছেন ইংরেজের বিরুদ্ধে। তখন ইংরেজ সরকার ভয়ে গোয়েন্দা লাগিয়ে দিল কবির পিছনে। নজরুলকে আটকায় কে? কোনো কিছুকেই তিনি পরোয়া করেন না। সুফিয়াদের বাড়িতে গেলেই তিনি হারমনিয়াম নিয়ে বসে যেতেন। জমে উঠতো গানের আসর। সঙ্গে একটার পর একটা পান। ঠোঁট রাঙা হয়ে উঠতো

কবির। নজরুলের গান শুনে সেই আসরে এসে উপস্থিত হতেন পাড়ার সকলেই। এদের মধ্যে মিশে আসতেন কয়েকজন গোয়েন্দাও। একদিন কবি এক ভদ্রলোককে দেখে তার মুখের ওপর গেয়ে উঠলেন, ' তুমি টিকটিকি, জানি ঠিকঠিকই।'

লোকটির মুখ লাল হয়ে উঠলো এই গান শুনে। তিনি আর বসে থাকতে পারলেন না সেই আসরে। পরে সুফিয়া কবিকে জিগ্যেস করেন, 'দাদু তুমি কী করে চিনলে?'

নজরুল হেসে রসিকতা করে বলেন, 'গায়ের গন্ধে! বড় কুটুম্ব যে!'

নীচে নামা

কাজী নজরুল ইসলাম তখন গ্রামাফোন কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত। গানের ব্যাপারে প্রতিদিন গ্রামাফোন কোম্পানীর অফিসে তিনি আসতেন এবং নিজের কাজ করতেন। একদিন তিনি দোতলায় বসে পান খেতে খেতে একটা কবিতায় সুর করছিলেন। এমন সময় একজন তাঁকে ডাকলেন, ' কাজীদা, ইন্দুদি (বিখ্যাত সংগীতশিল্পী ইন্দুবালা) আপনাকে নীচে ডাকছেন।'

নজরুল রসিকতা করে উত্তর দিলেন, 'ভাই, আর কতো নীচে নামবো?'

নজরুল এরকম মজা করে চটজলদি উত্তর দিতে পারতেন।

অর্গান

কাজী নজরুল ইসলাম একদিন গজেন ঘোষের সাহিত্য আড্ডায় গিয়ে কাউকে কিছু না বলেই হঠাৎই টেবিল থেকে বইপত্র, ছেঁড়া কাগজ সরাতে শুরু করে দিলেন! ধুলো উড়তে লাগলো! পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় নজরুলের এই কাণ্ড দেখে বললেন, ' এ আবার কী পাগলামি?'

নজরুল হেসে বললেন,' অহল্যা উদ্ধার মশাই।'

পবিত্র বললেন,' অহল্যা উদ্ধার? সে কী রকম?'

নজরুল বললেন,' আজ্ঞে হ্যাঁ, এর কোমল হৃদয় পাষান হয়ে গেছে। রিডগুলো পর্যন্ত টিপলে নামতে চায় না! আমি এই পাষানীর মধ্যে একটু প্রাণের সঞ্চার করার চেষ্টা করছি।'

আসলে টেবিলটি ছিল একটি অর্গান। গৃহকর্তা গজের ঘোষ অর্গনটিকেই টেবিল হিসাবে ব্যবহার করতেন।

নজরুল ওই অর্গানটি নাড়াচাড়া করছেন দেখে গজেন বললেন, 'কবি, ও যে অনেকদিন বোবা হয়ে গেছে! ওকে পিটিয়ে কোনো লাভ হবে না। বৃথা পরিশ্রম!'

নজরুল কাজ করতে করতেই উত্তর দিলেন, ' কী করবো বলুন, কবিগুরুর হুকুম— এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা।'

নজরুলের কথা শুনে সকলে হেসে উঠলেন।

দেশলাই

কবি কাজী নজরুল ইসলাম একবার ট্রেনে করে চলেছেন বিশেষ কাজে। তাঁর পাশে বসে এক সমবয়স্ক ভদ্রলোক। লোকটি বারবার তাঁর দিকে দেখছেন। হঠাৎ তিনি কোনো ভানভনিতা না করেই বলে উঠলেন, 'এই, তোর কাছে দেশলাই আছে?'

অপরিচিত লোকের এরকম আজব সম্ভাষণে অবাক হয়ে গেলেন কবি। পান চিবোতে চিবোতে তিনি পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে তার মুখের ওপর ছুড়ে দিয়ে বললেন, 'এই নে বে–!'

উপযুক্ত জবাব পেয়ে লোকটি শেযমেষ নজরুলের সঙ্গে আলাপ জমাতে শুরু করে দিলেন। নজরুলও মেতে উঠলেন খোশগল্পে-রঙ্গ রসিকতায় হৈ হুল্লোড়ে। দুজনেরই ট্রেনযাত্রায় একাকীত্ব দূর হয়ে গেল।

শিবরাম চক্রবর্তীর রঙ্গ রসিকতা

জন্ম সাল-১৯০৩

মৃত্যু সাল-১৯৮০

জামা-কাপড় চুরি

সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী ও শিব্রাম একই ব্যক্তি। তিনি ছিলেন যথার্থই হাস্যরসিক। হাসতে ও হাসাতে তিনি বড় ভালবাসতেন। তাঁর রচিত সাহিত্যগুলি থেকে হাস্যরস যেন গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ত। তাঁর লেখা পড়ে হেসে লুটিয়ে পড়েননি এমন পাঠক খুঁজে পাওয়া ভার। ব্যক্তিগত জীবনেও শিবরাম ছিলেন রসিক মানুষ। বিভিন্ন লোকের সঙ্গে একটু সুযোগ পেলেই তিনি রঙ্গ রসিকতায় মেতে উঠতেন।

একবার শিবরাম গেছেন বাজারে! হাতে ব্যাগ। গায়ে একটা ছেঁড়া গেঞ্জী। বিখ্যাত সাহিত্যিক হলেও তিনি খুব সাদামাটা জীবনযাপন করতেন। তা বলে ছেঁড়া গেঞ্জী গায়ে বাজারে! এক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর দেখা। বন্ধুটি শিবরামকে দেখে কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'এ কী, শিবরামবাবু, আপনি এই অবস্থায় বাজারে?'

শিবরাম উত্তরে বলেন, ' কী বলব বন্ধু, সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার সব জামা-কাপড় চুরি হয়ে গেছে। তাই এই অবস্থায় বাজারে এসেছি।'

বন্ধুটি আবার জানতে চাইলেন, ' আপনার বুঝি আর জামা কাপড় নেই?'

শিবরাম এবার হাসতে হাসতে বললেন, ' তা তো আছে বন্ধু, কিন্তু সে সব জামাকাপড় তো লণ্ড্রীতে।'

বন্ধুটি বললেন, ' লণ্ড্রী থেকে জামাকাপড়গুলো আনিয়ে নিলেই তো সমস্যা মিটে যাবে।'

শিবরাম উত্তর দিলেন, ' না বন্ধু, লণ্ড্রী থেকে জামাকাপড় আনার উপায় নেই। কারণ লণ্ড্রীর রসিদ সেই চুরি যাওয়া জামার পকেটেই রয়ে গেছে।'

নাটক জাতীয়

সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খোশগল্প করতে খুব পছন্দ করতেন। একবার এক আড্ডার আসরে একজন তরুণ অভিনেতা শিবরামকে বললেন,'

শিবরামদা, শচীন সেনগুপ্তর লেখা সিরাজদৌল্লা নাটকটা আপনি পড়েছেন? উঃ! দারুণ লেখা! আমি তো বলব অসাধারণ। ওই নাটকটাকে বাঙালির জাতীয় নাটক হিসাবে ঘোষনা করা উচিত বলে আমার মনে হয়। আপনি কী বলেন?'

কথাগুলো শুনে মুচকি হেসে শিবরাম উত্তর দিলেন, ' বন্ধু, জাতীয় নাটক কি না তা আমি বলতে পারব না, তবে এটুকু জানি ওটা নাটক জাতীয়।'

একথা শুনে আড্ডার সকলে হেসে উঠলেন।

হিটলার ও বরফ

সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী গল্প-উপন্যাস রচনায় যেমন সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তেমন মজার মজার গল্প তাৎক্ষনিক বানিয়ে বলতে পারতেন। বিশেষ করে জমজমাট আড্ডার আসরে। এমনই এক মজার গল্প বানিয়েছিলেন শিবরাম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ইউরোপে তাঁর জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছেন হিটলার। শিবরাম সেইরকম সময় একদিন আড্ডার আসরে এসে হঠাৎ বললেন, ' জানেন তো, শুনলাম হিটলার ইংলিশ চ্যানেলটা বরফ দিয়ে মুড়ে দিয়ে তার উপর দিয়ে ইংলণ্ডে সৈন্য পাঠাবেন ঠিক করছেন।'

এই কথা শুনে আড্ডার আসরের একজন প্রশ্ন করলেন, 'হিটলার অত বরফ পাবেন কোথা থেকে?'

শিবরাম বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে উত্তর দিলেন,' কেন, একটা বিখ্যাত ব্রিটিশ কোম্পানীই তো কনট্রাক্ট নিচ্ছে। বিজনেস ইস বিজনেস। ওরা তো জাত ব্যবসায়ী। ব্যবসাটা কিন্তু ওরা দারুণ বোঝে।'

শ্রোতারা যখন বুঝলেন গল্পটা শিবরামের বানানো, তখন তাঁরা হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন। শিবরাম যেখানে যেতেন, সেখানে মাতিয়ে রাখতেন।

চুরিচামারি

শিবরাম চক্রবর্তী হাসির ছলে গভীর জীবনবোধের কথা বলে গেছেন। তাঁর কিছু কথা যেন মিছরির ছুরি। আড্ডার আসরে বন্ধুদের তিনি বলতেন, ' চুরি? একটু আধটু চুরিচামারি না করলে কেউ বাঁচতেই পারে না। চুরি ছাড়া বোধহয় এই দুনিয়ায় একদম বাঁচাই যায় না। অন্ততঃ আমি তো পারি না। আমার নিজের কথা যদি বলি, মার্কটোয়েনের থেকে চুরি করেই আমার হাসির লেখার হাতেখড়ি। আমি লেখক হই।'

তিনি আরও বলতেন, ' অন্যকে একস্‌প্লয়েট না করে বাঁচা যায় না। অন্যকে অর্থাৎ পরকে আত্মসাৎ করেই আমরা বাঁচি। আমার বাড়ি। আমরা হই। এই চুরিবিদ্যাই হচ্ছে বড় বিদ্যা। সুন্দর বিদ্যা। তার সমন্বয়েই এই জীবন বিদ্যাসুন্দর!'

শিবরাম ছিলেন বাস্তবমুখী। তিনি বুঝতেন ও বলতেন, 'বন্ধুরা জেনে রাখুন, কথার সঙ্গে কথা মেলানো সহজ কথা নয়। মনের সঙ্গে মনের সম্মেলনের চেয়েও কঠিন। মিলের চেয়ে গরমিলই বেশি দেখা যায়।'

শিবরামের কথাগুলো তাঁর বন্ধুরা মন দিয়ে শুনতেন।

যাঁরা রেঁধে খাইয়েছেন

শিবরাম চক্রবর্তী যে সাহিত্যসভায় যেতেন, সেখানেই তিনি মধ্যমণি হয়ে উঠতেন। ভক্তের দল, পাঠক-পাঠিকারা তাঁকে ঘিরে ধরতেন। একদিন এক সভায় এক সুন্দরী পাঠিকা তাঁকে প্রশ্ন করেন, ' আপনি জীবনে সব থেকে বেশি কাকে ভালোবেসেছেন?'

প্রশ্ন শুনে শিবরাম মুচকি হাসলেন। প্রত্যেকের মনে কৌতূহল—কার কথা বলবেন শিবরাম! শিবরাম হেসে উত্তর দিলেন, ' যাঁরা যাঁরা আমাকে রেঁধে খাইয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককেই আমি ভালোবেসেছি।'

শিবরামের কথা শুনে সভায় হাসির রোল উঠল।

লৌকিকতা

সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তীকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তি নানারকম উপহার দিতেন। শিবরাম সেই সব উপহার সানন্দে গ্রহণ করতেন। একদিন এক পাঠক খুশি হয়ে শিবরামকে একটি বিখ্যাত বই উপহার দিতে এলেন। শিবরাম তাঁকে বললেন, ' ভাই, আপনি আমাকে বই উপহার দেবেন খুব আনন্দের কথা । আমি অবশ্যই নেব। কিন্তু একটা শর্ত--আপনি আমাকে যে বই উপহার দেবেন তাতে কিছু লিখে দেবেন না।'

পাঠক ভদ্রলোক ভাবলেন, এ কেমন কথা! তারপর জিগ্যেস করলেন, ' কেন? নাম লিখে দেব না কেন?'

শিবরাম এবার হাসতে হাসতে পাঠক ভদ্রলোকটিকে বললেন, ' আমাকে তো লৌকিকতা করতে হয় বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান বাড়িতে। আমি এগুলো অন্যকে উপহার দেব। আর হ্যাঁ, আমার দেওয়া বই নিয়ে আপনারাও অন্য জায়গায় লৌকিকতা করতে পারেন!'

এ কথা শুনে পাঠক ভদ্রলোকটি না হেসে থাকতে পারলেন না।

মেস বাড়ি

সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী থাকতেন কলকাতার ১৩৪ নং মুক্তরামবাবু স্ট্রিটে একটি মেস বাড়িতে। অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন তিনি। ঘরে নিয়মিত ঝাঁট দিতেন না। ঘরে ময়লা পড়া নিয়ে কেউ তাঁকে কিছু বললে তিনি হেসে বলতেন, ' জীবানুগুলো

শান্ত হয়ে আছে, কী লাভ ওদের খেপিয়ে!'

ঘরে বইপত্র ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখতে পারতেন না শিবরাম। টেবিল জোড়া বইপত্র। প্রয়োজনের সময় প্রায়ই তিনি প্রয়োজনীয় বই পত্র-পত্রিকা খুঁজে পেতেন না। কেউ তাঁকে বই পত্র গুছিয়ে রাখার কথা বললে তিনি হেসে বলতেন, ' বইপত্র থাকে কোথায়? সবাই পড়তে নিয়ে যায়, কেউ ফেরত দেয় না যে। আসলে সবাই রোজ আমাকে ভারমুক্ত করে যায়। বেশ চলে যাচ্ছে দিনগুলি!'

স্বজনহীন অকৃতদার এই মানুষটি ছিলেন আপনভোলা। তিনি মেস বাড়ির ঘরের দেওয়ালে পেনসিল দিয়ে টাকা-পয়সার হিসাব লিখে রাখতেন। কী হিসাব? কার কাছে কত পাওনাগণ্ডা আছে তা লিখে রাখতেন। দেওয়ালের যতদূর হাত যায় ততদূর। চারদেওয়াল প্রায় জুড়ে চল্লিশ বছরের হিসাব! দেওয়ালে কেন? কাগজপত্রে হিসাব লেখা নয় কেন? কেউ জানতে চাইলে তিনি বলতেন, ' এই ঘরে উই পোকার উৎপাত। কাগজে হিসাব লিখলে উই খেয়ে ফেলে। তাই কাগজে হিসাব না লিখে দেওয়ালে লিখে রাখি। এর চারদিকে বই নিরোধক স্প্রে করানো আছে। বুঝলে?'

শিবরাম পাওনাগণ্ডার হিসাব করে রাখতেন, কিন্তু পাওনাগণ্ডা আদায় হত না। তিনি চাইতে পারতেন না। দেওয়ালে হিসাব লিখেই সন্তুষ্ট থাকতেন আর কাজুবাদাম খেতেন।

শিবরামের মেসবাড়ির ঘরের কোণে একটা আধভাঙা আলমারি ছিল। তিনি ওই আলমারিতে কিছুই রাখতেন না। কিন্তু সবাই মনে করত—ওই আলমারিতে বুঝি জামাকাপড় বা বইপত্র আছে। কেউ য ি তাঁকে জিগ্যেস করতেন, ' কী আছে ওই আলমারিতে?'

শুধুমাত্র তখনই তিনি তার উত্তরে বলতেন,' আলমারিতে কিছুই নেই। সবই চুরি হয়ে গেছে।'

তবু যদি কেউ জিগ্যেস করতেন,' তাহলে আলমারিতে মস্ত তালা লাগিয়ে রেখেছেন কেন?'

তখন তিনি মুচকি হেসে বলতেন,' চোরের ওপর বাটপারী করার জন্যই তালাটা রেখেছি। যখন বাইরে বের হই, তখন তালাটা লাগাই দরজায়। আর যখন ঘরে ফিরি—তালাটা লাগাই আলমারিতে।'

শিবরামের একথা শুনে কেউ না হেসে পারতেন না।

একাকী সাদামাটা জীবনযাপন করেই শিবরাম চক্রবর্তী একটারপর একটা মূল্যবান সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা সাহিত্যকে।